THE

# EVOLUTION OF MAN

PHYSICAL, INTELLECTUAL, SOCIAL AND RELIGIOUS

BY

KHIRODE CHANDRA RAY CHOUDHURI, M.A.

SECOND EDITION.

# মানবপ্রকৃতি।

শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক
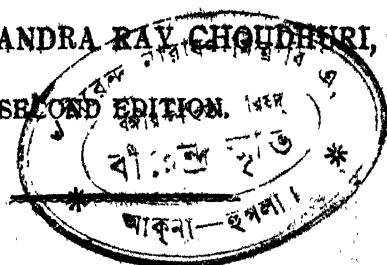
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম-এ,
প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

CUTTACK:
PRINTED AND PUBLISHED BY K. C. RAY,
AT THE "STAR PRESS."

1910.

মূল্য ১৲ টাকা।

# প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

মানবপ্রকৃতি ক্রমবিকাশশীল, এই গ্রন্থে তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করা গিয়াছে। ডারবিন, হেকেল, ওয়ালেস, জলি, রোমানিস, মেন, লবক স্পেন্সার, টাইলার, মিবার্ট, গাল্টন, হুইট্নি, মোক্ষমূলর, সেইস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিতে কত কত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় একখানি পুস্তকে তাহার আলোচনা করা যাইবে, সম্ভাবনা নাই। মানবপ্রকৃতির ক্রম-বিকাশ সম্ভব, পাঠকের মনে এই চিন্তাটী উদ্ভূত হইলে আমার আশা পূর্ণ হইবে।

বড়িশা-বেহালা
২০শে জুলাই, ১৮৮৩। } শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

# দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

২৭ বৎসর পরে মানবপ্রকৃতি পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইল। মানবপ্রকৃতি প্রথম যখন প্রকাশিত হয় বাঙ্গলা পাঠকগণ ইহার যথেষ্ট আদর করিয়াছিলেন। এক বৎসরে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় বৎসরে ইহা তেলুগু, তামিল ও মহারাষ্ট্র ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। তবে এতদিন ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই কেন? ইহার উত্তরে বাঙ্গলা সমাজের ও বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্রমোন্মেষের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে এক একটী অধ্যায় লিখিতে হয়। সেকথা এখানে বলিবার আবশ্যক নাই। এতদিন পরেও এই সংস্করণ প্রকাশিত করিতে আশঙ্কা হইতেছে। এখন মানবপ্রকৃতি সে পূর্ব্বের সমাদর লাভ করিবে কি?

প্রথম সংস্করণে লিখিয়াছিলাম মানবপ্রকৃতির ক্রমবিকাশ সম্ভব পাঠকগণের মনে এই চিন্তাটি উদ্ভূত হইলে আমার আশা পূর্ণ হইবে। সে আশা পূর্ণ হইয়াছে। মানবপ্রকৃতি যে ক্রমবিকাশ বিবর্ত্তিত একথা এখন শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেন। মাটীর তলে কাদা গোবরের মধ্যে শীকড় সঞ্চারিত হইয়া কিরূপে মল্লিকার সৌরভ ও সৌন্দর্য্য সঞ্চয় করে এই গ্রন্থে তাহারই কতকগুলি উদাহরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে মাত্র। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিচার করা হয় নাই। তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে করা হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। বৈজ্ঞানিক বিচারের দিন এখনও বুঝি এদেশে আসে নাই। আরও ২৫ বৎসর পরে আসিতে পারে।

হার্ম্মিটেজ—কটক,
৮ই আগষ্ট, ১৯১০। } শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

---

# সূচীপত্র।



সমাপ্ত।

# মানবপ্রকৃতি।

## প্রথম পল্লব।

মনুষ্য কতদিন? ইতিহাসে তিন চারি সহস্র বৎসরের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাচীন সময়ের গাঢ়তম অন্ধকারে ইতিহাস প্রবেশ করে না। ঋগ্বেদ বা অবেস্তা আট দশ সহস্র বৎসরের অপেক্ষা অধিক পুরাতন নহে। সুতরাং প্রথম পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয় ইহাদিগের নিকট পাইবার আশা নাই। ঋগ্বেদ ও অবেস্তাবর্ণিত যুগে আর্য্যগণ সভ্য জাতি হইয়া উঠিয়াছিলেন—তাঁহাদিগের নগর ও দুর্গে শতদ্বারমণ্ডিত প্রাসাদরাজি শোভা পাইত—প্রশস্ত পথে যান-বাহনে গতায়াত চলিত—তাঁহারা বণিগ্‌বৃত্তি ও ক্ষত্রিয় ব্যবসায়ে কৌশলময় হইয়া উঠিয়াছিলেন—বিলাস-লালসা পরিতৃপ্ত করিবার কোন উপকরণেরই তাঁহাদিগের অভাব ছিল না—পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রগণ তাঁহাদিগের প্রখর দৃষ্টির সম্মুখে সঙ্কুচিত হৃদয়ে অন্তরস্থ গুপ্ত কাহিনী প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আট দশ সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে আর্য্যজাতির এমন সভ্য অবস্থা। একদিকে আণ্ডামান দ্বীপবাসী নগ্নকায় আমমাংসভোজী গুহা-বাসী জীবপ্রকৃতি মনুষ্যদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, অপর পক্ষে ধনরত্নভূষিত কারুকার্য্যপূর্ণ প্রাসাদবাসী আট সহস্র বৎসর পূর্ব্বের আর্য্যদিগের প্রতি লক্ষ্য কর। বল :—এই অবস্থা হইতে ঐ অবস্থায় যাইতে কত সময় লাগিয়াছিল। তিন শত বৎসর য়ুরোপীয়দিগের সহবাসে আমাদিগের সামাজিক অবস্থার কত অল্প পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সাত শত বৎসর যবনদিগের প্রতিবাসে থাকিয়া হিন্দু সমাজের শতাংশের একাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কি না বলা যায় না। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ, মহাভারত বেদাদি গ্রন্থনিচয়ে ভারত সমাজের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে—আজ আমরা তাহা অপেক্ষা কতই বা উচ্চে? সমাজ পরিবর্ত্তন এতই দুরূহ। অথচ অসভ্য অবস্থা হইতে উন্নত হইয়াই আর্য্যজাতি যে বেদোক্ত সভ্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? সুতরাং

আট সহস্র বৎসরের পূর্ব্বতন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে কত সহস্র বৎসর গত হইয়াছিল অনুমান করা যাইতে পারে।

কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় পৃথিবী ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করেন। ধর্ম্ম-বিশ্বাস কল্পনাপূর্ণ অনুমান বলে দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা ইহাদিগকে বলিতে পারিতাম যে, ইহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ মত একটি দম্পতী হইতে এই শত শত অক্ষৌহিণী মনুষ্য উৎপন্ন হইতে কত কত যুগ অতিপাত হইয়াছে—আবার ইহাদিগের কাহারও সহিত কাহারও সাদৃশ্য নাই। এক জন তামসী কৃষ্ণকায়—একজন ধবলবর্ণ। কাহারও তাম্রবর্ণ, কাহারও পীতবর্ণ—সহস্রবর্ণে মনুষ্যজাতি বিভক্ত। কেহ স্ফীতাধর, কেহ সূক্ষ্মাধর—কেহ উচ্চনাস কেহ নিম্ননাস—কেহ কৃষ্ণকেশ, কেহ তাম্রকেশ। এক জনের সন্তান হইয়া সহস্র বর্ণে সহস্র জাতিতে মনুষ্য বিভক্ত হইতে কত সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে? পাটাগোনীয় একটী পুরুষের নিকট একজন বুশমানকে অবস্থিত করিলে এক জনকে দৈত্য অপরটীকে বামন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। বরং সামাজিক পরিবর্ত্তন সহস্র বৎসরে কথঞ্চিৎ সাধ্য—দৈহিক পরিবর্ত্তন সহস্র সহস্র বৎসরেও কথঞ্চিৎ সাধ্য নহে।

কেবল দৈহিক পরিবর্ত্তন নহে। চীন ভাষার সহিত ইংরাজী ভাষার কিছু মাত্র সাদৃশ্য নাই। সংস্কৃত ও দ্রাবিড়ী এক দেশ প্রচলিত হইলেও, এক ধর্ম্মাক্রান্ত জাতির ভাষা হইলেও, চীন ও ইংরাজীর মত ইহারা বিভিন্ন। ভাষা পরিস্ফুট হইতে সহস্র সহস্র বৎসর যায়। অথচ সহস্র সহস্র ভাষা—জাতি সংখ্যা অপেক্ষা ভাষা-সংখ্যা অধিক—এক ভারতবর্ষে শতাধিক ভাষা প্রচলিত—কোন কোন শাব্দিক পণ্ডিত অনুমান করেন, পৃথিবীতে তিন সহস্রের অধিক পরিমাণ ভাষা প্রচলিত আছে।

কিন্তু ভাষা বা জাতি বিভিন্নতা হইতে সহস্র সহস্র বৎসর গত হইয়াছে, নিঃসংশয়ে বলিতে পারিলেও এ প্রকার গণনা অনুমানের রূপান্তর মাত্র। সৌভাগ্যক্রমে অন্য প্রকার প্রমাণ পণ্ডিতগণ সংগ্রহ করিয়াছেন। মিসর দেশে অতি প্রাচীন কালের মনুষ্য-কীর্ত্তি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের কোন কোনটি ছয় সহস্র বৎসরেরও প্রাচীন। সেগুলি যে মনুষ্যকীর্ত্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ছয় সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে যে মনুষ্য ছিল, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। এ গুলিও দেখিলেই বুঝা যায় যে অসভ্য মনুষ্যের কার্য্য নহে। যাহারা জ্যামিতির তত্ত্ব বুঝিত, গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্যে বিশেষ পার-

দর্শিতা লাভ করিয়াছিল, জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাহাদিগের বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল, এমন সভ্য জাতির প্রাচীন সভ্যতার জীবন্ত প্রমাণ মিসর দেশীয় এই সকল সমাধিস্তম্ভ। অনুমান কর সেই সভ্যতা প্রাপ্ত হইতে সেই সমস্ত জাতি, তাহারও কত সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে ধরিত্রী বক্ষে জ্ঞান সঞ্চয় আরম্ভ করিয়াছিল। অতীত ইতিহাসের প্রথম দৃষ্টি পথে মানব সন্তানের এই সকল কারুকার্য্য অতীততর পূর্ব্বপুরুষদিগের মহত্ত্বের বিশ্বস্ত সাক্ষী। মানবজাতির জীবনবৃত্তে ইতিহাস মুহূর্ত্তের প্রমাণ মাত্র। লক্ষ বৎসরের অধিক কাল মনুষ্যের জন্ম হইয়াছে, ইতিহাস কয়েক সহস্র বৎসরের পরিচয় দেয় মাত্র। সাগর তটে দাঁড়াইয়া উচ্ছ্বাসতরঙ্গায়িত বারিধির সীমা, আর লিখিত ইতিহাস হইতে মানব জাতির জীবন বৃত্তান্তের সীমা নির্ণয় চেষ্টা উভয়ই অকিঞ্চিৎকর। যদি:সমস্ত ইতিহাস একদিনে ভস্মসাৎ হয়, মানব-জীবন-বৃত্তান্তের তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। লক্ষ বৎসরের কথা যদি না জানিলাম, ছয় সহস্রের কথা শুনিয়া আশার পরিতৃপ্তি জন্মে না।—কল্পনা পূরে না।

ইতিহাস যেখানে মন্থরগতি, ইতিহাস যেখানে অস্ফুটবাক্, ইতিহাস যেখানে রুদ্ধদৃষ্টি, বিজ্ঞান সেখানে হাসিতে হাসিতে নব যৌবন-দর্পে উপস্থিত হইয়া পাঠককে সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব পথে অন্ধতিমিরাচ্ছন্ন পথে প্রভাত সূর্য্যের কনক কিরণ প্রতিভাত করিয়া সাহস দিয়া সঙ্গে লইয়া যায়। যাহা দেখি নাই, বিজ্ঞান তাহা দেখাইল—যাহা শুনি নাই, বিজ্ঞান তাহা শুনাইল—বিজ্ঞান হৃদয়ের সাধ মিটাইয়া নূতন সাধ জাগাইল। এমন ঈষৎ অম্লরস সংযুক্ত অমৃত বিজ্ঞানের মত কে দিতে পারে? পাঠক! আখ্যায়িকা বিস্তর পড়িয়াছ, ইতিহাসে সাধ মিটে নাই; যদি অমর হইতে চাও, যাহার রক্ত হৃদয়ে ধারণ কর, লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের সেই পূর্ব্বপুরুষগণের জীবন-বৃত্তান্ত যদি জানিতে চাও, তাঁহাদিগের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির পরিচয় পাইতে যদি বাসনা থাকে, মানব-বিজ্ঞান পাঠ কর। আমার এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহার শতাংশ পাইবে না, ইহা বিজ্ঞান নহে—বিজ্ঞানশাস্ত্র পাঠে তোমার হৃদয় আকর্ষণ করিবার একটী উপকরণ মাত্র।

বিজ্ঞান মতে আমাদিগের পৃথিবী প্রথমে তরল অগ্নিময় পদার্থ ছিল। নানা কারণে উত্তাপ যত হ্রাস হইয়াছে, পৃথিবীর তরলত্ব ক্রমে গাঢ়তায় পরিণত হইয়াছে। একেবারে সমস্ত পৃথিবী বর্ত্তমান কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। স্তরে স্তরে পৃথিবীর ভূভাগ উৎপন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর তরলাবস্থায় যে বাষ্পরাশি

পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, পৃথিবী শীতল হইতে তাহাই জলরূপে পরিণত হইয়া সমুদ্রাকার লাভ করিয়াছে। কোন একটী পুষ্করিণী খনন করিবার সময় আমরা স্তরে স্তরে নানা বর্ণের নানা উপকরণে গঠিত মৃত্তিকা দেখিতে পাই। ভূ-স্তর সকলের পরীক্ষা করিয়া পৃথিবীর গঠন কাল পাঁচকল্পে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এখন আমরা পঞ্চম কল্পে উপস্থিত হইয়াছি। এক এক কল্পে কত সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তৃতীয় কল্প আবার তিনভাগে বিভক্ত করা হয়—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগ। এক এক স্তরে তৎকালীন জীবদেহ বা জীব-কীর্ত্তির অবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অক্ষত ভূ-স্তর পরীক্ষা করিলে কোন্ কল্পে কোন্ জীবের উদয় হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। ধরণী সন্তানগণের কঙ্কালরাশি অতি যত্নের সহিত হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, চক্ষু থাকিলে সাক্ষাৎ করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয় লও।

প্রথম ও দ্বিতীয় কল্পান্ত স্তর সকলে য়ুরোপে পশুপক্ষীর দেহাবশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। আমেরিকার দ্বিতীয় কল্পান্ত গিরিগাত্রে এক প্রকার দন্তযুক্ত পক্ষী দেখা গিয়াছে। য়ুরোপে তৃতীয় কল্পে তাহাদিগের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ। অধুনা যে সকল শম্বুকজাতীয় জীব ভূপৃষ্ঠে দেখিতে পাওয়া যায়, তৃতীয় কল্পের প্রথম যুগে প্রত্যেক শতে তাহাদিগের চারিটীও দেখা যায় না কিন্তু দ্বিতীয় যুগে বিংশতিটি এবং তৃতীয় যুগে চল্লিশ পঞ্চাশটী পাওয়া যায়। তৃতীয় কল্পে পক্ষী-কঙ্কালের যথেষ্ট নিদর্শন আছে—এই সময়ে যে কয়েক প্রকার প্রকাণ্ড পশু দেখা যায়, তাহাদিগের কাহারও সহিত পৃথিবীর কুত্রাপি এখন সাক্ষাৎ হয় না। ইহাদের পরে স্তনদন্ত হস্তী (Mastodon) প্রভৃতি আর কয়েক প্রকার জীবের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই সময়ে কয়েক জাতীয় বানরের সহিতও সাক্ষাৎ হয়। তৃতীয় কল্পের তৃতীয় যুগে হস্তী, বৃষ, ঘোটক প্রভৃতি নানা প্রকার অধুনাতন তৃণ ও মাংসভোজী জীবকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহাদিগের আকারপ্রকার ঐ জাতীয় বর্ত্তমান জীব সকলের সদৃশ। তৃতীয় কল্পের তৃতীয় যুগে মনুষ্য-কঙ্কাল দৃষ্ট হয়। কোন কোন ভূ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুমান করেন, দ্বিতীয় যুগেও মনুষ্য-চিহ্ন পাওয়া যায়। চতুর্থ কল্পে মনুষ্য-কীর্ত্তির রাশি রাশি অবশেষ ভূ-স্তরে পাওয়া গিয়াছে, কোথায়ও কঙ্কালরাশি গিরিগহ্বরে বা ভূ-স্তরে মনুষ্য সত্বার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ দিতেছে। কোথায়ও বা তাহাদের কীর্ত্তিকলাপ তাহাদিগের সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রমাণ দেয়। আমরা স্থানান্তরে দেখাইব, আশ্চর্য্য কারণ হেতু মৃত দেহের সহিত মৃত পুরুষের ধন সম্পত্তি কবরে নিহিত করিবার

নিয়ম নানা দেশীয় বর্ব্বরদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে তৃতীয় কল্পের প্রান্তে ও চতুর্থ কল্পের প্রথম ভাগে আদিম মনুষ্য সমাজেও সেই রীতি প্রচলিত ছিল। মনুষ্য-কঙ্কালের সহিত মনুষ্য-কীর্ত্তির যে সকল অবশেষ অদ্যাপি ধরিত্রী যত্নের সহিত পোষণ করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্দ্বারা তৎকালীন সামাজিক সভ্যতার বিশিষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার জন্য মনুষ্যের প্রথম আয়াস। প্রথমাবস্থায় মৃগয়ালব্ধ জীব-মাংসে মনুষ্যকে উদর পূর্ণ করিতে হইত। পশু মারিবার অস্ত্রাদি, মৎস্য ধরিবার উপকরণ, মনুষ্য ও পশু হইতে আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র, আবাস-গৃহের নানাবিধ সামগ্রী সকলই ভূগর্ভে নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এক দিকে যেমন তাহারা মনুষ্যের সামাজিক অবস্থার পরিচয় দেয়, অপর দিকে তাহাদিগের আকৃতি ও কারু-কৌশল হইতে মনুষ্যের প্রাচীন সত্ত্বার প্রমাণ হয়।

মনুষ্যের অস্ত্র ও যন্ত্রাদি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধাতুতে নির্ম্মিত হইত। লৌহের ব্যবহার ইদানীন্তন—তাহার পূর্ব্বে পিত্তল ব্যবহার হইত। পিত্তল ব্যবহারের পূর্ব্বে সকল প্রকার গৃহ-সামগ্রী প্রস্তরে নির্ম্মিত হইত। কোন কোন দেশে পিতলের পূর্ব্বে তাম্রের ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্তর ব্যবহার কাল দুই যুগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম যুগের দ্রব্যাদি মসৃণতাশূন্য, কারুকৌশলে সামাজিক উন্নতির পরিচয় তাহাদিগের নিকট পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় যুগের প্রস্তর ও হস্তীদন্ত নির্ম্মিত নানাবিধ অস্ত্র, যন্ত্র, পাত্র ও অলঙ্কার এমনি সুগঠিত যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্য সময়ে তাহাদিগের কাহারও কাহারও অনুকরণ করিলে নিন্দা হয় না। অমসৃণ প্রস্তর দ্রব্যাদির সহিত মমুথ (Mammoth), বল্‌গাহরিণ ও এক প্রকার ভল্লুকের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। মনুষ্যহস্ত চালিত প্রস্তর অস্ত্রের ভগ্নাবশেষ তাহাদিগের অস্থি-সংলগ্ন দেখা যায়; কোন কোন কঙ্কালে প্রস্তরঅস্ত্র-আঘাতের চিহ্ন দেদীপ্যমান আছে। সুতরাং সেই সকল জীব যে মনুষ্যের সহিত এক সময়ে পৃথিবীতে বাস করিত, সন্দেহ করিবার কারণ নাই। সে সময়ে ইয়ুরোপের মধ্যভাগে এখন অপেক্ষা শীতাধিক্য প্রবল ছিল, শীতলতা এই অংশে ন্যূন হইয়া আসিলে ঐ সকল জীব ও কস্তুরিমৃগ উত্তর মহাসাগরের উপকূলে আশ্রয় লইয়াছিল। মসৃণ প্রস্তর যুগে মনুষ্য কিয়ৎপরিমাণে কৃষিকার্য্য ও পশুপালন শিক্ষা করিয়াছিল। এই সময়ের প্রস্তরনির্ম্মিত নানা প্রকার সমাধিগৃহ অদ্যাপি ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে।

দিনামার দেশে নানা স্থানে বিশাল বিশাল ওক বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সকল বৃক্ষের বহু দূর নিম্নে ভূ-স্তর পরীক্ষা করিয়া এক প্রকার ফার (Fir) বৃক্ষের অবশেষ পাওয়া গিয়াছে। আরো নিম্নে বহু দূর খনন করিলে সকল স্থানেই পাইনবৃক্ষের অবশিষ্টাংশ দেখা যায়। সেই দেশে এখন কোথাও জীবন্ত ফার বা পাইনবৃক্ষ দেখা যায় না। সেই সকল পাইন বৃক্ষের সহিত—মনুষ্য কঙ্কাল ও মনুষ্য ব্যবহৃত প্রস্তরনির্ম্মিত কুঠার প্রভৃতি নানা প্রকার অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেই অনুমান করা যাইতে পারে, মনুষ্য কত প্রাচীন জীব।

মনুষ্যের প্রাচীনতার আর অধিক প্রমাণ আবশ্যক নাই। কোন কোন ভূ-তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুমান করেন, লক্ষ লক্ষ বৎসর মনুষ্য ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে। মনুষ্য এত প্রাচীন না হইলেও লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যে মনুষ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে অদ্যাপি যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

যেখানে মনুষ্যের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে সেই খানেই মনুষ্য-কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ অবস্থিত রহিয়াছে। সে গুলি এক প্রকার উন্নত অবস্থার পরিচায়ক। অমসৃণ প্রস্তর-যুগে মনুষ্য অগ্নি উৎপাদন করিতে শিখিয়াছিল, আম মাংস অপেক্ষা পক্ক মাংসে তাহার অধিক রুচি ছিল, তখনই নানা প্রকার কলকৌশল শিখিয়াছিল, চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর কার্য্যেও তাহার ক্ষিপ্রহস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। সে অবস্থা পাইতে মনুষ্যের আরো কত কত যুগ গিয়াছে! যে বর্ব্বর অবস্থায় লোমশ, দীর্ঘহস্ত বক্রপদ মনুষ্য গ্রহ-চক্ষে মর্কট তুল্য প্রতীয়মান হইত সে অবস্থা কত যুগ পূর্ব্বে বুদ্ধিবিশিষ্ট মানব-সন্তান অতিক্রম করিয়াছে? তাহার পরিচয় কোথায় পাইব? অতি বন্য মনুষ্যের এখন যে অবস্থা, এক সময়ে মানব জাতির অবস্থা তাহা অপেক্ষা হীনতর ছিল, সন্দেহ নাই। বন্য জাতি স্বভাবতঃ স্থিতি-শীল হইলেও সময়-স্রোতে বন্য সমাজেও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভূ-পঞ্জরে যে চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে তাহাতেই মনুষ্য-জন্ম লক্ষাধিক বৎসর স্থির হইয়াছে। যে প্রমাণ হারাইয়া গিয়াছে, মহাসাগরের গর্ভে লুক্কায়িত আছে বা অদ্যাপি প্রকাশ হয় নাই, তাহা প্রকাশিত হইলে মনুষ্য আরো কত পুরাতন জীব বলিয়া নির্ণীত হইবে, অনুমান করা যায় না। যে সকল বনচারী শ্বাপদদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রথম পুরুষদিগের আত্মরক্ষা করিতে হইত,* যাহাদিগের আম মাংসে উদর পূর্ণ করিতে হইত, এখন তাহারা স্থানভ্রষ্ট কক্ষভ্রষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য জন্মের পর পৃথিবীতে এতই যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তখনকার জীব ও উদ্ভিদ রাজ্যের

অনেক প্রজা এখন নাই ; এখন যাহারা আছে, তাহাদের অনেকের তখন জন্ম হয় নাই। আচার্য্য হক্‌সলে বলেন তখনও উত্তর আমেরিকার, ব্রিটিশ দ্বীপের মধ্য-আসিয়ার ও উত্তর আসিয়ার অধিকাংশ মহাসাগরের গর্ভে নিহিত ছিল। তাহারা একবার উঠিয়া আবার ডুবিয়া আবার ভাসিয়াছে। তখন কাস্পীয় ও আরাল হ্রদ বিচ্ছিন্ন হয় নাই এবং উভয়ের সহিত এক দিকে উত্তর মহাসাগর অন্যদিকে ভূমধ্যসাগরের সংযোগ ছিল। তখন স্থলপথে জার্ম্মণি ও ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে গতায়াত করা যাইত। তখন যে সকল দেশ ও পর্ব্বত-পৃষ্ঠে সূর্য্য-কিরণ প্রতিভাত হইত, তাহাদিগের কত কত সমুদ্র-তলে ডুবিয়া গিয়াছে, বলা দুষ্কর। মনুষ্য-জন্মের পরে আণ্ডিস গিরিমালার জন্ম হইয়াছে, মনুষ্য-জন্ম সময়ে আফ্রিকার পার্শ্ব হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত একটী মহাদ্বীপ সমুদ্র-বক্ষে ভাসিত, তাহারই শিখরে জাবা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। পণ্ডিতেরা এই মহাদেশকে লেমুরিয়া আখ্যা দান করিয়াছেন এবং অনুমান করেন এখানেই মনুষ্যের প্রথম অভ্যুদয়। মুসো জলি বলেন, মনুষ্য-জন্মের বহু পরে সিসিলি আফ্রিকা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, সাহারা সমুদ্র মরুভূমে পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার মালক্ষেত্র ও পূর্ব্ব রুশিয়ার বিশাল প্রান্তর সকল, টস্কানির জলাভূমি প্রভৃতি কত কত স্থান মনুষ্যের পরস্তন এখনও নির্ণয় করা হয় নাই।

সুইজারলাণ্ড দেশে হ্রদ মধ্যে মনুষ্য-হস্ত গঠিত নানা প্রকার গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি সুগঠিত, নানা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। ইহাদিগের নির্ম্মাণে মনুষ্যের গৃহনির্ম্মাণ ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভূ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন মসৃণ প্রস্তর যুগে এগুলি গঠিত হইয়াছিল। এই সকল গৃহ মধ্যে নানা প্রকার অস্ত্র মৃণ্ময় পাত্র ও তন্তু নির্ম্মিত বস্ত্র খণ্ড পাওয়া গিয়াছে। এইরূপে হ্রদ মধ্যে গৃহ, সুইজারলাণ্ডের মত ইতালি, অষ্ট্রীয়া, হঙ্গারি, পোমারেনিয়া, ফ্রান্স ও সাভয় দেশেও দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা এতই পুরাতন জীব। বিংশ শতাব্দীর সভ্যসমাজের সহিত তদানীন্তন মনুষ্য সমাজের তুলনা কর—উভয় শ্রেণীর মনুষ্যকে এক জাতীয় জীব বলিয়া বিশ্বাস করা সুকঠিন হইবে। সেই বর্ব্বর মর্কটপ্রায় অবস্থা হইতে ক্রমবিকাশক্রমে সময়-বিবর্ত্তে মনুষ্য বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। আকাশের সৌদামিনী যাহার বার্ত্তাবহ, মন্দাকিনী যাহার পাঠ্যপুস্তক, অভ্রভেদী গিরিমালা যাহার প্রাঙ্গণপ্রাচীর, বিশাল সমুদ্র যাহার গোষ্পদ, জীব জড় সকলেই

যাহার আজ্ঞাবহ, দেবোপম মনুষ্য-সন্তান নগ্ন দেহে মূকের মত গিরি-বিবরে পশুবৎ আমমাংস ভক্ষণ করিত; যেখানে থাইত, সেইখানে শুইত, সেইখানেই মলমূত্র ত্যাগ করিত; পশুপক্ষীর সহিত ক্ষুন্নিবৃত্তি হেতু কাড়াকাড়ি করিত—দেখিলে কি বিশ্বাস হয়? বৃক্ষবাসী মর্কটগণকে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করা দূরে থাকুক, এক সময়ে মনুষ্য উহাদিগের সমাবস্থ ছিল, বিজ্ঞান বুঝাইয়া দিলেও অনুমান করিতে মস্তক ঘূরিয়া যায়। অথচ সেই অবস্থাই আমাদিগের প্রথমাবস্থা। কোন কোন দেশে কোন কোন জাতি সময়-স্রোতে স্খলিতগতি হইয়া মরুভূমে পড়িয়া ক্রমে হীনতর হইয়া যাইলেও সমগ্র মানবসমাজ দিনে দিনে ধীর অথচ দৃঢ়পদে উন্নতির পর উন্নতি করিয়া আসিয়াছেন। সোপান পরে সোপান অতিক্রম করিয়া মনুষ্য প্রশান্ত মহাসাগরের অন্ধবিবর হইতে ক্রমে কাঞ্চনজঙ্ঘারও অনধিগত উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা মানব-সন্তানের গৌরব আর কি হইতে পারে? মনুষ্য আপন বলে এই অপূর্ব্ব সম্ভ্রম লাভ করিয়াছে,—কোন দেবতার সাহায্য প্রয়োজন হয় নাই। এইরূপ উন্নতি-স্রোতে লক্ষ বৎসর পরে মানব সমাজ কোথায় পৌছিবে, দুরন্ত কবি-কল্পনা অনুমান করিতে পরাস্ত হইয়া যায়।

---

# দ্বিতীয় পল্লব।

লক্ষ বৎসরের মানব সমাজের ক্রম-বিকাশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা কঠিন হইলেও মনুষ্যের সাধ্যাতীত নহে। মনুষ্য-কীর্ত্তির সমাধিশেষ যুগে যুগে কবরক্ষেত্রে ও পাংশস্তূপে নিহিত হইয়াছে। মনুষ্যের হস্তগঠিত উপকরণ সকল ভূ-স্তরে মানব সমাজের পরিচয় দিতেছে,—মনুষ্যনির্ম্মিত আবাসগৃহ, কবরস্তম্ভ, চিত্র ও ভাস্কর কার্য্য নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল হইতে মানব-প্রকৃতির ক্রম-বিকাশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান অসভ্য সমাজের অবস্থা যে বহুল পরিমাণে প্রাচীন অসভ্য মানব সমাজের অবস্থার মত ছিল, অনুমান করা যায়। কোথাও দৈব বিপাকে, কোথায়ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, বিদেশীয়গণ অসভ্য সমাজে বাস করিয়া অসভ্যদিগের সামাজিক অবস্থা সম্যক বিবৃত করিয়াছেন। পৃথিবীর বর্ত্তমান জাতিদিগের

অবস্থা বর্ব্বর. অসভ্য ও সভ্য তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগের ক্রম-বিকাশ অনুসরণ করিলে, সমগ্র মানব জাতির প্রথমাবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপে ক্রমবিকশিত হইয়াছে, নির্ণয় করিতে পারা যায়। এ গ্রন্থে আমরা এই উভয় বিধ উপায় অবলম্বন করিয়া মানব-প্রকৃতির ক্রমোন্নতির আলোচনা করিব।

অতি প্রাচীন স্তরে মনুষ্য-কঙ্কালের সহিত অগ্নিদগ্ধ কাষ্ঠ, ও ইন্ধনাবর্জ্জিত ভস্মরাশি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং অতি প্রাচীন কালেও যে মনুষ্য অগ্নির ব্যবহার পরিজ্ঞাত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোন কোন জাতীয় মর্কট মনুষ্যের মত অর্থযুক্ত ভাষা ব্যবহার করে দেখা গিয়াছে; কিন্তু মনুষ্যের মত অগ্নি-উৎপাদন-ক্ষমতা আর কোন জীবের নাই। অগ্নি কি প্রকারে পৃথিবীতে প্রথমে আসিল, তৎসম্বন্ধে নানা দেশে নানা আখ্যায়িকা আছে। সে সকল আলোড়ন করিয়া ভাষা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অগ্নি উৎপাদনকারী প্রথম মহাপুরুষের পরিচয় সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। গ্রীশদেশে অতি প্রাচীন কালে একটী প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, প্রমিথুঃ নামে এক দৈত্য স্বর্গ হইতে অগ্নি অপহরণ করিয়া পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন গ্রীক 'প্রমিথুঃ' শব্দ সংস্কৃত 'প্রমন্থ' শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দুগণ যজ্ঞক্ষেত্রে হোম করিবার জন্য এক খণ্ড কাষ্ঠে আর এক খণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া পবিত্র অগ্নি উৎপাদন করেন। ঋগ্বেদে এইরূপ উপায়ে পূত অগ্নি উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। ঋগ্বেদে ঐ কাষ্ঠ খণ্ডকে 'প্রমন্থ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং গ্রীক ও হিন্দু আর্য্যগণ বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে চক্ষুষ(Oxus)নদীকূলে সহবাস কালে যে, 'প্রমন্থ' শব্দের উদ্ভব হইয়াছিল সন্দেহ নাই, এবং সে সময়ে ঋগ্বেদোক্ত ব্যবস্থা মত কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে যে প্রাচীন আর্য্যগণ অগ্নি উৎপাদন করিতে শিখিয়াছিলেন বুঝা যায়। আমরা স্থানান্তরে দেখাইব নানা দেশীয় বন্য জাতির মধ্যে এই উপায়ে বা দুই খণ্ড প্রস্তর ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিবার রীতি প্রচলিত আছে। অমসৃণ প্রস্তর-যুগ-বাসী পূর্ব্ব পুরুষেরাও যে এইরূপ কোন প্রকারে অগ্নি উৎপাদন করিতেন, অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ কোন কোন স্থানে সেই সময়ের মনুষ্যগৃহে নানা প্রকার অগ্নি-প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে; এবং সে গুলি যে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল, দেখিলেই বুঝা যায়। আবে বুর্জো বলেন তৃতীয় কল্পের দ্বিতীয় যুগে মনুষ্য এইরূপে অগ্নি উৎপাদন করিত এবং তদানীন্তন ভূ-স্তরে স্তনদন্ত হস্তী-কঙ্কালের সহিত ঐরূপ অগ্নি-প্রস্তর পাওয়া

গিয়াছে। কিন্তু তত প্রাচীন কালে প্রস্তর ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদনের অনুমান যথার্থ না হইলেও চতুর্থ কল্পের আরম্ভেই যে মানুষ অগ্নির ব্যবহার করিত,সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। চতুর্থ কল্পের স্তর সকলে ও গিরিগুহায় ইন্ধন, ভস্ম, অগ্নিদগ্ধ অস্থি, ধূমকৃষ্ণ পাত্র রাশি রাঁশি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং গুহাবাসী তদানীন্তন মনুষ্যেরা যে রন্ধন করিয়া আহার্য্য ভক্ষণ করিত, সহজেই বুঝা যায়। রন্ধন কার্য্য ভিন্ন শবদেহ সৎকার করিতে, নৌকার কাষ্ঠ বক্র করিতে, হ্রদমধ্যে গৃহ প্রস্তুত করিলে হ্রদজলে কাষ্ঠস্তম্ভ সকল শীঘ্র বিনষ্ট না হয়, এজন্য সে গুলিকে ধূমপক্ক করিতে, দীপশলাকার মত কাষ্ঠ জ্বালিয়া রাত্রির অন্ধকার দূর করিতে তাহারা অগ্নির ব্যবহার করিত।

বোধ হয়, মনুষ্য জাতি প্রথমে মর্কটদিগের মত ফল মূল ভক্ষণ করিয়া দিন পাত করিত। ক্রমে মনুষ্য মাংসভক্ষণপটু হইয়া উঠে। পশু ও মৎস্য মাংসে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। পশুদিগের মধ্যে ভল্লুক, মমন্থ, বল্‌গা হরিণ ও গণ্ডার মাংস প্রথম মনুষ্যেরা ভোজ্যরূপে গ্রহণ করিত। তাহার পরে মেষ, বন্যছাগ ও বন্য শূকরের মাংস তাহাদিগের নিত্য আহার্য্যরূপে পরিণত হয়। শৃগাল ও কুকুরের মাংস আহারেও তাহাদের বিদ্বেষ ছিল না। মাংসের অপেক্ষা অস্থিগত মজ্জার তাহারা বিশেষ সমাদর করিত। কৃষ্ণ কুক্কুট, হংস প্রভৃতি কয়েক প্রকার পক্ষী, নানাজাতীয় মৎস্য ও শম্বুক প্রভৃতিরও ব্যবহার ছিল। হ্রদবাসিগণ গৃহপালিত পশুর দুগ্ধও ব্যবহার করিত। কোন কোন জাতি নর-মাংসও বড় সুস্বাদু মনে করিত। ইহারা লবণের ব্যবহারও জানিত। কোন কোন জাতি মদ্য প্রস্তুত করিতেও শিখিয়াছিল। তখনও মৃণ্ময় পাত্রের উদ্ভাবন হয় নাই। যাহারা পূর্ব্বে আম মাংসে উদর পূর্ণ করিত, অগ্নিদগ্ধ মাংস তাহা-দিগের নিকট পরম সুমিষ্ট অনুভূত হইয়া থাকিবে। কিরূপে মৃৎপাত্রের উদ্ভাবন হইয়াছিল, স্থানান্তরে দেখান যাইবে।

মৃগয়া-লব্ধ মাংসে উদর-পূর্ত্তি মনুষ্য সমাজের প্রথম অবস্থা। মৃগয়ায় সকল দিন সফল হওয়া সম্ভব নহে। কখন কখন উপবাস-যন্ত্রনাও সহ্য করিতে হয়। সেইরূপ বিপদ্ নিরাকরণের জন্য ফাঁদ পাতিয়া বন্য পশু ধরিয়া গৃহে সঞ্চয় রাখিতে মনুষ্য বাধ্য হইয়াছিল। পশুপালন মনুষ্য সমাজের দ্বিতীয় অবস্থা। আবার পশুপালনে প্রবৃত্ত হইলে কিছু সময় এক স্থানে বাস করিতে হয়। তখন শস্য রোপণ করিয়া ফলভোগ করিতে স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মে। কৃষিকার্য্যে জীবিকা-নির্ব্বাহ মনুষ্য সমাজের তৃতীয় অবস্থা। হ্রদবাসিদিগের মধ্যে পশুপালনের আমরা

প্রথম পরিচয় পাই। হ্রদ ও গুহাবাসিগণ পশুচর্ম্মে ও পশুলোমে দেহ আবৃত করিয়া শীত নিবারণ করিত। লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্রের উদ্ভাবন হয় নাই, একথা বিশেষরূপে বলিবার আবশ্যক করে না। শীতপ্রধান দেশবাসিদিগের মধ্যে বস্ত্রব্যবহার রীতি প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ধাতু-ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই, মনুষ্য তখনই বস্ত্র-ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিল। মাটী পোড়াইয়া এক প্রকার বোতাম প্রস্তুত করিয়া গলার নীচ আচ্ছাদন বদ্ধ করিয়া রাখা হইত। তখন সূচের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল। গাছের কাঁটার অনুকরণে সূচের উদ্ভাবন হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, সূচ দ্বারা সিলাই করা চর্ম্ম গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সুইজারলাণ্ডের গুহা মধ্যে বল্গা হরিণের কঙ্কালের সহিত পাওয়া গিয়াছে। তখন চতুর্থ কল্পের দ্বিতীয় যুগ বা মসৃণ প্রস্তরযুগ। বৃক্ষতন্তু বা সূক্ষ্ম পশুচর্ম্মে সূত্রের কার্য্য সমাধা হইত। গাত্রবস্ত্র প্রস্তুত করিতে চর্ম্ম বা বল্কল মসৃণ করিবার ব্যবস্থা তাহাদিগের অপরিজ্ঞাত ছিল না। প্রথমতঃ বৃক্ষকঞ্চুক বা মসৃণ চর্ম্মে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকিলেও ধাতু ব্যবহারের পূর্ব্বেই কার্পাস ও বৃক্ষতন্তু-নির্ম্মিত বস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বস্ত্র বয়ন করিবার তকুটী কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত হইত এবং প্রস্তর বা মৃৎবর্ত্তুল বাঁধিয়া দিয়া তাহার ভার বৃদ্ধি করা হইত।

কি পুরুষ কি স্ত্রী, মনুষ্যের অলঙ্কারপ্রিয়তা এত অধিক যে অমসৃণ প্রস্তর-ব্যবহার যুগেও অলঙ্কার ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে—মসৃণ প্রস্তর যুগের ত কথাই নাই। হ্রদগর্ভে, গুহামধ্যে ও কবর-গৃহে যে সকল অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা জানা যায় সেই প্রাচীন কালের নরনারীগণ কুকুর, ব্যাঘ্র, হরিণ, বৃষ ও অশ্বের দন্ত সকলে মালা গাঁথিয়া হারের মত গলায় পরিধান করিত। শুক্তি ও শম্বু-কেরমালাও অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। দগ্ধ মৃত্তিকা, অস্থি, প্রস্তর ও কাষ্ঠের মালাও ব্যবহৃত হইত। বালা, মল, মাকড়ি, খোঁপার কাঠিও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অনেকগুলি সুগঠিত। কোথাও কোথাও কাঠের চিরুণী পাওয়া গিয়াছে। মল, বালা ও মাকড়ি শুক্তির খোলায় প্রস্তুত হইত। কোন কোন জাতি শুক্তির মালা দেহ আচ্ছাদনের জন্য বস্ত্রের মত ব্যবহার করিত। ফ্রান্স দেশের গুহামধ্যে এইরূপ কয়েকখানি বস্ত্র পাওয়া গিয়াছে।

অস্ত্র বিনা বনবাসে মনুষ্যের একদিনও চলে না। কোন কোন জাতীয় বানর শত্রুকে প্রস্তর প্রক্ষেপ করিয়া আঘাত করে দেখা গিয়াছে। প্রথম পুরুষেরাও প্রথমতঃ প্রস্তর আঘাতে শত্রু পরাজয় করিত। পশুপক্ষীর স্বর অনুকরণ করিয়া চীৎকার করিলে সহানুভূতি প্রণোদিত হইয়া তাহারা নিকটে

আসে। তখন প্রস্তর আঘাত করিয়া তাহাদিগকে অদ্যাপি নানাজাতীয় অসভ্যেরা হত্যা করে। প্রস্তর আঘাত দূর হইতেও সম্পন্ন হইতে পারে। দূরে সফল হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে অলক্ষিত ভাবে নিকটে গিয়া আঘাত করিতে পারা যায়। ক্রমে কিছু উন্নত হইলে অন্যান্য নানা প্রকার অস্ত্র মনুষ্য উদ্ভাবন করিয়াছিল। যে প্রাচীন সময়ের অবস্থা আমরা বর্ণন করিতেছি, সে সময়ে ধনুর্ব্বাণ, ফিঙ্গা, গোফলা, বর্শা, ছুরি, তরবারি, গদা,শূল ও কুঠার অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। কোন স্থিতিস্থাপক কাষ্ঠে বৃক্ষতন্তু গুণরূপে সংযোজিত করিলেই ধনুক হইত। বর্শা বা তীরের ফলা, দাত্র ও কুঠার প্রভৃতি প্রস্তরে নির্ম্মিত হইত, বলা বাহুল্য। করমুষ্টি কাষ্ঠ বা অস্থি দ্বারা প্রস্তুত হইত। ইহাদিগের আকার বর্ত্তমান ঐরূপ অস্ত্রের মুষ্টির মত। অনেকগুলি সুগঠিত,সকলেই সূক্ষ্মাগ্র। ভূস্তরে যে যুদ্ধ-কুঠার পাওয়া গিয়াছে, এতদিন পরেও তাহার আঘাতে বৃক্ষাদি ছেদন করিতে পারা যায়। কোন প্রকার ধাতু-যন্ত্র অভাবে কি প্রকারে প্রস্তরে তাহারা এ প্রকার সুগঠিত কার্য্যকরী অস্ত্র সকল প্রস্তুত করিত, কল্পনা করা যায় না। অথবা দশ হস্তীর গুরুভার প্রকাণ্ড প্রস্তর শূন্যে তুলিয়া যাহারা কবরস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছে—ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে এরূপ কর্ম্ম তাহারা সমাধা করিবে আশ্চর্য্য কি? সুইজারলাণ্ডের হ্রদ হইতে এক প্রকার গোলা পাওয়া গিয়াছে। এগুলি মৃত্তিকা ও অঙ্গার মিশ্রণে প্রস্তুত হইত। অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অগ্নিপ্রায় উত্তপ্ত হইলে এই গোলা সকল শত্রুর গৃহের উপর প্রক্ষেপ করা হইত। হ্রদ মধ্যস্থ গৃহগুলি দেখিলেই বোধ হয়, তাহারা কয়েক বার অনলদাহ সহ্য করিয়াছিল। হয় ত এইরূপ কৌশলে শত্রুগণ তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া থাকিবে। শ্বাপদদিগের গন্তব্য পথে ভূগর্ভে গর্ত্ত কাটিয়া পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে অসাবধান জীবগণ গর্ত্ত মধ্যে পড়িয়া যায়। তখন তাহাদিগকে হত্যা করা সহজ। প্রস্তরযুগের মনুষ্যেরা এ প্রকার উপায়ও অবলম্বন করিত, প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

মৎস্য ধরিবার জন্য শূল, বড়িশ ও জাল ব্যবহৃত হইত। সুকৌশলে রচিত কয়েক খণ্ড জাল সুইজারলাণ্ড দেশীয় কনষ্টানস্ হ্রদের গৃহ মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। জলে শীঘ্র ডুবিবার জন্য জালে অধুনা আয়স মালা বাঁধিয়া রাখিবার রীতি দেখা যায়। তখন অগ্নিদগ্ধ মৃৎবর্ত্তুল গাঁথিয়া দিবার প্রথা ছিল। এখনও কোন কোন দেশে এই রীতি প্রচলিত আছে। পুনশ্চ জলে ভাসাইয়া রাখিবার জন্য শোলা ব্যবহার করা হয়, তখন কাষ্ঠ খণ্ডে সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত।

অদ্যাপি পুরী নগরে নুলিয়া ধীবরগণ সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার সময় এইরূপ কাষ্ঠ খণ্ড ব্যবহার করিয়া থাকে। বড়িশ ও শূল প্রস্তর, অস্থি বা শুক্তির কোষে প্রস্তুত হইত। বড়িশে এখন যেরূপ কর্ণ থাকে, তখনকার বড়িশেও সেইরূপ থাকিত। ধনুকে ব্যবহৃত তীর সকলও সকর্ণ নির্ম্মিত হইত। শূলের অপর প্রান্তে এখনকার মত রজ্জু বদ্ধ থাকিত না।

এক সময়ে মনুষ্য প্রস্তর দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া প্রস্তর মসৃণ করিতে জানিত না। কিন্তু ক্রমে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নানা প্রকার অস্ত্র উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল। অমসৃণ প্রস্তর যুগে গৃহ-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে সকল অস্ত্র ব্যবহার হইত, তন্মধ্যে ছুরি, কুঠার, মুদ্গর, বৃক্ষাদন, ঘর্ষণী, শান, এবং করপত্র প্রধান। বল্গা হরিণের সমকালীন লোকেরা কাষ্ঠবেধনী, চর্ম্মভেদিকা ও সূচ প্রস্তুত করিয়াছিল। অস্থি দ্বারা সূচ ও হরিণ শৃঙ্গে মুদ্গর প্রস্তুত হইত। মুষ্টি-কাষ্ঠ ছিদ্র করিয়া ছুরিকা ও কুঠার প্রভৃতি তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইত, কখন বা লতাবন্ধন জড়িত করিত। অদ্যাপি ফিজি ও নবকালিডানিয়ার অধিবাসীরা এইরূপে অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রস্তরে ছিদ্র করিবার কৌশল মসৃণ প্রস্তর যুগের অধিবাসীরাও জানিত না, পিত্তল যুগে তাহার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। মসৃণ প্রস্তর যুগের অস্ত্র সকল দেখিতে যেরূপ সুন্দর সেইরূপ সূক্ষ্মাগ্র। এই যুগে শস্যাদি নিষ্পেষিত করিবার জন্য উদূখলের প্রথম সৃষ্টি হয়। উদূখলের আকার তখনও যেরূপ, অদ্যাপিও সেইরূপ, কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।

পিত্তল যুগের পূর্ব্বে ইতালি ও সুইজারলাণ্ড দেশে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। ভল্লুক বা বল্গা হরিণের সহিত যে সকল গুহায় মনুষ্য কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, সে সকলের মধ্যে কৃষি কর্ম্মের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সুতরাং কৃষিকার্য্য অপেক্ষাকৃত পরস্তন বলিতে হইবে। হ্রদগৃহে এবং ইতালির নানা অংশে মসৃণ প্রস্তর যুগের রাশি রাশি নানা জাতীয় যব ও গোধূম পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন মটর, মসুর, কলাই প্রভৃতি কয়েক প্রকার ডাউলেরও তাহারা চাষ করিত। আতা, জাম, কুল প্রভৃতি নানা প্রকার সুস্বাদু ফলেরও ব্যবহার হইত। বস্ত্র বয়ন ও রজ্জু প্রস্তুত করিবার জন্য পাটের চাষ হইত। পাটের বীজ প্রচুর পরিমাণে হ্রদমধ্যস্থ গৃহ সকলে পাওয়া গিয়াছে। লতা দ্বারা সে সময়ে সুন্দর করণ্ড প্রস্তুত হইত।

কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি অতি সামান্য প্রকারের ছিল। হরিণের শৃঙ্গ, জন্তু বিশেষের কণ্ঠাস্থি বা বৃক্ষের শাখা প্রথম কৃষাণেরা ভূমি খনন করিতে ব্যবহার

করিয়া থাকিবে। বসুমতী এত উর্ব্বরা ছিলেন যে, গাঢ় খননের কিছুমাত্র আবশ্যক হইত না। অদ্যাপি বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্যে তিমি মৎস্যের অস্থি বা কাষ্ঠখণ্ড কোদালির মত খনন কার্য্যে ব্যবহার হয়, মুদ্গর আঘাতে উৎপাটিত মৃত্তিকা সকল চূর্ণ করা হয়। মাটী ছড়াইবার জন্য কচ্ছপের খোলা এবং ধান্য কাটিবার জন্য শুক্তি বিশেষই যথেষ্ট।

অন্য জন্তু মনুষ্যের সাহায্য ভিন্ন :সুখে থাকিতে পারে—কিন্তু অন্য জন্তুর সাহায্য ভিন্ন মনুষ্যের দিনপাত হওয়া সুকঠিন। শিকারে কুকুরের সাহায্য পাইয়া মনুষ্য উন্নত জীব বলিয়া গণ্য হইবার সুবিধা পাইয়াছিল। কুকুরকে পোষ মানাইবার পূর্ব্বে মৃগয়া ব্যাপারে মনুষ্যের সমস্ত সময় অতিপাত হইত। কুকুর পাইয়া মনুষ্যের অবসর হইয়াছিল। সেই প্রাচীনতম সময়ে মনুষ্য মনো-বিকাশের যে কিছু চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, সকলই কুকুরের সাহায্যে অবসর পাই-বার ফল। কুকুর মনুষ্যের চির বন্ধু।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মৃগয়ালব্ধ জীবন্ত জন্তুদিগের মধ্যে যাহাদিগকে সময়ান্তরে ব্যবহার করিবার জন্য রাখিয়া দেওয়া হইত—তাহারাই ক্রমে পালিত জন্তু হইয়াছিল। পশুদিগের মধ্যে সংসর্গপ্রিয়তা যাহাদিগের অধিক, তাহারাই গৃহপালিত পশুর অগ্রগণ্য। কিন্তু তাহাদিগকেও পোষ মানাইতে প্রথম মনুষ্য-দিগকে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, এখন আমরা তাহা কল্পনা করিতে পারি না। কি অশ্ব, কি বৃষ, মনুষ্যের শাসন স্কন্ধে লইতে কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক বনবাস পরিত্যাগ করিয়া জনপদে উপস্থিত হয় নাই। বন্য পশুদিগের মধ্যে কুকুর মনুষ্যদিগের প্রথম সহায়। এতদ্ভিন্ন অতি প্রাচীন কাল হইতে বৃষ, অশ্ব, মেষ, শূকর, পারাবত, হংস ও কুক্কুট গৃহপালিত হইয়া আসিতেছে। যাহাদিগের শক্তি, লোম, চর্ম্ম, মাংস বা দুগ্ধে মনুষ্যের উপকারের সম্ভাবনা, মনুষ্য তাহাদিগকেই সযত্নে পালন করিয়া আসিতেছে। আবার মনুষ্যের সংসর্গে ইহাদিগের আকৃতি ও প্রকৃতি এত বিভিন্ন হইয়াছে যে, তুলনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বিড়া-লের সামাজিক প্রবৃত্তি অতি ক্ষীণ এবং বিড়ালের মাংসও সুস্বাদু নহে। মসৃণ প্রস্তর যুগেরও গৃহাবাসে বিড়ালের চিহ্ন পাওয়া যায় না। বিড়াল পূর্ব্বোল্লিখিত জন্তুদিগের অনেক পরে মনুষ্যের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল। সেইজন্য গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে বিড়াল সর্ব্বাপেক্ষা অসামাজিক।

মমন্থের সহযোগী মনুষ্য-কঙ্কালের সহিত মৃত্তিকার অনেক নিম্নে এক প্রকার নৌকা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং অমসৃণ প্রস্তরযুগেও যে মনুষ্য নৌকায় জল

পথে ভ্রমণ করিত সন্দেহ নাই। হলাণ্ড, ইংলাণ্ড, স্কট্লাণ্ড, ফ্রান্স ও সুইজার-লাণ্ডের লোকেরা নৌকায় চড়িয়া সমুদ্র হইতে মৎস্য ধরিয়া আনিত প্রমাণ পাওয়া যায়। তাৎকালিক আবর্জ্জনা সকলের মধ্যে সমুদ্রজাত মৎস্যের অস্থি দেখা যায়। মসৃণ প্রস্তরযুগের যে সকল নৌকা পাওয়া যায়, সেগুলি বৃহদাকার —দশ হইতে পঞ্চাশ ফিট লম্বা এবং দুই হইতে চারি ফিট বিস্তার, একটী বৃহৎ ওক বৃক্ষ কাটিয়া প্রস্তুত হইত, দেখিতে আমাদের দেশীয় তালের নৌকার মত। তখন পাল দিয়া নৌকা চালাইবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই, দাঁড় টানিয়া সেগুলি বাহিতে হইত। এইরূপ নৌকাযোগে দূরস্থ-দ্বীপ হইতে প্রস্তর আনিয়া সেই সময়ের লোকেরা অস্ত্র, গৃহ ও কবরাদি প্রস্তুত করিত।

যখন ধাতু ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই, তখনও সূক্ষ্মশিল্পে মনুষ্যদিগের সামান্য চাতুরী জন্মে নাই। হস্তিদন্তে, অস্থির উপর বা প্রস্তরে ফ্রান্সে যে সকল পুরাতন চিত্র পাওয়া গিয়াছে, দেখিলে তাহাদিগের চিত্রবিদ্যার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। সেই সকল চিত্র হইতে মমথ প্রভৃতি অতীতকালের পশুদিগের আকৃতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। চিত্রগুলি জীবন্তপ্রায়, সতেজ, অস্থিবিদ্যার পরিচায়ক, চিত্রকরদিগের অনুকরণীয়। বেল্জিয়ম বা ইংলাণ্ডে প্রাচীন চিত্রের এইরূপ অবশেষ কুত্রাপি পাওয়া যায় নাই। ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা এইরূপ চিত্র-নিপুণতার জন্য একমাত্র গৌরবাস্পদ। ইহাঁরা অমসৃণ প্রস্তরযুগে জীবিত ছিলেন। বোধ হয় ইহাঁদিগেরই সন্তানসন্ততি এখন কানারি প্রভৃতি দ্বীপে বাস করিতেছে। ইহারাও শিল্প চাতুরীর জন্য বিখ্যাত।

প্রাচীন পুরুষেরা বিভিন্ন পদার্থ মিশ্রিত করিয়া রঙ্গ ফলাইতে জানিত। তাহাদের প্রস্তুত রঙ্গ এত দীর্ঘস্থায়ী যে, অদ্যাপি তাহাদিগের হস্তরঞ্জিত দ্রব্যাদি সহস্র সহস্র বৎসর ভূগর্ভে থাকিয়াও, বিবর্ণ হয় নাই। বর্ণক চূর্ণ করিবার সেই উদূখল, সেই বিভিন্ন পদার্থ, যে শুক্তি মধ্যে রঙ্গ রাখা হইত সেই শুক্তি, প্রাচীন চিত্রকরদিগের নানাপ্রকার উপকরণ আমাদিগের সম্মুখে থাকিয়া তাহাদিগের নিপুণতার, মনোবিকাশের ও সামাজিক অবস্থার পরিচয় দিতেছে। কাল আপন কঠোর হস্তে সেই দীর্ঘ স্থায়ী নিদর্শন সকল ধ্বংস করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহাদিগের মধ্যে সঙ্গীতচর্চ্চা কতদূর হইয়াছিল, অদ্যাপি জানা যায় নাই। এ পর্য্যন্ত কেবল কয়েক প্রকার বংশী ও বেণু পাওয়া গিয়াছে।

চিত্র ও ভাস্কর বিদ্যা আরম্ভ হইবার অনেক পরে মৃণ্ময় পাত্রের উদ্ভাবন হই-য়াছিল। প্রথমে কাষ্ঠ বা প্রস্তরপাত্র ও পশুদিগের শৃঙ্গ স্থালীর ন্যায় গৃহকার্য্যে,

রন্ধনশালায় ও জলপানার্থ ব্যবহৃত হইত। কাষ্ঠপাত্রে, লতাকরণ্ডে, নারিকেল প্রভৃতি ফলের কোষে মৃত্তিকা লেপিয়া প্রথম মৃৎস্থালীর সৃষ্টি হইয়াছিল, ক্রমে সম্পূর্ণ মৃন্ময় পাত্রের উদ্ভাবন হয়। সিসিলি প্রভৃতি কোন কোন স্থানে চতুর্থ কল্পের প্রথম যুগে মৃৎপাত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেখানে এই সকল মৃৎ-পাত্রের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, এক সময়ে সেখানে সমুদ্র ছিল, এখন সেস্থান ভূমধ্য সাগর হইতে তিন শত ফিট উচ্চে অবস্থিত। মসৃণ প্রস্তরযুগে নানাস্থানে মৃৎপাত্র ব্যবহার হইত। আমেরিকা দেশীয় প্রাচীন মৃৎপাত্র সকল নানাপ্রকার ফলের অনুকরণে গঠিত।

চিত্র হইতে লিখনের ক্রমোন্মেষ। চিত্রকার্য্যে বা মৃৎপাত্র নির্ম্মাণে প্রথম পুরুষদিগের চাতুরী জন্মিয়া থাকিলেও প্রস্তর ব্যবহার যুগে তাঁহারা যে, মনোভাব লিখিয়া প্রকাশ করিতে জানিতেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ধাতুপাত্র ব্যবহার সময়ে মনুষ্য লিখন প্রথা উদ্ভাবন করিয়াছিল। ধাতুব্যবহার কাল ইদানীন্তন এবং সভ্যতার পরিচায়ক; সুতরাং ধাতুব্যবহার কালে মনু-ষ্যের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই। প্রাচ্য দেশীয় যে কোন সমাজের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াই তাহা অবগত হইতে পারা যায়। পৃথিবীর তৃতীয় চতুর্থাংশ স্থান অদ্যাপি ধাতুব্যবহার যুগ অতিক্রম করিতে পারে নাই।

প্রস্তরব্যবহার যুগে ধর্ম্মমতের কত দূর বিকাশ হইয়াছিল, নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তথাপি সে সময়েও যে, প্রেতপুরুষে ও আত্মার পরলোকত্বে মনুষ্যের বিশ্বাস ছিল, বলা যাইতে পারে। কবর মধ্যে যে সকল অস্ত্র, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি নানা প্রকার পদার্থ পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা বুঝা যায়, পরকালে আত্মার সাহায্যার্থ স্নেহশীল আত্মীয় কুটুম্বেরা সে সকল দ্রব্য মৃত পুরুষের সঙ্গে প্রেরণ করিত। ধনুষ্টঙ্কারাদি নানাবিধ রোগ প্রেতআক্রমণজনিত বলিয়া অদ্যাপি নানা দেশীয় অসভ্যেরা বিশ্বাস করে, এইরূপ বিশ্বাস সেই প্রাচীন সমাজেও প্রচলিত ছিল। কাহারও ঐরূপ রোগ হইলে প্রেতযোনিকে দূরীভূত করিবার জন্য পীড়িতের মস্তকের এক খণ্ড অস্থি কাটিয়া প্রেতদিগের প্রস্থানের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিত। এইরূপ অস্থিখণ্ডশূন্য অনেক গুলি মস্তক চতুর্থ কল্পের প্রথম যুগে পাওয়া গিয়াছে। কেহ মরিয়া যাইলে, তাহার মস্তকের কয়েক খণ্ড অস্থি তুলিয়া লইয়া কবচ স্বরূপেও ব্যবহার করা হইত। অস্থি বা প্রস্তর-নির্ম্মিত অনেকগুলি কবচ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যস্থানে এক একটী রন্ধ্র

আছে, বোধ হয়, হস্তোপরি বা গলদেশে কবচ সকল বাঁধিয়া রাখা হইত।

প্রেতযোনি পরিতুষ্ট করিবার জন্য নরবলিপ্রথা অসভ্য সমাজে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। প্রাচীন মানবজাতির মধ্যেও নরবলির যথেষ্ট নিদর্শন আছে। দেবতাকে বলি দিয়া নরমাংস ভক্তেরা প্রসাদ পাইত।

প্রতিমাপূজা মানব-সমাজে ধর্ম্মমতের উন্নতির পরিচায়ক। প্রস্তরব্যবহার যুগে কুত্রাপি প্রতিমাপূজার চিহ্ন দেখা যায় না। যাহাদিগের হস্তনির্ম্মিত প্রস্তর-গৃহ ও সমাধিস্তম্ভ সহস্র সহস্র বৎসর কালের কঠোর শাসন উপহাস করিয়া অদ্যাপি জীবন্তভাবে উদ্ভাবয়িতাদিগের মনোবিকাশের পরিচয় দিতেছে, প্রতিমা পূজা তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকিলে ভূপঞ্জরে প্রস্তর, অস্থি বা দারুনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তির অবশ্যই নিদর্শন দেখিতাম। য়ুরোপ হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত, আসিয়া ও আমেরিকা মহাদেশে কুত্রাপি এরূপ মূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই।

ভূপঞ্জরের নিদশন প্রমাণে প্রাচীন মানব সমাজের ইতিবৃত্ত যতদূর অবধারিত হইয়াছে, আমরা এই পল্লবে সংগ্রহ করিলাম। কল্পনাপ্রিয় কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ আরো অনেক কথা লিখিয়াছেন, সেগুলি অনুমান মাত্র। বিজ্ঞানে কল্পনার প্রশ্রয় যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং সেগুলি বিবৃত করিয়া গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি করা আবশ্যক বোধ হইল না। অতঃপর বর্ত্তমান অসভ্যসমাজের অবস্থা তুলনা করিয়া মানবজাতির দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্রম পরিণতির ইতিবৃত্ত সংগ্রহের চেষ্টা করা যাইবে।

---

## তৃতীয় পল্লব।

এখন বন্য সমাজ যেরূপ, প্রাচীন সমাজ ঠিক সেইরূপ ছিল। এখন বন্য সমাজের যে প্রকার ক্রমোন্মেষ হইতেছে, প্রাচীন সমাজেরও যে সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, নিঃসংশয়ে বলা যায় না। পুনশ্চ অধ্যবসায় ও উৎসাহ অসীম হইলেও পরিষ্কৃতবুদ্ধি সভ্য ও বিদেশীয়দিগের পক্ষে অস্ফুটবুদ্ধি অসভ্যদিগের অবস্থা নির্ণয় করা বড় কঠিন। বনবাসিগণ বালকের মত অস্থিরপ্রকৃতি। এক সময়ে একজন জাতিবিশেষের যে প্রকৃতি লক্ষ্য করিল, সময়ান্তরে অপরে তাহার বিপ-

রীত প্রকৃতি দেখিয়া আসিল। কেহ বা জাতি বিশেষের শান্তস্বভাবে মোহিত হইয়াছে, কেহ বা দুরন্ত বলিয়া তাহাদিগের নিন্দা করিয়াছে। অথচ দুই জন পরিব্রাজকই সত্যশীল, দর্শনপটু পণ্ডিত। আবার কোন্ প্রকৃতিটী মৌলিক, কোন্টী বিদেশীয়দিগের নিকট অভ্যস্ত, কোন্টী স্বাভাবিক, কোন্টী বিকার-জনিত, নির্ণয় করা কঠিন। এক সময়ে বিদেশীয়দিগকে যাহারা আদরে আশ্রয় দেয়, সময়ান্তরে বিদেশীয়ের ব্যবহারে পীড়িত হইয়া তাহারা বিদেশীয়ের সহিত আলাপ করিতে ঘৃণা করে। বিদেশীয়দিগের সংস্রবে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতি-দিগের প্রকৃতিবিকারের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী স্বাভাবিক অন্তরায় বশতঃ অসভ্যপ্রকৃতির বিভিন্ন ভাব নির্ণয় করা কঠিন। সভ্য বিদেশীয়গণ বহুযত্নে অসভ্যদিগের ভাষা শিক্ষা করিয়াও ভাষার অপক্কতা হেতু তাহাদিগের মনোগত অর্থ নির্ণয় করিতে পারেন না। অসভ্যদিগের অস্ফুট ভাষায় অল্পসংখ্যক শব্দে নানা প্রকার ভাব প্রকাশ করিতে হয়, সুতরাং এক একটী শব্দের অনেক গুলি অর্থ। পুনশ্চ নানা কারণে অসভ্য ভাষার আশু পরিবর্ত্তন ঘটে। একজন সর্দ্দারের শাসনকালে যে শব্দের যে অর্থ ছিল, তাহার উত্তরাধিকারীর শাসন কালে তাহার বিপরীত অর্থ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এই সকল কারণে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইলেও তাহার মর্ম্ম অবধারণ করা যায় না। অধিকন্তু সভ্য জাতির প্রশ্নের পরিস্ফুট অর্থ তাহাদিগের উন্মেষশূন্য মস্তিষ্কে প্রতিভাত হয় না, প্রতিভাত হইলেও কতিপয় প্রশ্নের উত্তর দিতে, মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তখন সকল প্রশ্নেরই সম্মতিসূচক উত্তর দেয়, প্রশ্নটী পুনরুচ্চারণ করিয়া নিরস্ত হয়, অথবা বাদ্যযন্ত্রের অনায়ত তারে আঘাত করিলে যেমন কয়েকটী অসম্বদ্ধ শব্দ উত্থিত হয়, তেমনি কয়েকটী অর্থশূন্য অসম্বদ্ধ কথা প্রলা-পের মত উচ্চারণ করে। এই সকল কারণ বশতঃ ইচ্ছা না থাকিলেও পরি-ব্রাজকগণ অসভ্য সম্বন্ধে অনেক গুলি অপ্রাকৃত কথা প্রচার করিয়াছেন। সভ্য জাতিদিগের মত দেবপূজার পদ্ধতি না দেখিতে পাইয়া এজন্যই কোন কোন লেখক জাতিবিশেষকে ধর্ম্মভাবশূন্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

প্রকৃতির মৌলিকতা অর্থে আমরা ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি নির্দ্দেশ করি না। স্বাভাবিক কারণে পরিবর্ত্তিত প্রকৃতিকেও আমরা মৌলিক প্রকৃতি বলি। জগ-তের যাবতীয় পদার্থ অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হয়। জড় রাজ্যের প্রত্যেক পদার্থ নিজ প্রকৃতি ও প্রতিবেশী প্রকৃতির ঘাতপ্রতিঘাত অনুসারে কার্য্য করে। জীব রাজ্যেও এইরূপ। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত যে জীব আপন

প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে না পারে, জীবন সংগ্রামে সে পরাস্ত, নিম্নগত ও হত হয়। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত যাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করে সে বিজয়ী; তাহারই সন্তান সন্ততিগণ সুস্থ, সমৃদ্ধ ও সুখী হয়। এই রূপে জীব প্রকৃতিতে বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তনের নাম প্রলয়। প্রলয়ান্তে নূতন জীবের সৃষ্টি হয় না। পুরাতন জীবপ্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন আকার ধারণ করে মাত্র। পরিবর্ত্তন-কুশলতার তারতম্য হেতু মানবসমাজ বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং মানবতত্ত্বে কোন্ কোন্ কারণে মানব প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়, প্রধানতঃ তাহাদিগের নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। মানবপ্রকৃতির পরিবর্ত্তনে, জড় ও জীব সকল জাতীয় পদার্থপ্রকৃতির প্রাধান্য লক্ষিত হয়। জলবায়ুর তপ্ততা ও শীতলতা, শুষ্কতা ও আর্দ্রতা, স্থিরতা ও চঞ্চলতা অনুসারে মানবপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। বাস যোগ্য স্থানের অল্পতা ও প্রচুরতা, উর্ব্বরতা ও অনুর্ব্বরতা, সমতলতা ও ভঙ্গুরতা অনুসারে মানবপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। প্রতিবেশী উদ্ভিজ্জগণের একজাতীয়তা থাকিলে প্রকৃতি যেরূপ হয়, বহুজাতীয় হইলে সেরূপ হয় না; উদ্ভিজ্জের পরিমাণ অল্প হইলে যে অবস্থায় থাকা যায়, পরিমাণ বহুল হইলে সে অবস্থায় থাকা যায় না। জীবগণ সম্বন্ধেও এইরূপ। নিকটস্থ জঙ্গলে হিংস্র জন্তু প্রধান হইলে একভাবে থাকিতে হয়, নিরীহ জীবের সংখ্যা অধিক হইলে ভাবান্তর ঘটে। এতদ্ভিন্ন বিভিন্নজাতীয় মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি বিচিত্র। বুদ্ধির প্রাখর্য্য, ভাবের গতি, দেহের অবস্থা সামাজিক পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সকলেই স্ব স্ব প্রধান। এই সকল প্রকৃতি আবার প্রত্যেক মনুষ্যের কার্য্য-কুশলতা অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। জঙ্গলচ্ছেদ ও পয়োনালী-নির্ম্মাণে জলবায়ুর পরিবর্ত্তন হয় এবং সেই সঙ্গে মনুষ্যের আবাস সুখ বা দুঃখজনক হইয়া উঠে। বৃক্ষচ্ছেদনে আর্দ্র দেশ শুষ্ক হইতে পারে, শুষ্ক স্থান মরুভূমিতে পরিণত হয়; কুবৃক্ষ কাটিয়া সুবৃক্ষ রোপণ করা যাইতে পারে, একজাতিত্ব নষ্ট করিয়া বহুজাতিত্ব ঘটাইতে পারা যায়, এবং বিদেশ হইতে আবশ্যকীয় নূতন বৃক্ষ আনা যাইতে পারে। জীবজগতেও হিংস্র জন্তু বিনাশ করিয়া নিরীহ জীবের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা যায়। বন্য জন্তু গৃহ-পালিত হয়, এবং প্রয়োজনীয় বিদেশী জন্তুকে স্বদেশী করা যায়। প্রকৃতির এই বহু পরিবর্ত্তনের সহিত উত্তরোত্তর মানব-সমাজে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। মানব-প্রকৃতির ইতিবৃত্তে ইহাদের প্রত্যেকের প্রভাব গণ্য করিতে হইবে। কাহাকেও বাদ দিলে চলিবে না। আবার সামাজিকতাই সমাজে

পরিবর্ত্তন উৎপাদক। একত্র বহু মনুষ্যের সমাবেশ হইলেই কার্য্য-শ্রেণী বিভাগ, শাসন ও শ্রমবিভাগ, শান্তি বা অশান্তির কার্য্য সাধিত হইতে পারে। সামাজিকতা যুগপৎ সমাজ উন্নতির কারণ ও ফল। মানব-চরিত্রের উপর সমাজের ক্ষমতা এবং সমাজের উপর মানব-চরিত্রের প্রাধান্যও সামান্য নহে। উভয়ে উভয়ের প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন উৎপাদন করে। পূর্ব্বে যাহা ব্যক্তিগত, বিভিন্ন ও বিচিত্র থাকে তাহা সাধারণত্ব ও একজাতিত্ব প্রাপ্ত হয়; এবং মানবপ্রকৃতি যতই সাধারণ ও একজাতীয় হইয়া উঠে, মানবসমাজও সেই সঙ্গে নূতন হইয়া গঠিত হইতে থাকে। প্রত্যেক সমাজের উপর প্রতিবেশী সমাজের প্রাদুর্ভাব অসামান্য। পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী সমাজের ঘাতপ্রতিঘাতে দেশ মধ্যে সমস্ত সমাজ একাকার প্রাপ্ত হয়, তখনই সামাজিকতা হইতে রাজনৈতিকতার উদয় হয়। পরিবর্ত্তনের আরও একটি কারণ আছে। মনুষ্য বুদ্ধির ক্রমোন্নতির সহিত ব্যবহার্য্য শিল্প, ভাবপ্রকাশক ভাষা, বিজ্ঞান ও দর্শন, ধর্ম্ম ও দেবোপাখ্যানের যতই শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে, সমাজেরও ততই শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই সকল পরিবর্ত্তনে প্রাচীন মানবপ্রকৃতি কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অবধারণ করা দুস্কর। তথাপিও অন্য সকল শ্রেণী অপেক্ষা অসভ্যদিগের অবস্থা অধিকতর প্রাচীন প্রকৃতির অনুরূপ। সুতরাং বর্ব্বর হইতে অসভ্য, ও অসভ্য হইতে সভ্যাবস্থার ক্রমোন্মেষ নির্ণয় করিতে পারিলে মানব প্রকৃতির ক্রম পরিণতি অনেক পরিমাণে বুঝা যাইতে পারে।

অসভ্য ও সভ্যদিগের দৈহিক আকৃতিতে অধিক বিভিন্নতা নাই। দৈর্ঘ্যে কোন কোন জাতি শ্রেষ্ঠ, কোন কোন জাতি হীনতর। তথাপি সাধারণতঃ অসভ্যদিগকে খর্ব্বকায় বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই হীনতা কি পরিমাণে বাসস্থানের নিকৃষ্টতা বা আহার্য্যের অভাব হেতু ঘটিয়াছে বলা যায় না। সভ্য ও বলবত্তর জাতিরা উৎকৃষ্ট স্থান হইতে বিতাড়িত করিলে তাহাদিগের অব্যবহার্য্য কদর্য্য স্থান সকলেই অসভ্যেরা আশ্রয় লইয়াছিল। সুতরাং শারীরিক খর্ব্বতা কিয়ৎপরিমাণে আবাসের নিকৃষ্টতা হেতু জন্মিয়াছে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। ভূ-পঞ্জরে বা গুহা মধ্যে প্রাচীন জাতির যে সকল কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তদ্দর্শনে বোধ হয়, কোন কোন জাতি মূলেই খর্ব্বতর ছিল। অসভ্যগণ সাধারণতঃ খর্ব্বকায় হইলেও সে খর্ব্বতা বড় অধিক নয়। সভ্যতার সহিত মানব জাতি শারীরিক দৈর্ঘ্যে অতি অল্পই উন্নতি করিতে পারিয়াছে।

আকারেও সভ্য অসভ্যে বড় প্রভেদ নাই। সাধারণতঃ অসভ্যেরা নিম্নতর

অঙ্গে হীন। কামাস্কাট্‌কার লোকদিগের পা ক্ষুদ্র ও রুগ্নতর। ভারতবর্ষীয় কুকীদিগের শরীরের পরিমাণ অনুসারে হাত লম্বা, পা ছোট। আমেরিকার অনেক জাতি এইরূপ। চিনুকদিগের পা ছোট ও ধনুরাকৃতি। আমাদের অপেক্ষা সাহেবদের পা সোজা। অষ্ট্রেলিয়ার লোকদের উপরার্দ্ধ অপেক্ষা নিম্নার্দ্ধ দুর্ব্বলতর। সুতরাং বলা যাইতে পারে, সাধারণতঃ অসভ্যদিগের পা দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র ও ধনুরাকৃতি। সভ্যজাতির শিশুসন্তানেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু অবস্থায় পূর্ব্বপুরুষের প্রকৃতি অনেক সময়ে অজ্ঞাতসারে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

অসভ্যদিগের চিবুক ও দন্ত বৃহত্তর, উদর স্ফীত এবং ঝোলা। কামাস্কাট্‌কার লোকদের পা সরু, পেট ঝোলা। বুসমানদের পেট ঝোলা। আক্কাদিগের বক্ষ বিস্তারে অধিক, দৈর্ঘ্যে ক্ষুদ্র এবং পেট বড় ঝোলা। আফ্রিকাবাসী আরাব, সিংহলের ব্যাধ, এবং বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্র সকল জাতির মধ্যে ঐ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ আহার্য্যের পরিমাণ হিসাব করিলে এইরূপ লক্ষণ না ঘটিয়া পারে না। ইয়াকুৎ ও তুঙ্গুসি জাতীয় লোকেরা এক এক জন এক দিনে আধ মণ মাংস খাইতে পারে। তুঙ্গুসি জাতীর একটি পাঁচ বৎসরের বালককে তিনটা বাতি, একখানা বড় সাবান এবং কয়েক সের মাংস খাইতে দেখা গিয়াছে। কোমাঞ্চি জাতি অনেক দিন উপবাসের পর এক দিনে রাশি রাশি আহার করে। বুসমানেরা হিংস্রক জন্তুদিগের ন্যায় ক্ষুধা সহ্য করিতে যেমন পটু, আহার্য্য মিলিলে গোগ্রাসে ভক্ষণ করিতেও তেমনি দক্ষ। এস্কিমো এবং অস্ট্রেলিয়দেরও আহারের কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়।

সহসা অধিক পরিশ্রম আবশ্যক হইলে অসভ্যেরা হারিয়া যায় এবং অধিক ক্ষণ বেশী পরিশ্রম করাও তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। তাসমেনিয়ার লোকদিগকে আকারে সবল দেখাইলেও যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে তাহাদের বল অধিক নয়। পাপুয়ান, দামারা ও দাকোটা জাতি এবং আমেরিকার কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যেও এইরূপ দেখা গিয়াছে। তৃণভোজী অশ্ব অপেক্ষা শস্যভোজী অশ্বেরা অধিক দূর পর্য্যন্ত ভার বহন করিতে পারে এবং অধিকতর ভার লইয়া যায়। অবস্থাগুণে অসভ্যদিগকে অধিকাংশ দিন লতাপাতা খাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে হয়। সুতরাং পরিমাণে অধিক না খাইলে দেহ রক্ষা হয় না। শারীরিক ক্রিয়া সুসাধনের জন্যও লতাপাতা ভক্ষণ অনেক অসভ্য সমাজে স্বতঃই আবশ্যক হয়। অধিক পরিমাণ আহার হেতু অসভ্যদিগের উদর সাধারণতঃ

অধিক স্ফীত হইয়া থাকে এবং অসার দ্রব্য ভক্ষণ করায় বল ও পরিশ্রমশীলতায় তাহারা সভ্য জাতি অপেক্ষা হীনতর হইয়া পড়ে। আহারের অনিয়ম এবং স্নায়ুমণ্ডলীর উন্মেষশূন্যতা অসভ্যদিগের দুর্ব্বলতার আর দুইটি কারণ।

অসভ্যদিগের সহিষ্ণুতা বিখ্যাত। যন্ত্রণার প্রাখর্য্য তাহাদিগের পক্ষে যেন শক্তিহীন বলিয়া বোধ হয়। দারুণ শীত বা প্রচণ্ড গ্রীষ্ম তাহারা অম্লানমুখে সহ্য করে। পা দিয়া জলন্ত অঙ্গার নাড়াইয়া দেয়। জুলুরা আগুনের উপর মাংস ফুটিবার সময়ে হাত দিয়া হাঁড়ি হইতে তুলিয়া খায়।

সভ্যদিগের অপেক্ষা অসভ্যেরা শীঘ্র শীঘ্র কৌমার্য্য লাভ করে, এবং দেহের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আমরা সর্ব্বত্রই শুনিতে পাই, অসভ্য কুমারীরা অল্প বয়সে যুবতী হইয়া অল্প বয়সেই বৃদ্ধা ও কদাকারা হইয়া পড়ে।

ভাবপ্রবণতায় সভ্য ও অসভ্যে অনেক প্রভেদ। বালকেরা যাহাতে আনন্দ বোধ করে, যুবার নিকট তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। ভবিষ্যতের আশা, অতীতের চিন্তা বালকের নাই। নানা পদার্থের নানা রস সংগ্রহ করিয়া নানাভাবে একত্র সমাবেশজনিত বিমিশ্র কবিত্ব সুখ তাহারা বুঝেই না। মানব সমাজের বালক অসভ্য। দেহের ন্যায় তাহাদের মন অপূর্ণ ও রূঢ়। অসভ্যের ক্রন্দন মুহূর্ত্ত মধ্যে হাস্যে পরিণত হয়। ভাবের উদয় বিদ্যুতের ন্যায় ত্বরিতগতি, তীব্রতায় অতুল। দাকোটা জাতি সাধারণতঃ বড় শান্ত, কিন্তু মহিষ মারিবার সময়ে রাক্ষসের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। স্নেক ইণ্ডিয়ানেরা অতি সামান্য কারণে বালকের ন্যায় বিরক্ত বা সন্তুষ্ট হয়। টুপি জাতীয় কেহ পথে চলিবার সময়ে পায়ে পাথর লাগিলে রাগে উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং প্রস্তরখণ্ডকে কুকুরের মত কামড়াইতে থাকে। ইহাও বলা আবশ্যক, কোন কোন জাতি এমন জড়-প্রকৃতি ও জীবনশূন্য যে, ভাবপ্রবণতা তাহাদের মধ্যে কখনই উপলক্ষিত হয় না। সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে, নূতন পৃথিবীর অপেক্ষা প্রাচীন পৃথিবীর লোকেরা অধিকতর ভাবপ্রবণ। গায়েনার ইণ্ডিয়ানদিগকে কোন আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলেও দুঃখ করিতে দেখা যায় না। মধ্য আমেরিকা, মেক্সিকো ও পেরু দেশের লোকদিগেরও এই প্রকৃতি। প্রাচীন পৃথিবীতে কামস্কাট্‌কার লোকদিগকে অতি সামান্য কারণে উন্মত্ত হইয়া আত্মহত্যা করিতে দেখা গিয়াছে। কারগিজ জাতির প্রকৃতি অস্থির ও অনিশ্চিত। বেদুয়িনেরা ক্ষণেক সাহসী, ক্ষণেক কাপুরুষ। আরাবেরা যখন বসিয়া আলাপ করিতে থাকে, বোধ হয় যেন মারামারি করিতেছে। পালগ্রেভ সাহেব বলেন, ইহারা আধ

পয়সার জন্য অর্দ্ধেক দিন বকাবকি করে, কিন্তু কেহ ভিক্ষা চাহিলে দশ টাকা দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। পূর্ব্ব আফ্রিকার অসভ্যেরা শান্ত-প্রকৃতি, কিন্তু নির্দ্দয়; সাবধান, কিন্তু বিবাদপ্রিয়; এই মুহূর্ত্তে সদয়, মুহূর্ত্তপরেই কঠোরপ্রকৃতি; এই সদালাপ করিতেছে, তখনি আবার স্নেহমমতাশূন্য হইল; এক দিকে ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্য পক্ষে ভক্তিলেশশূন্য। যেমন দাসত্ব করিতে, অত্যাচার করিতেও তেমনি পটু। দক্ষিণ আফ্রিকার লোকদিগেরও স্বভাব এই। হটেণ্ট-টেরা এক সময় যেমন অলস, অন্য সময়ে তেমনি উৎসাহী। পাপুয়ান ও ফিজি-য়ানদিগকে মুহূর্ত্তে ক্ষিপ্ত ও মুহূর্ত্তে শান্ত করা যায়। আণ্ডামানের লোকেরা যেমন কোপনস্বভাব, তেমনি জিঘাংসাপ্রিয়। তাস্‌মেনিয়ানদিগের হাসি ও ক্রন্দনের মধ্যে মুহূর্ত্তমাত্রও ব্যবধান থাকে না। বুস্‌মানদিগের মনোভাবের সহিত মুখশ্রী ও চক্ষের জ্যোতি পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। নাসাগ্র, মুখ-প্রান্ত ও কাণ পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভিন্ন দিকে নড়িতে থাকে। কেহ দেখিলে ইহাদিগকে মর্কট ভিন্ন মনুষ্যপ্রকৃতি বলিবে না।

সাধারণতঃ অসভ্যেরা বড় প্রফুল্লস্বভাব। দার্জ্জিলিঙ্গের লেপচা কুলি পৃষ্ঠে ভার লইয়া যাইবার সময়ে যেরূপ ছুটাছুটি ও আমোদ প্রমোদ করিতে থাকে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। নব কালিডোনিয়া, নবজিলাণ্ড, ফিজি ও টাহিটি দ্বীপের লোকেরা সারাদিন হাসে ও আমোদ করে। নিগ্রো ও এস্কিমোদিগেরও এই রীতি। অসভ্যেরা বর্ত্তমান ভিন্ন ভবিষ্যৎ বুঝে না। আজিকার দিন চলিয়া যাইলেই হইল, ভবিষ্যতের জন্য আয়োজন করিবার আবশ্যক নাই, কোন আশঙ্কাও নাই।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অসভ্যদিগের জীবন। অতি সামান্য কার্য্যেও ইহারা অন্যের আজ্ঞামত চলিতে ভালবাসে না। মলক্কসের মন্ত্র জাতির স্বাধীনতা জীব-নের একমাত্র উপকরণ। প্রত্যেকে এমনি ভাবে কর্ম্ম করে, যেন দ্বিতীয় ব্যক্তি জগতে নাই। কাহার সহিত একটু কথান্তর হইলে অমনি তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া দেয়। বোর্ণিয়োর বন্যগণ প্রতিবেশীর সহিত কোন সংস্রব রাখে না। সন্তানেরা একটু কর্ম্মক্ষম হইলেই পিতামাতা হইতে ভিন্ন হইয়া পড়ে; তাহারা পরস্পরের জন্য আর কোন চিন্তা করে না। স্বাধীনতা রক্ষা করিতে যতই কেন দুরবস্থা হউক না, অসভ্যেরা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিবে না। দক্ষিণ আমেরিকার মাপুচে জাতি অন্যের দ্বিরুক্তি সহ্য করিতে পারে না এবং হুকুম করিলে অমান্য করিবেই করিবে। কারিবদিগের স্বাধীনতা একটু ব্যত্যয় হইলে, তাহারা অধীর হইয়া

পড়ে। বোদো ও ধিমল জাতিকে কেহ অন্যায় আদেশ করিলে তাহারা প্রাণান্তে সে কার্য্য স্বীকার করিবে না। বেদুইনদিগকে মিষ্ট কথায় নানা কার্য্য করান যায়, কিন্তু হুকুম করিবামাত্র অবাধ্য হইয়া উঠে। ইহারা রাজা বা সর্দ্দারকে শ্রেষ্ঠলোক বলিয়া কখন স্বীকার করে না। এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রভাব এবং নিরপেক্ষ স্বেচ্ছাচারের আতিশয্য অসভ্যদিগের সমাজ-বন্ধনের গুরুতর অন্তরায়।

অসভ্যেরা বড় গৌরবপ্রিয়। জীবজন্তু হইতে সুসভ্য মনুষ্য পর্য্যন্ত অন্যের প্রশংসা পাইতে সকলেরই ইচ্ছা; কিন্তু সভ্যদিগের অপেক্ষা অসভ্যেরা গৌরবের অধিক প্রয়াসী। মমথ ও বল্গা হরিণের সহিত একত্র লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যাহারা ফরাসীদেশে বাস করিত, তাহারাও ঝিনুকের মালা পরিত এবং গায়ে রাঙ্গা রং মাখিয়া দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিত। পারিসের বিলাসিনী অপেক্ষা অঙ্গরাগে বন্য সর্দ্দারদিগের অধিক যত্ন দেখা যায়। যাহারা কাপড় পরা আবশ্যক মনে করে না, নানা রঙ্গে দেহ চিত্র করা তাহাদেরও বিশেষ আবশ্যক। অলঙ্কার পরিবার জন্য নাক, কাণ, ঠোঁট ও গাল ফুঁড়িবার সময়ে এবং সমস্ত দেহে উল্কী পরিতে তাহারা যে কষ্ট সহ্য করে, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। গৌরবের লোভে ইহারা অঙ্গরাগে সর্ব্বত্র পরস্পরের অনুকরণ করে। বিদ্রূপভয়ে এই বিষয়ে ইহারা অন্যের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লয়। অনেক সময়ে অসভ্যদিগের জিঘাংসা-প্রবৃত্তি এই গৌরব-লোভ-প্রণোদিত। জ্ঞাতিঘাতককে যে হত্যা করিতে না পারে, নিন্দায় তাহার প্রাণ বাঁচান ভার হয়। হিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে না পারিয়া অনেক সময়ে অসভ্যদিগকে আত্মহত্যা করিতে দেখা গিয়াছে। সভ্য সমাজে অন্ত্যেষ্টিব্যয়ে সর্ব্বস্ব বিনাশ এবং অকুলীন বিবাহভয়ে কন্যাপণ—উভয়ই গৌরব-স্পৃহা-জনিত। এক দিকে স্বেচ্ছাচার সমাজবন্ধনের অন্তরায়, গৌরব-স্পৃহা অন্য দিকে তেমনি সহযোগী। এই গৌরবস্পৃহা হেতু অসভ্যেরাও জ্ঞাতি-প্রথা মত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। শত্রুদিগের অত্যাচার-ভয় সমাজ-বন্ধনের প্রধান কারণ।

সন্তান-স্নেহের তীব্রতা সভ্য জাতি অপেক্ষা অসভ্যদিগের অধিক। সন্তান রক্ষা করিবার জন্য অতি নিরীহ পশুপক্ষীও প্রাণের মমতা ছাড়িয়া দিয়া হিংস্র জন্তুদিগের সহিত যুদ্ধ করে। কিন্তু অব্যবস্থিতচিত্ততা প্রযুক্ত অসভ্য সমাজে সন্তানের প্রতি যথেষ্ট নির্দ্দয় ব্যবহারেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। ফিজি ও নবগিনির অধিবাসীরা সন্তানদিগকে বড় ভালবাসে, অথচ আবশ্যক হইলে

দাসরূপেও বিক্রয় করিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা সন্তানস্নেহের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু কখন কখন সন্তান কাটিয়া তাহার চর্ব্বিতে মাছ ধরিবার এবং মাংসে কুম্ভীর ধরিবার টোপ করিয়া থাকে এবং পীড়িত হইলে সন্তানকে ফেলিয়া দেয়। তাসমেনিয়াতেও শিশুবধের বড় প্রাদুর্ভাব। প্রসব বেদনায় মায়ের মৃত্যু হইলে তথাকার অসভ্যেরা জীবন্ত শিশুকে হত্যা করিতে কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করে না। যে সকল বন্য জাতি কিয়ৎ পরিমাণে সভ্য হইয়াছে, তাহাদের প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত নির্দ্দয়তাশূন্য। নবকালিডোনিয়ার ও নবগিনির অসভ্যেরা নম্র ও শান্ত। টানিসজাতি সাধামত পরোপকার কবিয়া থাকে। সাণ্ডুইচ, টাহিটি, জাবা, মলক্কস ও বোর্ণিয়ো দ্বীপেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এক অবস্থাপন্ন জাতির মধ্যে কখন কখন বিভিন্ন প্রকৃতি লক্ষিত হয়। টুপি জাতি বড় হিংস্রক। ফিজিয়ানেরা কঠোর জিঘাংসাপ্রিয়। দামারা জাতি দুরন্ত, চৌর্য্যকুশল ও নরহত্যাকারী। নাগা জাতি সৎ ও শান্ত, কিন্তু ভীলেরা নিষ্ঠুর ও কোপনস্বভাব। বোদো ও ধীমলেরা নিরহঙ্কার, সৎস্বভাব ও সত্যপ্রিয়, লেপ্‌চাগণ নিরীহ ও মধুরপ্রকৃতি।

অসভ্য-স্বভাব সাধারণতঃ স্থিতিশীল। যে জাতি যত অসভ্য, পরিবর্ত্তনপ্রিয়তা তাহাদের তত অল্প। দেহের ন্যায় তাহাদের মনেরও স্থিতিস্থাপকতা জন্মে নাই। অতি সামান্য আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন করিতে বলিলে তাহারা হাসিয়া উঠে ও বলে যাহাতে পিতৃপিতামহের চলিয়াছে, তাহাদেরও তাহাতে চলিবে। লিভিংষ্টোন সাহেব আফ্রিকার কতকগুলি লোককে চামচ্ ব্যবহার করিতে শিখাইয়াছিলেন। তাহারা চামচে দুগ্ধ তুলিয়া বাম হাতে ঢালিয়া খাইত। বোর্ণিয়োর দায়াকদের মধ্যে কেহ বিদেশী রীতিতে কাঠ কাটিলে তাহার জরিমানা হইত।

বালকের মত অসভ্যদিগের বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ বড় অল্প। একটি নির্দ্দিষ্ট ঘটনা বুঝাইয়া দিলেও তাহারই মত আর একটি তাহারা বুঝিতে পারে না। দশটি দ্রব্য তুলনা করিয়া তাহাদের একটি সাধারণ ধর্ম্ম নির্ণয় করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। এইরূপ দশটি কারণ মিলিয়া যদি একটি কার্য্য উৎপাদন করে, কার্য্যের অব্যবহিতপূর্ব্ব কারণটি তাহারা হিসাবে ধরিয়া থাকে। উপস্থিত কারণ বা কার্য্য তাহারা বুঝে, দূরতর কারণ ও দূরতর ফল উভয়ই তাহাদের বুদ্ধির অতীত। সংক্ষেপে বলা যায়, অসভ্যদিগের ইন্দ্রিয়-শক্তি যেমন প্রখর, বুদ্ধি-বৃত্তি তেমনি অস্ফুট। দক্ষিণাপথে নেলোর প্রদেশে যনাধি বা অনাদি নামে এক

দল অসভ্য বাস করে। শিকার করিবার সময় পশুপক্ষী বনমধ্যে কোথায় লুকাইলে ইহারা ঘ্রাণ-বলে বুঝিতে পারে। পদ চিহ্ন দেখিলে সে কাহার পদ-চিহ্ন অনায়াসে বলিয়া দেয়। চোর ধরিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহা-দিগকে প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। বুসমানদিগের চক্ষু সর্ব্বদাই চারিদিকে ঘুরে, এবং আমরা যাহা দূরবীক্ষণ বিনা দেখিতে পাই না, তাহারা সহজ চক্ষে অনায়াসে তাহা দেখিতে পায়। ব্রহ্মবাসী কিরাত জাতির এবং সাইবিরীয়া ও আমেরিকাবাসীদিগের দৃষ্টি অতি প্রখর। আমরা যাহা দেখিতে বা শুনিতে পাই না, ব্রাজিলবাসী ইণ্ডিয়ান ও টুপি জাতি তাহা দেখে ও শুনে। আরিপোন জাতি মর্কটের মত সর্ব্বদাই অস্থির ও প্রখরদৃষ্টি। উত্তর আমে-রিকার ইণ্ডিয়ান ও সিংহলের ব্যাধ জাতি অতি মৃদুস্বরও শুনিতে পায়। দল মধ্যগত একটি পশু একবার দেখিলে দামারা জাতি ও উত্তর আমেরিকার অসভ্যেরা সময়ান্তরে সেটি চিনিতে পারে। হিনহাউস সাহেব বলেন "যেখানে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না, [illegible] সেখানে পায়ের দাগ দেখিয়া বলিয়া দেয় কখন্ কোন্ জাতির কতগুলি লোক বনের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে"। পদ চিহ্ন দেখিয়া গায়েনার লোকেরা বলিতে পারে, যাহারা গিয়াছে তাহাদের কতগুলি পুরুষ ও কতগুলি স্ত্রীলোক, কতগুলি বয়স্ক ও কতগুলি শিশু, কতগুলি দেশীয় ও কতগুলি বিদেশীয়। ইন্দ্রিয় শক্তির প্রখরতার উপর তীরক্ষেপ, নৌকাচালন প্রভৃতি যে যে কার্য্য নির্ভর করে, সে সকলেই অসভ্যেরা সুপটু। কিন্তু দুইটি কারণ একত্রিত করিয়া বুদ্ধি খাটাইয়া কোন কার্য্য করিতে হইলে তাহারা শিশুর মত দিশাহারা হইয়া পড়ে।

ইন্দ্রিয়-শক্তির প্রখরতা সত্বে বুদ্ধিবৃত্তির অস্ফুটতা হেতু অসভ্যেরা অনুকরণ কার্য্যে বানরের মত সুপটু। নবজিলাণ্ড, বোর্ণিয়ো, পোলিনেসিয়া, ব্রাজিল, পাটাগোনিয়া, চীন ও ব্রহ্মদেশের লোকেরা অনুকরণের জন্য বিখ্যাত। কাম-স্কাট্‌কার লোকেরা অপরের ভঙ্গি, এবং আমেরিকার স্নেক ইণ্ডিয়ানেরা পশু পক্ষীর শব্দ আশ্চর্য্য অনুকরণ করিতে পারে। গুয়ারাণী জাতিকে কিছু অনু-করণ করিতে দাও, কোন্‌টি প্রকৃত কোন্‌টি অনুকৃত বুঝা ভার হইবে। ফিজি-দ্বীপের লোকদিগকে তোমার ভাষায় কিছু বল, সে তোমার মত ভঙ্গি করিয়া কথাগুলি ঠিক উচ্চারণ করিবে। আণ্ডামান ও অস্ট্রেলিয়ার লোকদিগকে প্রশ্নের যথাযথ উচ্চারণ করিতে দেখা যায়। স্মৃতি বা চিন্তা-শক্তি খাটাইতে হয়, এমন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অসভ্যের মন যেন টলমল করিতে থাকে। ব্রাজি-

লের অসভ্যেরা দুই একটী কথার উত্তর দিয়া অধীর হইয়া পড়ে ও নির্ব্বোধের মত কথা বলিতে থাকে। দামারা জাতি পাঁচটির অধিক গণিতে হইলে বিষম গোলে পড়ে। একটা ভেড়ার দাম দুই আটি তামাক হইলে, দুইটি ভেড়ার পরিবর্ত্তে কয় আটি তামাক পাইবে, হিসাব করিতে পারে না। একবার দুই আটি দিয়া একটা ভেড়া লইয়া লুকাইয়া, আবার দুই আটি তামাক দিতে হয়। অথচ একপাল গরুর মধ্যে একটি হারাইলে অনায়াসে বুঝিতে পারে, কারণ "ভিন্ন ভিন্ন গরুর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি তাহাদের চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে থাকে।"

অতিবিশ্বাস অসভ্যের লক্ষণ। অথচ একটী নূতন পদার্থ দেখিলে তাহার তথ্য জানিতে তাহাদের কিছুমাত্র কৌতূহল হয় না। বুঝিবার ক্ষমতা না থাকিলে বুঝিতে ইচ্ছা হয় না, ইচ্ছার অভাবে চেষ্টা জন্মে না। আজ যে সূর্য্য উঠিল এটী কাল উঠিয়াছিল কি না জিজ্ঞাসা করিলে অনেক জাতি বলিতে পারে না।

দেহের ন্যায় অসভ্যের বুদ্ধি অতি অল্প বয়সেই ফুটিয়া উঠে। অসভ্য বালক সভ্য বালক অপেক্ষা প্রখর। ইহা নিগ্রো ও আলুট জাতির মধ্যে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। কিন্তু উভয় জাতীয় বালক দুইটী যখন প্রবীণতা প্রাপ্ত হয়, তখন সভ্য লোকের বুদ্ধির সহিত অসভ্যের বুদ্ধির তুলনা হয় না।

---

# চতুর্থ পল্লব।

বাঙ্গালী বধূরা স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কথা কওয়া বা তাঁহাকে মুখ দেখান বড় লজ্জার বিষয় মনে করে। পূর্ব্ব বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে শাশুড়ীর সহিত, স্বামীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী বা বয়োজ্যেষ্ঠ দেবরের সহিত বাক্যালাপ রীতি-বিরুদ্ধ। আমাদের দেশে মামা-শ্বশুরের অঙ্গ স্পর্শ করিতে বা তাহার সহিত কথা কহিতে নাই। মানভূম অঞ্চলে কোড়া কুর্মি প্রভৃতি আদিম জাতিদিগের মধ্যেও এই রীতি, কিন্তু মামা-শ্বশুরের বাজনার তালে তালে নৃত্য করা ভাগিনেয়বধূর পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। উত্তর আমেরিকায় অসভ্যদিগের মধ্যে শাশুড়ী জামাতার সহিত কথা কহে না, বিশেষ আবশ্যক হইলে বিপরীতদিকে

মুখ ফিরাইয়া তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা কথা চালাইতে হয়। ওমাহা জাতির মধ্যে শ্বশুর কি শ্বাশুড়ী জামায়ের সহিত কথা কহে না। তাহাদের মুখ দর্শন করা কি নাম উচ্চারণ করা জামাতার পক্ষে নিষিদ্ধ। কালিফোর্ণিয়ার ইণ্ডিয়ানদিগের জামাতা শ্বশুর পক্ষীয় কাহারও মুখ দর্শন করে না। কেহ আসিয়া পড়িলে পাশ কাটিয়া পলাইতে হয় বা লুকাইতে হয়। কিরি, দাকোটা ও কারিব জাতির মধ্যে, ফ্লরিডা দেশে ও ব্রাজিলবাসি অরবাক জাতির মধ্যেও এই নিয়ম। কারিব জামায়েরা শ্বশুরের বাড়ীতে, শ্বশুর জামায়ের বাড়ীতে প্রবেশ করে না। মোগল ও কালমক বধূরা শ্বশুরের সহিত কথা কহিতে বা তাহার সমক্ষে বসিয়া থাকিতে লজ্জা বোধ করে। চীন দেশে শ্বশুর পুত্রবধূর মুখ দর্শন করে না, হঠাৎ দেখা হইলে শ্বশুরকে মুখ লুকাইতে হয়। বোর্ণিও ও ফিজি দ্বীপেও এই রীতি। অষ্ট্রেলিয়ায় শ্বশুর শ্বাশুড়ী বা জামাতার নাম ধরা নিষেধ। মধ্য আফ্রিকায় বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে ভবিষ্যৎ শ্বশুর শ্বাশুড়ীর মুখদর্শন রীতি-বিরুদ্ধ। কখন সে কুকার্য্যসম্ভব হইলে শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে ঘোমটা দিতে হয়। কাফির মহিলারা স্বামীর গুরুপক্ষীয় কাহারও নাম মনে আনিতে পারে না। দায়ে পড়িয়া আমাদের মেয়েরা যেমন "কৃষ্ণ"কে "কেষ্ট" ও "হরি"কে "ফরি" বলে, সেখানেও সেইরূপ। জামায়েরা শ্বাশুড়ীর সহিত এক বাড়ীতে বাস করিতে বা তাহার নাম ধরিতে পারে না। দক্ষিণ আফ্রিকার বুসমান ও বাসুট জাতির মধ্যেও এই রীতি।

আসিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলে এবং পলিনেসিয়ার সর্ব্বত্র রাজার নামের প্রতি দেবভক্তি দেখাইতে হয়। বস্তুতঃ পূর্ব্বপুরুষ বা দেশীয় প্রধানগণই মৃত্যুর পরে দেব নামে সাধারণতঃ পূজিত হয়। দেব জাতির জন্মকথা স্থানান্তরে আলোচিত হইবে। ভারতবর্ষে রাজা দেবতার অবতার। শ্যাম দেশে রাজার নাম ধরিতে নাই, উপাধি ধরিয়া উল্লেখ করিতে হয়। ব্রহ্মদেশে রাজার নাম বীজ মন্ত্রের ন্যায় গোপনীয়। কোন জন্তুর নামে টাহিটি সর্দ্দারের নাম হইলে সেই জন্তুর নাম পরিবর্ত্তন করিতে হয়। নবজিলাণ্ডে সর্দ্দারের নাম জল বলিয়া জলের নাম বদলাইতে দেখা গিয়াছে। তাসমেনিয়ার আবিপোন জাতির মধ্যে, কাফির ও জুলুদের মধ্যেও এই প্রথা। উত্তর আমেরিকায় মৃত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়ের নিকট সে কথা আনিতে নাই। আবিপোন জাতি মৃত ব্যক্তির নাম না করিয়া অতীত পুরুষ বা গত মহাশয় বলে। যদি কোন অনভিজ্ঞ শিশু মৃত পিতা মাতার কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে সে

অমনি বলে "চুপ চুপ খারাপ কথা মুখে আনিও না।" সামোয়া জাতি সঙ্কেতে মৃত ব্যক্তির উল্লেখ করে, নাম ধরে না। অষ্ট্রেলিয়ার পাপুয়ান জাতির মধ্যে, আফ্রিকার মশাই জাতির মধ্যে এবং য়ুরোপে শেট্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে এই রীতি লক্ষিত হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় মৃত ব্যক্তির নাম কোন বস্তুর নাম হইলে সে বস্তুর নাম পরিবর্ত্তিত হয়। ভূতের নাম শয়তান বলিয়া য়েজিদ্ জাতি নদীকে "সং" না বলিয়া লহর বলে, এবং সুতার নাম "কয়তান" বলিয়া সে নাম উচ্চারণ করে না। দায়াক জাতি বসন্ত রোগের নাম উচ্চারণ করে না, সর্দ্দার বা বন পাতা অভিধানে ইঙ্গিত করিয়া থাকে। উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা দেশে বসন্ত রোগকে "দেবীর দৃষ্টি" বা "মায়ের অনুগ্রহ" বলে। এ দেশে রাত্রিতে সাপকে লতা, বাঘকে মামা এবং মাছ ধরিবার সময় কাঁকড়া না বলিয়া দশরথ বলিতে হয়। সুন্দরবনের লোকেরা বাঘকে শৃগাল বলে; সাইবিরিয়ার তুঙ্গুসি জাতি ও আনাম দেশের লোকেরা ঠাকুরদাদা বা প্রভু এবং সুমাত্রা দ্বীপে বুনো বা পূর্ব্ব পুরুষ বলে। লাপলাণ্ডের লোকেরা ভাল্লুককে বড় মানুষ বলিয়া থাকে।

আবিপোন জাতির সন্তান হইলে পিতাকে মাদুর মুড়ি দিয়া সন্তান কোলে করিয়া এক কোণে পড়িয়া থাকিতে হয়, গায়ে যেন বাতাস না লাগে; তাহাকেই আঁতুড় ঘরে থাকিতে হয় ও উপবাস করিতে হয়। ছেলের কোন ভাল মন্দ হইলে সকলেই পিতাকে দোষী করে। ব্রাজিল দেশে কোরোয়াডো জাতির কাহারও স্ত্রী গর্ভবতী হইলে তাহাকে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বাস করিতে হয়। সন্তান হইবার পূর্ব্বে তাহাকে আহার বিষয়ে সাবধান হইয়া চলিতে হয়, মাংস খাইতে নাই, মাছ ও ফল খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে হয়। গায়েনার উত্তরাংশে আকয়িবা ও কারিবি জাতি বাস করে। তাহাদের কাহারও সন্তান হইলে পিতাকে কাপড় মুড়ি দিয়া শিশু কোলে করিয়া শুইয়া থাকিতে হয়, ধাত্রী তাহারই সেবা করে। সন্তান-প্রসবের পরেই প্রসূতি রন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। উত্তর আমেরিকার শোষোণ জাতির মধ্যে স্ত্রীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে স্বামীকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া একাকী বসিয়া থাকিতে হয়। গ্রীনলাণ্ডে কাহারও সন্তান হইলে পিতা কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সকল প্রকার কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকে। কামস্কাট্‌কায় কাহারও সন্তান সম্ভাবনা হইলে প্রসবের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে স্বামীকে সকল প্রকার কঠিন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়। কারিব জাতির স্ত্রী প্রসব কার্য্যের অব্যবহিত পরেই

গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হয় স্বামী শিশু পালন করে। তাহাকেই ঝাল মসলা পাচন খাইয়া উপবাস করিতে হয়। এইরূপে চল্লিশ দিন প্রসবগৃহে বাস করিবার পরে নিমন্ত্রিত বন্ধু বান্ধব আসিয়া তাহাকে প্রহার করিতে থাকে। প্রহারে সর্ব্বশরীর রক্তাক্ত হইলে গোলমরিচের গুঁড়া-মিশ্রিত জলে দেহ ধৌত করিয়া আবার শোয়াইয়া দেয়। এইরূপে আঁতুড় ঘরে আরও দশ বার দিন তাহাকে কাটাইতে হয়। প্রহারের সময়ে অভাগা কাঁদিলে বা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে শিশুর অমঙ্গল হয়। শিশুর ছয় মাস বয়স পর্য্যন্ত মৎস্য মাংস আহার পিতার পক্ষে নিষেধ। দায়াকদের সন্তান হইলে পিতা ধারাল অস্ত্র বা বন্দুক ব্যবহার করিতে পারে না, এবং কয়েক দিন নির্জ্জন বাস করিতে ও নিরামিষ খাইয়া থাকিতে হয়। পিতার আহার গুরুতর হইলে শিশুর উদরাময় হইতে পারে। (১) কালিফর্ণিয়ার ইণ্ডিয়ান, পশ্চিম আফ্রিকার জুকেলি ও চীনদেশবাসী মিয়াঞ্জি জাতির মধ্যে এবং পূর্ব্বোপদ্বীপের বোরো দেশে সন্তান হইলে পিতাকে ঔষধ ও পথ্য খাইতে হয়। কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ তীরবর্ত্তী তিবরেণী জাতির স্ত্রী প্রসব করিলে স্বামী বিছানায় পড়িয়া গোঁয়াইতে থাকে, স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, পথ্য দেয়। পূর্ব্বে স্পেনদেশে এই রীতি প্রচলিত ছিল। এখনও পিরানিস পাহাড়ে বাস্ক জাতির মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে। শ্রীরঙ্গপত্তন এবং মলয় উপকূলে কোন কোন জাতির কাহার সন্তান হইলে পিতাকে এক মাস শুধু ভাত খাইয়া থাকিতে হয়। গুরুপাক দ্রব্য আহার ও তামাক সেবন তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ।

জন্তু বিশেষের মাংস ভক্ষণ করিলে সেই সব জন্তুর গুণাগুণ ভক্ষয়িতা প্রাপ্ত হয়, ইহা অনেক দেশে বিশ্বাস। এ দেশে রাতকাণা রোগ সারাইবার জন্য কলার মধ্যে জোনাকি পোকা খাইতে দেয়; সন্তানের চক্ষু আয়ত হইবে বলিয়া গর্ভিণীরা হরিণ মাংস খায়; কিন্তু চক্রযুক্ত মৎস্য আহার নিষিদ্ধ, ছেলের গায়ে চক্র হইতে পারে। কাঁকড়া খাইলে শিশুর মুখে গাঁজলা উঠে। বাঘের মত সাহসী হইবে এবং পেচকের মত রাত্রিতে দেখিতে পাইবে বলিয়া মাহুতেরা

---

(১) কোন কোন জাতির মধ্যে স্বামী পাখী পুষিলে স্ত্রীকে মাছ মাংস মসলা পরিত্যাগ করিতে হয়, নতুবা পাখীর পেটের পীড়া হইতে পারে। যদি কোন কারণে পাখী মরিয়া যায়, স্ত্রীকে প্রহার সহ্য করিতে হয়। কারণ তাহারই আহারদোষে যে পাখী মরিয়াছে, তাহার সন্দেহ কি?

হস্তীকে বাঘের ও পেচকের মাংস খাওয়ায়। দায়াকেরা পুরুষদিগকে হরিণ মাংস খাইতে দেয় না। পুরুষদিগকে যুদ্ধ করিতে হয়। হরিণের মাংস খাইয়া তাহারা হরিণের ন্যায় ভীরু হইতে পারে। নানা দেশে যুবতীদিগকে ভেক মাংস খাওয়ায়, কারণ ভেকরমণী এককালে অনেকগুলি ডিম্ব প্রসব করে। উকুন ও ছারপোকা শীঘ্র শীঘ্র প্রসব করে, প্রসব বেদনায় কষ্ট না হইবার জন্য বাঙ্গালা দেশে গর্ভিণীকে পানের মধ্যে উকুন ও ছারপোকা খাওয়ায়। কারিব জাতিরা কচ্ছপ ও শূকরের মাংস খায় না। খাইলে চক্ষু তাহাদের মত ক্ষুদ্র হইতে পারে। [illegible]রা কুকুরের মত সাহস ও বুদ্ধি হইবে বলিয়া কুকুরের যকৃৎ খায়। আরাবেরা বলে, উটের মাংস খায় বলিয়া তাহারা এত উদ্ধতস্বভাব। শিকারে উৎসাহী এবং নির্ভয় হইবার জন্য সাইবিরিয়ার লোকেরা ভল্লুকমাংস ভক্ষণ করে। কাফির জাতি বাঘ, সিংহ, সর্প ও হস্তী মাংস শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া রাখে। উহার এক একটু খাইলে ঐ সকল জীবের গুণ তাহাদের দেহে প্রবেশ করে। চীনদেশীয় একটী ভৃত্যকে গোপনে নর-ফুস্‌ফুস্‌ খাইতে দেখা গিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল যে, উহা একজন বীর পুরুষের ফুস্‌ফুস্‌। অনেক অসভ্য জাতি এই কারণে যুদ্ধহত শত্রুর মাংস ভক্ষণ করে। নবজিলাণ্ডের লোকেরা শিশুকে প্রস্তর কুচি খাইতে দেয়, আশা শিশুর হৃদয় কোমলতাশূন্য হইবে। এস্কিমো জাতি বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের গলায় ইংরাজদিগের জুতার তলার মালা পরাইয়া দেয়; তাহাদের বিশ্বাস যে, ইংরাজদের অনেক সন্তান হয়, সুতরাং সংসর্গ-গুণে তাহাদের জুতারও সে শক্তি জন্মিয়া থাকে। দেহ-সংস্পর্শে কাপড় বা সুতা, নখ বা চুল, হাতের লেখা, দেহের প্রতিকৃতি এবং দেহীর নাম পর্য্যন্ত দেহীর সকল গুণ সংযুক্ত হয়, অল্প বুদ্ধি নানা জাতি অসভ্যের ইহা সাধারণ বিশ্বাস। কাহাকেও তাহাদের প্রতিকৃতি আঁকিতে দেখিলে অসভ্যেরা ভীত হয়। কারণ চোক, কাণ, হাতের প্রতিমূর্ত্তির সহিত তাহাদের প্রাণের অংশও ছবিতে অবশ্য উঠিয়া যায়। সুতরাং ছবি যত ভাল হয়, তাহাদের ভয়ের কারণও তত বৃদ্ধি হয়। উত্তর আমেরিকা, বোর্ণিও, দাহোমি, লাপ্‌ল্যাণ্ড ও অন্যান্য অনেক স্থলে ইহা দেখা গিয়াছে। অসভ্যেরা মনে করে যে, শত্রুর একটা ছবি পাইলে তাহাকে যাদু করিতে বা বাণ মারিতে বড় সুবিধা হয়। উত্তর আমেরিকার গুণীরা বনের কোন পশু মারিতে হইলে ঘাস কি কাপড় দিয়া তাহার মূর্ত্তি গড়িয়া তাহার উপর তীর মারে।

পেরুদেশের যাদুকরেরা কাহাকে পাগল করিতে বা মারিয়া ফেলিতে হইলে,

হস্তনির্ম্মিত তাহার মূর্ত্তিতে স্চ ফোটায়, চাপিয়া ধরে বা অন্ধকারে বসাইয়া রাখে। আমাদের দেশে সাধারণ বিশ্বাস, গঙ্গাতীরে গোবরে কাহারও মূর্ত্তি গড়িয়া তাহার উপর বাণ মারিলে সে মরিয়া যায়। পূর্ব্বে য়ুরোপেও এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল। বোর্ণিওর যাদুকরেরা মোম দিয়া মূর্ত্তি গড়িয়া ক্রমে ক্রমে গলাইয়া ফেলে। ব্রহ্মদেশের কিরাত জাতি যেখানে শত্রুর পায়ের দাগ পড়ে, সেখানকার মাটীতে মূর্ত্তি গড়িয়া তুলার বীজ ফুটাইয়া দেয়, অমনি শত্রু বোবা হইয়া যায়।

নাম দেহের অংশ বলিয়া বিশ্বাস থাকাতে এবং নাম জানিতে পারিলে লোকে ক্ষতি করিতে পারে ভাবিয়া অসভ্যেরা আপন নাম কাহাকেও বলিতে চায় না, এমন কি প্রতিবেশিমণ্ডলেও প্রকৃত নাম গোপন করিতে চেষ্টা করে। আমাদের রাশিনাম বীজমন্ত্রের ন্যায় বন্ধুবান্ধবের নিকটেও গোপনীয়। রোমকেরা রোমনগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম কাহাকে বলিত না, পাছে শত্রুরা পাণ্ডব-শিবির-প্রহরী মহাদেবের ন্যায় দেবতাকে ভুলাইয়া দেশটি কাড়িয়া লয়। বোর্ণিওর লোকেরা কাহারও পীড়া হইলে তাহার নামটি বদলাইয়া ফেলে, কারণ যে অপদেবতা তাহার নাম জানিতে পারিয়া এত উৎপাত করিতেছিল, নূতন নাম জানিতে না পারিয়া সে আর কষ্ট দিতে পারিবে না। মোহক জাতীয় একটি বৃদ্ধ একজন সাহেবকে বড় ভালবাসিত, সেইজন্য সে আপন নামটি সাহেবকে দিয়াছিল। নামের সহিত সেই দিন হইতে মোহক বৃদ্ধের সমস্ত পুণ্যগৌরব সাহেব লাভ করিয়াছিলেন। চীনদেশীয় চিকিৎসকেরা ঔষধ না মিলিলে একখানি কাগজে ঔষধের নাম লিখিয়া কাগজখানি ধুইয়া জল খাইতে বা ভস্ম সেবন করিতে ব্যবস্থা দেয়। মহারাষ্ট্রে পিতামাতাও জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ধরে না। পরাশর বলিয়াছেন জ্যেষ্ঠ পুত্র ও স্ত্রীর নাম গোপনীয়। কোরাণের শ্লোক ধোয়া জল খাইলে পীড়া আরোগ্য হয়, ইহা মুসলমান সাধারণের বিশ্বাস। শিকন্দ্রায় আকবরের কবর প্রসাদের একখানি প্রস্তর এইরূপে ধুইয়া অর্দ্ধেক ক্ষয় করা হইয়াছে।

প্রতিকৃতি ও নামের ন্যায় নখ, চুল, দন্ত বা উচ্ছিষ্ট যাদুকরের নিকট বড় মূল্যবান। দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের সর্দ্দারেরা নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিলে ভৃত্যগণ যত্নের সহিত লুকাইয়া ফেলে। কোন গুণী জানিতে পারিলে বিষম বিপদ ঘটাইতে পারে। টানা দেশে কাহারও পীড়া হইলে সে বুঝিয়া লয়, দুর্ব্বৃত্ত যাদুকর তাহার উচ্ছিষ্টে নল পাকাইয়া পোড়াইতেছে। তখন যাদুকরের

অনুসন্ধান করিয়া উৎকোচ দিবার জন্য বন্ধুবান্ধবগণ ডঙ্কা বাজাইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয়। এইরূপ বিশ্বাস আমেরিকা, পলিনেসিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, সিংহল, আফ্রিকা ও ইতালী দেশে অদ্যাপি লক্ষিত হয়। আফ্রিকার লোকেরা মৃত শত্রুর দেহাংশ শিঙ্গা ও ঢাকের সহিত বাঁধিয়া রাখে। সে যন্ত্র গুলি বাজাইবার সময় শত্রুর প্রেতাত্মা পর্য্যন্ত যন্ত্রণায় অস্থির হয়।

পীড়া কেন হয়? এই দেখিলাম, সুস্থ শরীরে বসিয়াছিল, সহসা শীতে কাঁপিতেছে, চীৎকার বা ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, ইহার কারণ কি? হাঁচি আসিতেছে বা হাই উঠিতেছে, সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া নিবারণ করিতে পারি না কেন? প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইলে, প্রেতবলের নিকট নরবল পরাস্ত হইলে, আমার শরীর আমার বশ মানে না। রোগ কেবল ভূতের উৎপাত মাত্র, ভূত শান্তি করিতে পারিলেই রোগ শান্তি হয়, ইহা অসভ্য সাধারণের বিশ্বাস। অসভ্যদিগের চিকিৎসক ওঝা। কাফ্রিদিগের মতে রোগের তিনটি কারণ—শত্রুর যাদু, জলদেবতার কোপ, অপদেবতার দৃষ্টি। গিনীদেশের ওঝারা রোগীকে নানা রঙ্গে চিত্রিত করে, তাহা হইলে অপদেবতা সন্তুষ্ট হইয়া ছাড়িয়া দেয়। সাইবিরিয়ার কালমক, কার্গিজ ও বাস্কির জাতি, ভারতবর্ষের নিম্ন শ্রেণীমাত্রেই, বিশেষতঃ আবোর, কাছাড়ী, কোল প্রভৃতি অসভ্য জাতির মধ্যে, আণ্ডামান দ্বীপে, সামোয়া প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে, মাদাগাস্কার দ্বীপে, কারিব প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই বিশ্বাস লক্ষিত হয়। কালমক চিকিৎসকদিগের এক মাত্র চিকিৎসা ভূতঝাড়া। সর্দ্দারের পীড়া হইলে অপর কেহ তাহার নামটি গ্রহণ করে। তখন অপদেবতা সর্দ্দারকে ছাড়িয়া নামওয়ালাকে ধরে। রোম, গ্রীস, আসিরিয়া, বাবিলন প্রভৃতি প্রাচীন পৃথিবীর সভ্যতম জনপদেও এই বিশ্বাস ছিল। আমাজুলু, টঙ্গান ও আবিসিনিয়েরা বলে, অপদেবতার আক্রমণ হেতু ধনুষ্টঙ্কার রোগ হয়। কাহারও হিক্কা হইলে, ইয়াকুতেরা বলে, তাঁহাকে ভূতে পাইয়াছে। প্রসববেদনা ভূতের আক্রমণজনিত বলিয়া কার্গিজেরা মনে করে। এজন্য প্রসববেদনা নিবারণ করিবার জন্য সকলে মিলিয়া অভাগিনীকে প্রহার করিতে থাকে। বিকারে প্রলাপ বকিলে আরাব ও টুপি জাতিরা বলে, রোগীকে ভূতে পাইয়াছে। কেহ পাগল হইলে টঙ্গা, সামোয়া ও সুমাত্রাদ্বীপের অধিবাসীরা বলে, তাহাকে ভূতে পাইয়াছে। ভূতে না পাইলে উন্মাদ কাহার সঙ্গে কথা কয়? কি হেতু শরীরের বল এত বৃদ্ধি হয়? য়ুরোপে অনেক দিন পর্য্যন্ত এই মত প্রচলিত ছিল। আমাজুলু ও সামোয়ানেরা বলে, পরিবারে

কাহারও মৃত্যু হইলে তাহারই প্রেতাত্মা ফিরিয়া আসিয়া পরিবারস্থ অন্যান্যের পীড়া উৎপাদন করে। সাহেব দেখিলে নব কালিডোনিয়ার অধিবাসীরা বলে তাহাদের কোন কৃষ্ণকায় পূর্ব্বপুরুষ রোগ উৎপাদনের জন্য মরিয়া সাদা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কোথায় ব্যথা হইলে আরাবেরা বলে, ভূতে তীর মারিয়াছে। দায়াকদিগের মতে অদৃশ্য অপদেবতার অদৃশ্য বর্শার অদৃশ্য আঘাতে লোকের রোগ জন্মে। লেপচা, কিরাত, ধীমল, বোদো প্রভৃতি ভারতের প্রান্তবাসী অসভ্যদিগের মতে অপদেবতার প্রকোপেই লোকের পীড়া হয়। নিগ্রোরা বলে, শত্রুর যাদু বা ভূতের দৃষ্টি ভিন্ন রোগ হয় না। জুলুরা বলে, পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষকে সন্তুষ্ট না রাখিতে পারিলে তাহারা বংশাবলীর রোগ উৎপাদন করে। মৃত্যু বা যে কোন বিপদ সংসারে ঘটিতে পারে, কুকিরা বলে, সে সকল অপদেবতার কৃত। খন্দ জাতীয়েরা বলে, মানুষকে যে মরিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। দেবতাকে না চটাইলে মানুষ চিরদিন বাঁচিতে পারে। বয়োবৃদ্ধ মরিলেও বুসমানেরা বলে, কেহ যাদু করিয়া বুড়াকে মারিয়াছে। ফান জাতীয়েরা বলে, কেহ গুণ না করিলে মানুষ হাজার বুড়া হইলেও মরে না। জলে ডুবিয়া, গাছ হইতে পড়িয়া, বিষ খাইয়া বা যুদ্ধে শত্রুর আঘাতে মরিলেও তাহারা যে অপদেবতার দৃষ্টি বা শত্রুর যাদুবলেই মরিয়াছে, এই বিশ্বাস লোয়াঙ্গো, টাহিটি, সাণ্ডুইচ্, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নানা দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

কেহ হাঁচিলে আমাদের দেশে “জীব” বলিয়া থাকে। ভাল কি মন্দ কোন দেবতার আবির্ভাবে যে অন্যান্য রোগের ন্যায় হাঁচিও হয়, ইহা নানা জাতির বিশ্বাস। কেহ হাঁচিলে ইংরাজ রমণীরা বলে, “ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।” কাহাকেও হাঁচিতে দেখিলে খন্দেরা বলে, “তাহাকে ভূতে পাইয়াছে”। হোমার, আরিষ্টটল, প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। য়িহুদি, নিগ্রো ও কাফির জাতির মধ্যে, কুর্দ্দিস্থান, ফ্লরিডা, টাহিটি, নরজিলাণ্ড এবং টঙ্গা দ্বীপেও এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানদিগের মতে হাঁচি সয়তানের আবির্ভাবের লক্ষণ। এইজন্য কাহাকেও হাঁচিতে দেখিলে তাহারা “আল্লার” নাম গ্রহণ করে। কাহাকে হাঁচিতে দেখিলে জুলুরা বলে, কোন পিতৃপুরুষের আত্মা তাহাতে প্রবেশ করিয়াছে। এইজন্য হাঁচি পাইলে জুলুরা বলে, “আমি ধন্য, পূর্ব্ব পুরুষের আত্মা আমাতে আসিয়াছে”। তাহারা এই বলিয়া পিতৃপুরুষের আরাধনা করিতে বসে ও তাহার নিকট স্ত্রী, গোরু বা

অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রার্থনা করিতে থাকে। আমাদের ন্যায় জুলুদের মধ্যে হাঁচি পীড়া সারিবার লক্ষণ। কেহ হাঁচিলে বলে, "স্বজাতিগণ আমাকে তোমরা অনুগ্রহ কর, আমার প্রার্থিত সৌভাগ্য মিলিয়াছে"। শিশুকে হাঁচিতে দেখিলে অভিভাবকেরা বলে, "সুখে বাড়িতে থাক"। কাহার পীড়া হইলে প্রতিবাসীগণ জিজ্ঞাসা করে, সে হাঁচিয়াছে কি না? না হাঁচিয়া থাকিলে তাহারা রোগ কঠিন বলিয়া আশঙ্কা করে। জুলু দৈবজ্ঞেরা বড় অধিক হাঁচে, জানাইবার জন্য যে, তাহাদের শরীরে সর্ব্বদাই দেবতার আবির্ভাব। মন্মটপি নামক আফ্রিকার রাজা যখন হাঁচে, অমনি সকল পরিষদ মিলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকে। গিনি দেশে কোন সম্ভ্রান্ত লোক হাঁচিলে উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই জানু পাতিয়া ভূমি চুম্বন করে এবং হাততালি দিতে থাকে। নিগ্রোদিগের সন্তানেরা হাঁচিলে গৃহিণীরা "দূর হও" বলিয়া উঠে, যেন হাঁচি অপদেবতা ছাড়িবার লক্ষণ। নবজিলাণ্ডে কেহ হাঁচিলে উপস্থিত লোকেরা একটি ভূত ছাড়ান মন্ত্র পড়ে। সামোয়ানদিগের মধ্যে হাঁচিবার পর "বাঁচিয়া থাক" বলিবার প্রথা আছে। আমাদিগের ন্যায় টঙ্গানেরা হাঁচিকে মনস্থ কর্ম্মের বিঘ্নসূচক মনে করে। কেহ হাঁচিলে ফ্লরিডার লোকেরা অবনতমস্তকে তাহাকে অভিবাদন করে এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া বলে, "সূর্য্য তোমাকে রক্ষা করুন," "তোমার মঙ্গল করুন," "তোমাকে বড় করুন" ইত্যাদি। আমাদের দেশের ঠগেরা হাঁচিকে বড় ভয় করিত। য়িহুদিরা হাঁচিবার সময় বলে, "টোবিন্ চইন্" অর্থাৎ সুখের জীবন। জার্ম্মান ও ফরাসিদিগের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত আছে।

হাঁচির ন্যায় হাই তোলাও ভূতের আবির্ভাব বলিয়া জুলুরা মনে করে। আমরাও হাই তুলিবার সময়ে তুড়ি দেই ও দেবতার নাম করি। মুসলমান ও য়িহুদিরা হাই তুলিবার সময়ে ঈশ্বরের নাম করে এবং মুখ চাপিয়া ধরে, যেন সয়তান পেটের ভিতর চলিয়া যাইতে না পারে। জার্ম্মনির কোন কোন স্থানে হাই তুলিবার সময়ে মস্তকে ক্রুশের চিহ্ন আঁকিতে হয়। আইস্লাণ্ডেও এই প্রথা।

ভূতপ্রাপ্তির ন্যায় বাহ্য পদার্থের শরীর মধ্যে প্রবেশও রোগের কারণ বলিয়া কোন কোন দেশে সংস্কার আছে। আমাদের দেশে কাহারও দাঁতের পীড়া হইলে ব্যাধকন্যাগণ তাহার মধ্য হইতে কত কি বাহির করে। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় আমাশয় রোগে রোগীর উদর হইতে হাড় ও সূতা বাহির করিতে দেখা

গিয়াছে। কালিফোর্ণিয়ায় কেহ পীড়িত হইলে একটি ডাকিনী আসিয়া তাহার সর্ব্ব শরীর চুষিতে থাকে, অবশেষে রোগীর দেহ মধ্য হইতে হাঁসের ডিমের মত একখণ্ড পাথর বাহির হয়। কাহারও বাতব্যাধি হইলে এস্কিমো ডাকিনীগণ ফুলার মধ্য হইতে চর্ম্মখণ্ড লোম প্রভৃতি বাহির করিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ও অস্ট্রেলিয়ায় পীড়িত শরীর হইতে হাড়ের টুকরা বাহির হয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, কোরাণের বয়েৎ ধোয়া জল বা ঔষধের নাম লেখা কাগজ ভস্ম করিয়া বা ধুইয়া খাইলে রোগ আরাম হয়, ইহা কোন জাতির বিশ্বাস। খন্দ ও মলয় উপদ্বীপবাসী ওরাংলাউট্ জাতি বসন্ত দেবী না আসিতে পারে, এজন্য বাড়ীর চারি দিকে কাঁটা দিয়া রাখে। কুকীদিগের কাহারও পীড়া হইলে ডাক্তারকে ঔষধ খাইতে হয়। অস্ট্রেলিয়ায় পীড়িতের মস্তকে বা স্কন্ধে দড়ি বাঁধিয়া তাহার অপর অংশ কোন আত্মীয় আপন ঠোঁটে ঘসিতে থাকে; ঘসিতে ঘসিতে ঠোঁট হইতে রক্ত বাহির হইলে সে রক্ত পীড়িতের শরীরস্থ বিকৃত রক্ত বলিয়া অনুমান করা হয়। কেবল প্রার্থনা করিলে রোগ সারে, ইংলণ্ডের কোন কোন শ্রেণীর লোকেরা বিশ্বাস করে। আমাদের দেশে চণ্ডীপাঠ করা রোগ সারাইবার একটী প্রধান উপায়।

বন্য পশুর সহিত যুদ্ধ করিয়া দিনান্তে সকল দিন অসভ্যদিগের উদর পূর্ণ হয় না। উপবাসী থাকিলে বা গুরুপাক দ্রব্যে উদর পূর্ণ করিলে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন সুলভ হয়। সভ্যদিগের নিকট স্বপ্ন অকিঞ্চিৎকর, অসভ্যদিগের নিকট সেরূপ নহে। তুমি দেখিতেছ, উহার সমুদয় ইন্দ্রিয় নিস্তব্ধ, মৃত দেহের ন্যায় শরীরটা মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। অপর দিকে তাহার মন একটা হরিণের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া হরিণটা মারিল, তাহাকে কাটিল, তাহার মাংস রাঁধিয়া খাইতে যায়, এমন সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কখন বা খাদ্যপূর্ণ কুটীর, শিশুপূর্ণ সংসার, ফলপুষ্প-পূরিত কানন দেখিয়া আসিল। কে এ সকল দেখিয়া আসিল? আত্মা! দেহ যখন মৃতপ্রায় পড়িয়া, আত্মা তখন স্থানান্তরে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিল। সুতরাং আত্মা দেহ হইতে বিভিন্ন ও জঙ্গম। আবার মৃত্যু ও নিদ্রায় প্রভেদ কি? নিদ্রিতাবস্থায় আত্মা কিছুক্ষণের জন্য দেহ ত্যাগ করিয়া এ দিক ও দিক দেখিয়া ফিরিয়া আসে; তখন মনুষ্য জাগিয়া উঠে। মৃত্যু হইলে আত্মা দেহ ছাড়িয়া যে যায় সে যায়, আর ফিরে না। তুমি দেহ কবরসাৎ বা ভস্মসাৎ কর, আত্মার তাহাতে ক্ষতি নাই। সে স্থানান্তরে আশ্রয় লইয়াছে। সে আত্মার নাম প্রেতাত্মা। প্রেতাত্মায় অসভ্য সাধারণের বিশ্বাস। নদ, নদী, বৃক্ষ, পর্ব্বত

গৃহ সর্ব্বত্র প্রেতাত্মা বিচরণ করে। এ পর্য্যন্ত এমন অসভ্য জাতি দেখা যায় নাই, যাহারা প্রেতাত্মা বিশ্বাস করে না।

কেবল নিদ্রা ও মৃত্যু সময়েই কেন, জাগ্রদবস্থাতেও কখন কখন আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহাকেই লোকে মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগ কহে। আবার অনেক সাধ্য সাধনা করিলে আত্মা আপন আবাস গৃহে ফিরিয়া আইসে; তখন রোগ সারিয়া যায়। কখন কখন স্বপ্নাবস্থায় মৃত আত্মীয় স্বজনের মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মীয় স্বজনের প্রেতাত্মা স্বপ্নাবস্থায় কখন কখন উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া থাকে। সেগুলি সর্ব্বথা পালনীয় এবং বিশেষ মঙ্গল-প্রদ। এজন্য স্বপ্নাদেশের জন্য উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিবার প্রথা আছে। স্বপ্নে প্রায় পিতা মাতাকে ও দেশের প্রধান ব্যক্তিদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য কোন কোন জাতি মনে করে, পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষদিগের ও নীচ জাতির আত্মা মরিয়া যায়।

অসভ্যদিগের মধ্যে আর একটি বিশ্বাস, যখন আত্মা দেহ ছাড়িয়া অল্প বা বহুকালের জন্য স্থানান্তরে গমন করে, তখন অন্য আত্মা আসিয়া কখন কখন দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। এজন্য আমাদের দেশের লোকেরা মৃতদেহের দানবপ্রাপ্তির কথা বলিয়া থাকে। বেতাল্পঞ্চবিংশতিতে এই বিশ্বাসের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান জাতি মনে করে, দেহের ভিতর দুইটি আত্মা আছে। নিদ্রার সময় একটি দেহের মধ্যে থাকে, অপরটি স্থানান্তরে ভ্রমণ করিতে যায়। গ্রীন্লাণ্ডের লোকেরা বলে,দেহ যখন নিদ্রা যায়, আত্মা তখন যথা ইচ্ছা গমন করে। নবজিলাণ্ডের লোকেরা বলে, দেহের নিদ্রা-বস্থায় আত্মা বেড়াইতে গিয়া যাহা দেখিয়া আসে, তাহার নাম স্বপ্ন। ফিজিদ্বীপের লোকেরা বলে, জীবন্ত মনুষ্যের আত্মা অন্যের নিদ্রাবস্থায় তাহার দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কষ্ট দেয়। বোর্ণিও দ্বীপের লোকেরাও এইরূপ বিশ্বাস করে। দায়াকেরা বলে, নিদ্রাবস্থায় আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া দেখিতে শুনিতে ও ভ্রমণ করিতে অন্যত্র যায়, এবং স্বপ্নাবস্থায় যাহা দেখা যায়, তাহা প্রকৃতই ঘটে। ব্রহ্মবাসী কারেন জাতিও এইরূপ বিশ্বাস করে। প্রাচীন পৃথিবীর সভ্য পেরুভিয়দেরও এইরূপ বিশ্বাস ছিল। বাঙ্গালিরা বলে, নিদ্রাবস্থায় প্রাণ-পুরুষ বেড়াইতে যায়, এবং যাহা দেখে বা করে, স্বপ্নে তাহাই দেখা যায়। এই সময়ে প্রাণ পুরুষ কোন কোন আবশ্যক কার্য্য সমাধা করিয়া লয়। একজনের প্রাণপুরুষ নিদ্রাবস্থায় তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলের কলসী মধ্যে প্রবেশ করিয়া-

ছিল। সহসা কলসীর মুখে সরা চাপা পড়াতে সে আর বাহির হইতে পারে নাই। সুতরাং দেহ আর জাগিল না। তখন লোকটি মরিয়াছে বলিয়া বাড়ীর সব হাঁড়ী কলসী ফেলিয়া দেওয়া হয়। জলের কলসী পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইবা মাত্র প্রাণপুরুষ মুক্তি পাইয়া ছুটিয়া দেহ মধ্যে প্রবেশ করে। তখন লোকটি জাগিয়া উঠে। সেই অবধি ছিদ্রযুক্ত আবরণ জলের কলসীর মুখে চাপা দিবার প্রথা হিন্দু পরিবারে প্রচলিত হইয়াছে। পেরুর লোকেরা বলে, দেহ নিদ্রা যায়, আত্মার নিদ্রা নাই। সে অবসর পাইয়া বেড়াইয়া আইসে। পশ্চিম আফ্রিকার যযবান জাতি বলে যে, পিতৃপুরুষগণ নিদ্রাবস্থায় দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বপ্নযোগে উপদেশ দেয়। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা যদি স্বপ্ন দেখে, কেহ তাহাকে বাঁধিয়া প্রহার করিতেছে, তবে জাগিয়া উঠিয়া বাঁধিয়া প্রহার করিবার জন্য আত্মীয়দিগকে অনুরোধ করে। মাদাগাস্কারের লোকেরা বলে যে, নিদ্রাবস্থায় হিতৈষী প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের উপদেশ দেয়। সিংহলের ব্যাধেরা বলে যে, আত্মীয় স্বজনের প্রেতাত্মা স্বপ্নযোগে দেখা দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকার মঙ্গজ জাতি যদি স্বপ্ন দেখে, কোন পূর্ব্বপুরুষ তাহাকে তাড়া করিয়াছে, তবে তাহার সন্তুষ্টির জন্য বলিদান করিয়া থাকে। বাসুট জাতিরও এই রীতি। টঙ্গানেরা বলে, সাধারণ লোকের আত্মা দেহের সহিত মরিয়া যায়। কিন্তু প্রধানদিগের আত্মা বাঁচিয়া থাকে এবং স্বপ্নে দেখা দিয়া পুরোহিত, কুটুম্ব বা অন্যান্য লোককে উপদেশ দেয়। নাসামন জাতি কোন ভবিষ্যৎ কথা জানিতে হইলে পিতৃপুরুষের কবর পার্শ্বে স্বপ্নাদেশের জন্য উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকে। অনেক বাঙ্গালীও এই অভিপ্রায়ে তারকেশ্বর ও বৈদ্যনাথের মন্দিরে হত্যা দিয়া থাকে। ইরিকোয়া, চিপোবা, মালাগাজি, বোণিকা এবং কাফির জাতিরও এইরূপ বিশ্বাস।

নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিয়া যদি কেহ উঠিয়া বেড়ায়, আমাদের দেশে তাহাকে নিশি ডাকিয়াছে বলে। নিশি রাত্রির ভূত। অস্ট্রেলিয়দের মধ্যে যদি কেহ স্বপ্ন দেখে, কেহ তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে, সে জাগিয়া উঠিয়া এক খণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার ফেলিয়া দেয়। কারণ প্রেতাত্মা অগ্নির জন্য আসিয়াছিল, অগ্নি পাইলেই চলিয়া যাইবে। তাহারা বলে যে, কোইন নামে এক প্রকার ভূত মানুষের বেশে মানুষের মত গায়ে চিত্র করিয়া বেড়াইতে থাকে; এবং কাহাকে নিদ্রিত দেখিলে কখন কখন লইয়া পলায়। অভাগার বন্ধুবান্ধবেরা যদি চীৎকার করিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হয়, তখন ভূত তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।

ফিজিয়ানেরা মনে করে, যদি কেহ মূর্চ্ছা যায় বা মরিয়া যায়, সাধ্যসাধনা করিলে তাহার আত্মা ফিরিয়া আসিতে পারে। উত্তর গিনির নিগ্রোরা বলে যে, অকালে আত্মা চলিয়া গেলে মানুষ বৃদ্ধ হয়। অরিগণের অসভ্যেরা বলে, আত্মা যখন দেহ ছাড়িয়া যায়, তখন শীঘ্র শীঘ্র ওঝা ডাকাইয়া তাহাকে ফিরিয়া আনিবার বন্দোবস্ত করা উচিত; নতুবা মানুষটী মরিয়া যাইতে পারে। তিব্বত ও তাতার দেশে বৌদ্ধ পুরোহিতগণ প্রস্থানপর আত্মাকে ধরিয়া দেয়। কাহারও ইন্দ্রিয় বা স্মৃতি-শক্তি শিথিল হইলে তাহারা মনে করে কোন দৈত্য তাহার আত্মাকে চুরি করিয়া থাকিবে। তখন লামা আসিয়া ভূত ঝাড়াইতে থাকে। তাহাতেও যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পীড়িত ব্যক্তিকে ভাল কাপড় পরাইয়া তাহার সঞ্চিত ধন রত্ন নিকটে দিয়া তাহাকে শোয়াইয়া রাখে। তখন আত্মীয়গণ তাহার বাড়ীর চারি দিকে তিন বার প্রদক্ষিণ করে এবং নাম ধরিয়া আত্মাকে সাদরে ডাকিতে থাকে। লামা সেই সময় শাস্ত্র খুলিয়া নরক যন্ত্রণা বর্ণনা করিতে থাকে। এইরূপ করিলে আত্মা না ফিরিয়া পারে না। ব্রহ্মদেশে কিরাত জাতির কেহ পীড়িত হইলে তাহার আত্মীয়গণ পলায়মান আত্মাকে ধরিতে ছুটাছুটি করে। তাহারা বলে, আত্মা বেড়াইতে গিয়া যদি ধরা পড়িয়া আর না ফিরিতে পারে, তবেই লোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাহাদের চিকিৎসকেরা যদি চেষ্টা করিয়া পূর্ব্ব আত্মাকে ফিরিয়া না আনিতে পারে, তবে অন্য কোন জীবিত মনুষ্যের আত্মা আনিয়া মৃত ব্যক্তিকে বাঁচাইয়া দেয়, কিন্তু যাহার আত্মা আনে সে মরিয়া যায়। চীনদেশে পলায়িত আত্মাকে ধরিয়া আনিবার আর এক প্রকার উপায় আছে। তাহারা মৃত ব্যক্তির একটি জামা ও একটি শ্বেত বর্ণের মুরগী বাঁশে বাঁধিয়া আকাশে উড়াইতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বাঁশ আস্তে আস্তে ঘুরিয়া আসিলে বুঝিতে হইবে, পলায়িত আত্মা বাঁশের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে।

কোন কোন জাতি ছায়াকে আত্মা বলিয়া মনে করে। ফিজিরা বলে, মানুষের দুইটি আত্মা। প্রথম ছায়া, ইহা কৃষ্ণবর্ণ, মৃত্যু পরে ইহা নরকে যায়। অপরটি প্রতিবিম্ব, নদীজল বা দর্পণ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ যেখানে মরে দ্বিতীয় আত্মা সেখানে বাস করে। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা ছায়াকে মানুষের জীবন বা আত্মা বলিয়া মনে করে। বাসুটেরা নদী পার হইবার সময় নদীজলে ছায়া পড়িতে দেয় না, কারণ কুম্ভীরে ছায়া ধরিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে। ফিজি, উত্তর আমেরিকার আলগ্‌নকিন জাতি, এবং ব্রহ্ম-

দেশীয় কিরাত জাতি মনে করে মনুষ্যের দুইটি আত্মা। গ্রীশ ও চীন দেশের লোকদিগের মতে তিনটি এবং দাকোটা ও খন্দ জাতির মতে মনুষ্যের চারিটি আত্মা।

মনুষ্য জাতি আত্মার একমাত্র অধিকারী নহে। বনে যাহারা প্রতিবেশী, ভাষা যাহাদের মানুষের ভাষার ন্যায় বোধগম্য, কার্য্য যাহাদের মানুষের মত বুদ্ধি ও ভাবে চালিত, মনুষ্যের ন্যায় যাহারা সুখ, দুঃখ, পীড়া, অশান্তি, যৌবন বার্দ্ধক্য ভোগ করে, সেই জীবজন্তুকে মনুষ্য আপনার ন্যায় আত্মার অধিকারী মনে করিবে, কিছুই বিচিত্র নহে। আবার জীবজন্তুর ন্যায় উদ্ভিদগণেরও জন্ম-জরা, মৃত্যু, সুখ ও দুঃখের সময় আছে। সুতরাং তাহারাও কিয়ং পরিমাণে আত্মার অধিকারী। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা রেটল স্নেক নামক অতি ভীষণ সর্পকে স্বর্গীয় দূত বলিয়া মনে করে। ইণ্ডিয়ানেরা ভালুককে ও কাফি-রেরা হাতিকে বধ করিবার সময় তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। কঙ্গো জাতির কেহ কোন জন্তু বধ করিলে আত্মীয় স্বজনেরা তাহাকে একবার তাড়া করে, তাহা হইলে হত্যাকারির উপর সেই জন্তুর আত্মার ক্রোধের শান্তি হয়। যেসো নিবাসি আইনো জাতি ভালুক মারি'ল তাহার মৃতদেহকে পূজা ও প্রণাম করে। কারিওকেরা ভালুক কি ব্যাঘ্র মারিলে তাহার চর্ম্ম আত্মীয় একজনকে পরাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে দেব সমাদরে নৃত্য করে এবং বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং বলে তাহারা তেমন অন্যায় কাজ করে নাই, তাহাদের শত্রু রুসিয়া-নেরা করিয়া থাকিবে। মৃতদেহ কাটিবার সময় তাহারা রুসদেশ নির্ম্মিত ছুরি ব্যবহার করে। গোলডি ও দায়াক জাতি ভালুক কি কুম্ভীর মারিলে তাহার মৃতদেহকে রাজা, প্রভু, পিতামহ প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করে। সোসাইটি দ্বীপের লোকেরা মানুষের ন্যায় জীবজন্তু ও উদ্ভিদের আত্মা আছে বলে। দায়াকেরা ও ব্রহ্মদেশের লোকেরা বলে, ধান গাছের আত্মা আছে। ধানগাছ শুখাইলে তাহার আত্মা ফিরাইয়া আনিবার জন্য কারেনেরা এইরূপ মন্ত্র বলে—"এস ধানের আত্মা এস, মাঠে এস, ধান গাছে এস, পশ্চিম থেকে এস, পাখীর ঠোঁট, বান-রের মুখ ও হাতীর কণ্ঠা থেকে এস, যাহার গোলায় থাক এস" ইত্যাদি। বৌদ্ধেরা এক সময় গাছের আত্মায় বিশ্বাস করিত। কোন কোন অসভ্য জাতি অচেতন পদার্থেরও আত্মা আছে বলিয়া মনে করে। বাঙ্গালি বালকের দোয়াতে কালি ফুরাইলে আর কাহারও দোয়াত হইতে আসিবার জন্য কালির নাম ধরিয়া ডাকে এবং বালিকাগণ যাঁতি, হাতা, বেড়ি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রকে ভাবী সপত্নীর

প্রাণ বধে সাহায্য করিবার অনুরোধ করিয়া থাকে। জগৎ ভ্রমণশীল—এজন্য গ্রীক দার্শনিক প্লেতো বলিতেন—জগতের আত্মা আছে।

পাছে পরস্পরকে হিংসা করে, এই ভয়ে উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা দুই থান জাল এক সঙ্গে ফেলে না এবং যে বঁড়শীতে একবার মাছ ধরিয়াছে, এক মুঠা বঁড়শী অপেক্ষা তাহাকে অধিক মূল্যবান মনে করে। কাপ্তেন লিয়ন সাহেবের বাজাইবার একটি বড় অর্গান ও একটি ছোট বাক্‌স ছিল। এস্কিমো জাতিরা ছোট বাক্‌সটিকে বড় অর্গানের সন্তান মনে করিত। বুশমানেরা চাপমান সাহেবের বড় গাড়ীকে ছোট গাড়ীর মা বলিত। কুক্ সাহেব টাহিটি দ্বীপের লোকদিগকে কয়েকটি পেরেক দিয়াছিলেন, তাহারা সেইগুলি মাটিতে বপন করিয়াছিল। ইহারা বলে পাথরের আত্মা আছে। এবং পাথর ভাঙ্গিয়া গেলে মনে করে, তাহার আত্মা স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে। টঙ্গানেরা বলে, কুড়ালি কি বাটালি ভাঙ্গিয়া গেলে তাহাদের আত্মা দেবতাদের কার্য্য করিতে চলিয়া যায়। ইহাদের মতে ঘরেরও আত্মা আছে। মোহক জাতি হ্রদের এবং হিন্দুরা নদী, পর্ব্বত ও বৃক্ষাদির আত্মা আছে বলিয়া মনে করে। পাথর ভাঙ্গিলে ইহারা গঙ্গাজলে তাহার সৎকার করে এবং নূতন গৃহে প্রবেশ সময়ে গৃহের আত্মার পূজা করিয়া থাকে। আদিম নিবাসিদিগের ধর্ম্মমত পর্য্যালোচনা করিবার সময় আমরা আত্মা ও প্রেতাত্মার আকার, প্রকার, বেশ, ভূষা, খাদ্য ও বাসস্থান সম্বন্ধে অসভ্যদিগের বিশ্বাস সবিস্তর বর্ণনা করিব।

নিমিত্ত, চিহ্ন বা লক্ষণ ভবিষ্যতের মঙ্গলামঙ্গলের যে সূচক, এই বিশ্বাস সকল অসভ্যজাতির মধ্যে লক্ষিত হয়। কোনটী কিসের লক্ষণ অসভ্যেরা পুরুষানুক্রমে তাহা শিক্ষা করে। যখন তাহাদের নিজের বুদ্ধিতে না কুলায়, নিমিত্তের অর্থ করিতে, ভবিষ্যৎ গণনা করিতে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে দৈবজ্ঞ, যাদুকর বা ডাকিনীর প্রয়োজন হয়। দৈবজ্ঞ অসভ্যদিগের চিকিৎসক, দৈবজ্ঞ অসভ্যদিগের মন্ত্রী, দৈবজ্ঞ অসভ্যদিগের শাস্ত্রকার, দৈবজ্ঞ অসভ্যদিগের পুরোহিত। দৈবজ্ঞ সকল অসভ্য দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষিত উড়িয়া রাজা জ্যোতিষীর পরামর্শ ভিন্ন এক পা চলিতে পারেন না।

জুলুরা যখন গরু কিনিতে যায় বা কোন স্ত্রীলোকের নিকট বিবহের প্রস্তাব করিতে যায়, তখন সেই স্ত্রীলোকের বা বিক্রেতার মন নরম করিবার জন্য এক টুকরা কাট চিবাইতে চিবাইতে গিয়া থাকে। খন্দ জাতি যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে ধান গাদার উপর কয়েকটা তীর বসাইয়া দেয়, যদি তীরগুলি পড়িয়া যায়, বুঝিতে

হইবে যে,সন্ধি করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিলে বুঝিবে যে যুদ্ধ করাই বিধেয়। ভূদেবীর নিকট নরবলি দিবার সময় যদি যন্ত্রণায় অভাগার চক্ষু হইতে অনবরত জল পড়িতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, মাঠে যথেষ্ট বৃষ্টি হইবে। জার্ম্মানির অধিবাসীরা বলে পীড়া সময়ে যদি কুকুর উর্দ্ধমুখে কাঁদে তবে পীড়িতের আরাম নিশ্চয়। নিম্নমুখে কাঁদিলে মৃত্যু হইবে। আমাদের দেশে দিবসে শৃগাল ও পেচকরব এবং গমনকালে টিক্‌টিকির শব্দ অমঙ্গলসূচক। বামে শব, শিবা, কুম্ভ, দক্ষিণে গো, মৃগ, দ্বিজ, শুভসূচক। কর্ণওয়ালের লোকেরা বলে মাছের লেজের দিক হইতে খাইতে আরম্ভ করিলে জলের মাছ কিনারায় আইসে। সারবিয়া দেশের লোকেরা বলে একটী অল্পবয়স্কা কুমারীকে পত্রপুষ্পে সাজাইয়া মাথায় জল ঢালিয়া দিলে বৃষ্টি হয়।

গত শতাব্দিতে ইংলণ্ডের একটী রাজার পীড়ার সময় তাহার সমবয়স্ক একটী সিংহের মৃত্যু হয়, ইহাতে সকলে ভাবিয়াছিল রাজারও মৃত্যু নিশ্চয়। বিশেষ বিশেষ জন্তু দর্শন অভিপ্রেত কর্ম্মের শুভাশুভের নিমিত্ত বলিয়া মনে করা দায়াক, টুপি প্রভৃতি নানাজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। পরামর্শ সময়ে পেচকের রব অমঙ্গলের লক্ষণ ; কিন্তু যুদ্ধ পরামর্শ করিবার সময় বাজ পাখী উড়া মঙ্গলসূচক বলিয়া মেয়রিরা মনে করে। তাতারদিগের মধ্যেও এইরূপ বিশ্বাস। তাহারা পেচার ডাককে বড় ভয় করে। কিন্তু সাদা পেঁচার ডাক মঙ্গলসূচক বলিয়া জ্ঞান করে। যদি দক্ষিণ দিকে বাজ পাখী উড়িয়া যায়, তবে আনন্দে ধন্যবাদ দিতে থাকে ; কিন্তু বামে উড়িলে বিপদ হইবে বলিয়া আতঙ্কিত হয়। এইরূপ দক্ষিণ বা বামে মাছরাঙ্গা পাখী উড়িলে মঙ্গলামঙ্গল ঘটিবে বলিয়া এক শ্রেণীর নিগ্রো জাতি মনে করে। জার্ম্মাণদিগের মধ্যে গমনকালে মেষ দেখিলে শুভ হয়। কিন্তু শূকর দেখিলে অশুভ নিশ্চয়। কর্ণওয়ালের কারিকরেরা খনিমুখে প্রবেশ করিবার সময় যদি একটী শশক বা একটী বৃদ্ধ স্ত্রীলোক দেখে, তবে সে দিন বিপদ হইবার ভয়ে আর প্রবেশ করে না। স্বপ্ন হইতে ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ণয় করাও অনেক দেশের রীতি। মায়াদেবীর স্বপ্নে হস্তীদর্শন, চন্দ্রাপীড়ের মায়ের চন্দ্র দর্শন, এবং বাইবেলে উল্লিখিত যুসফের স্বপ্ন কথা অনেকেই অবগত আছেন। অস্ট্রেলিয়ার একটী লোক একদিন পেচকস্বপ্ন দেখিয়াছিল। পেচক স্বপ্ন শত্রুপক্ষের আক্রমণসূচক। তাহার স্বপ্নকথা শুনিতে পাইয়া সমস্ত জাতি গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। কামাস্কাটকার লোকেরা কুকুর স্বপ্ন দেখিলে রুসিয়ার লোক বেড়াইতে আসিবে মনে করে। আমাদের দেশে সর্পস্বপ্ন সন্তান

সূচক, রক্তস্বপ্ন অর্থসূচক। পরের অমঙ্গল নিজের মঙ্গলসূচক। জুলুরা পীড়িতের মৃত্যুস্বপ্ন দেখিলে মনে করে, সে মরিবে না। কিন্তু বিবাহের নৃত্যস্বপ্ন মৃত্যু সূচক জ্ঞান করে। য়ুরোপে সাধারণ বিশ্বাস—যাহা স্বপ্নে দেখা যায়, তাহার বিপরীত্ ঘটে। কোন কোন জাতির মতে স্বপ্নে হাস্য বিপদসূচক। মুসলমানেরা বলে, শ্বেত ও পীতবর্ণ কোন দ্রব্যের কি জলের স্বপ্ন মঙ্গলের নিমিত্ত। কিন্তু কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ বা অগ্নিস্বপ্ন অমঙ্গলের লক্ষণ। স্বপ্নে ময়ূরের অর্থ রাজা, তালগাছের অর্থ আরবদেশীয় লোক। যদি কেহ স্বপ্নে নক্ষত্র খায়, সে ধনবানের বাড়ীতে বিনাব্যয়ে সুখে থাকিতে পারিবে।

মধ্য-আফ্রিকায় গুণীরা লক্ষণ দেখিয়া অপরাধীদিগকে ধরিয়া দেয়। তাহারা একটী মুরগী কাটিয়া দেখে, যদি তাহার পাখার কোন দাগ থাকে, তবে সন্তান বা কুটুম্বের মধ্যে কেহ অপরাধী। পৃষ্ঠে দাগ থাকিলে মাতা বা পিতামহ অপরাধী ইত্যাদি। ব্রাণ্ডেনবর্গ দেশে শূকর কাটিয়া যদি দেখা যায়, তাহার প্লীহা বিপরীতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, তবে নিশ্চয়ই বৎসর মধ্যে পরিবারের কাহারও মৃত্যু হইবে। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা আগুনে হাড় ফেলিয়া তাহার বর্ণ অনুসারে স্থির করে, শীকার করিতে যাইলে সফল হইবে কি না। তাতারদের মধ্যে এইরূপ প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। হাড় লম্বালম্বী ফাটিলে মঙ্গল হইবার, আড়দিকে ফাটিলে বিঘ্ন হইবার, সাদা দাগ হইলে বরফ পড়িবার এবং কাল দাগ পড়িলে শীত অল্প হইবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বে আয়র্লাণ্ডের লোকেরা ভেড়ার কণ্ঠের হাড়ে কাল দাগ দেখিলে মৃত্যুর আশঙ্কা করিত।

করকোষ্ঠী দেখিয়া শুভাশুভ গণনা করিবার প্রথা প্রাচীন কালে গ্রীশ ও ইতালি দেশে প্রচলিত ছিল, অদ্যাপি ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। তাশ বা পাশা দিয়া ভবিষ্যৎ গণনা করা অনেক দেশে প্রচলিত। পাতায় বা মাটিতে কিছু আঁকিয়া তাহার উপর হাত দিয়া তীর বা অন্য কোন পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া শুভাশুভ গণনা করা বা দোষী নির্দ্দোষী নির্ণয় করা অনেক সভ্য জনপদে দেখিতে পাওয়া যায়। একটী কাঁচের গ্লাসের মধ্যে সূতাতে অঙ্গুরী বাঁধিয়া লম্বভাবে রাখিলে যতবার অঙ্গুরীয়কটী গ্লাসের গায় স্বতঃই লাগিয়া শব্দ উৎপাদন করে, তাহা হইতে সময় নির্ণয় করা য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে সাধারণতঃ প্রচলিত। নল টানিয়া চোর ধরা ভারতবর্ষে এবং য়ুরোপে দেখিতে পাওয়া যায়। জন্মকালীন তিথি নক্ষত্র ধরিয়া শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ঘটনা সকল নির্ণয় করিবার প্রথা পূর্ব্বে য়ুরোপের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল; অদ্যাপি জার্ম্মানিতে, ভারতবর্ষে ও

পারস্য দেশে প্রচলিত আছে। সিংহ রাশীতে জন্মিলে সাহসী ও মেষ রাশীতে জন্মিলে লোক নম্র প্রকৃতি হয় এবং কর্কট রাশীতে জন্মিলে জীবনে বিস্তর বাধা পায়।

নিগ্রো জাতি ষোল কড়া কড়ি লইয়া ফেলিয়া দেয়। যদি সবগুলা উপুড় হইয়া পড়ে, বুঝিতে হইবে যুদ্ধ নিশ্চয়; সবগুলা চিৎ হইয়া পড়িলে যুদ্ধ হইবে না। জুলুরা যুদ্ধে যাইলে তাহাদের স্ত্রীরা আপনাদের হাতে বোনা মাদুর দেয়ালেয় গায় ঝুলাইয়া দেয়। যতক্ষণ দেয়ালের গায় ছায়া পড়ে ততক্ষণ কোন বিপদ নাই। ছায়া না পড়িলে যুদ্ধে স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, বুঝিয়া কাঁদিতে বসে।

যখন নিজ শক্তিতে শত্রুদমনের সম্ভাবনা থাকে না, তখন ডাকিনী বা ওঝার আবশ্যক হয়। প্রেতাত্মা উহাদের বশীভূত, ও সাধারণ মনুষ্যের অতীত দ্রব্যগুণ তাহাদের জানা থাকে। উহাদের সাহায্যে তাহারা ইচ্ছা করিলেই কাহাকে কষ্ট দিতে, পীড়ায় ফেলিতে বা মারিতে পারে। কঙ্গোদেশে কাহাকে মারিতে হইলে ওঝারা একটী গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে গাছ রোপণ করে। সেই গাছ যত শুখাইতে থাকে, শত্রুর দেহ তত শুখাইয়া যায়। দেবমন্দিরে যেখানে অগ্নি জ্বলে, ফিজিয়ানেরা তাহার নীচে একটী নারিকেল উর্দ্ধমুখে বসাইয়া দেয়। অগ্নিতাপে জল যত শুষ্ক হইতে থাকে, শত্রুর প্রাণ তত শুখাইয়া যায়। শত্রুর চুল, কাপড় বা উচ্ছিষ্টের অংশ আগুণে পোড়ান, ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। চারি দিন এইরূপ পোড়াইতে হয়, কিন্তু শত্রু যদি চতুর্থ দিবসের পূর্ব্বে স্নান করে, তবে তাহার কোন ক্ষতি হয় না। যাদু করিবায় ভয় অসভ্যদের মধ্যে এত প্রবল যে, কাহাকে যাদু করা হইয়াছে শুনিতে পাইলে, সে ভয়েই মরিয়া যায়। ভারতবর্ষে শত্রুর মূর্ত্তি গড়িয়া তাহাকে কাঁটা ফোটাইবার, বাণ মারিবার বা তাহার হাত পা ভাঙ্গিয়া দিয়া শত্রুকে মারিয়া ফেলিবার বা বিকলাঙ্গ করিয়া দিবার রীতি আছে। পূর্ব্বে রোমদেশে এ রীতি দেখা যাইত। নেপালীদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধের সময় একখানি চিঠী ধরা পড়িয়াছিল। গৌরী সাহু লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, ইংরাজ-সেনাপতির নাম জানিয়া লইয়া একখানি কাগজে লিখিয়া সিন্দূর, চাউল ও সেই কাগজ খানি হাতে করিয়া তিনবার মন্ত্র পড়িতে হইবে। তাহার পর কুলকাঠের আগুনে তাহা জ্বালাইলে সেনাপতির মৃত্যু হইবে। শত্রুর কোন দ্রব্য লইয়া তাহার উপর মন্ত্র পড়িলে শত্রুর শরীরে ভূত প্রবেশ করে। এইরূপে শত্রুকে জব্দ করা অসভ্যদিগের সাধারণ উপায়। শত্রুর আত্মাকে ভুলাইয়া আনিয়া ডাকিনীরা গর্ত্ত মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে,

এরূপেও শত্রুকে মারিয়া ফেলিবার রীতি আছে। নবজিলাণ্ডে এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। ট্যাসমেনিয়ার লোকেরা শত্রুর কোন দ্রব্য লইয়া চর্ব্বি মাথাইয়া আগুনে ফেলিয়া দেয়। চর্ব্বি যত গলিতে থাকে তাহার শরীর তত খারাপ হয়। চীনদেশের গণকেরা ভূতসিদ্ধ। যাহাকে তাহারা কখন দেখে নাই, নাম শুনিবামাত্র তাহারা তাহার সম্বন্ধে নানা সম্বাদ বলিতে পারে। স্পর্শ না করিয়া ভূতের সাহায্যে তাহাদের পেন্সিল, কাগজ বা বালির উপর আপনা আপনি লিখিয়া থাকে। ভাস্কোডিগামা কালিকটে পৌছিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় গণকেরা একটা বাটীতে জল রাখিয়া তাহার মধ্যে তাঁহার তিনখানি জাহাজ দেখাইয়াছিল। কোচিনের গণকেরা আলমেডাকে বলিয়াছিল যে, তাঁহাকে জন্মভূমি আর দেখিতে হইবে না। পথেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। মেডাউস্ টেলার তাঁহার জন্মবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, একজন হিন্দু-গণক তাঁহার জীবনকালের অতীত ঘটনা সকল যথাযথ বর্ণনা করিয়াছিল, এবং ভবিষ্যতে যাহা যাহা ঘটিবে বলিয়াছিল প্রকৃত পক্ষে সেইরূপই ঘটিয়াছিল। গণক যে উচ্চ রাজপদের তাঁহাকে প্রত্যাশা দিয়াছিল, বলিবার সময় তিনি তাহাকে চাটুকার বা প্রতারক বলিয়া অনুমান করিয়া থাকিলেও, অভাবনীয় সেই উচ্চ পদে যখন তিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তখন সেই কৃষ্ণকায় অসভ্য ব্রাহ্মণকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে মনে নমস্কার করিয়াছিলেন। থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ের অধিনেত্রী বিবি ব্লাভাস্কির একজন বন্ধুর সমক্ষে তিব্বতের একজন লামা তিন মাসের একটী শিশুকে বসাইয়াছিল, চলাইয়াছিল এবং কথা কওয়াইয়াছিল ; অথচ কেহ তাহার অঙ্গ স্পর্শ করে নাই। মস্কাটের গুণীরা কোন একটী ফল দেখিবামাত্র তাহা স্পর্শ না করিয়া তাহার ভিতরের শাঁস খাইয়া ফেলিবে, অথচ বাহিরে একটী দাগও দেখা যাইবে না। সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের লোকেরা ডাকিনীতে বিশ্বাস করিত। স্ত্রীলোক দরিদ্রা, বৃদ্ধা, কদাকার ও সন্তানশূন্য হইলে, তাহাকে ডাকিনী বলিয়া মনে করিত। ডাকিনীরা প্রায়ই বিড়াল পুষে এবং মার্জ্জনী চড়িয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে। জলে ফেলিয়া দিলে অতি সহজে ডাকিনী পরীক্ষা করা যায়। যদি সে জলে ভাসে, তবে সে নিশ্চয় ডাকিনী ; লোকে তাহাকে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিতে কুণ্ঠিত হয় না। যদি ডুবিয়া মরিয়া যায় তবে সে ডাকিনী নহে। অদ্যাপি য়ুরোপ ও আমেরিকার সভ্যতম জনপদেও সাধারণ লোকে ভূতসিদ্ধে বিশ্বাস করে। ডাক্তার ফিরাণ একবার চালুনির মধ্যে এক দল ভূত আনিয়া সমুদ্রে ঝড় তুলিয়াছিলেন। সেই সময় কয়েকখানি সরকারী জাহাজ আসিতে-

ছিল ; এই অপরাধে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ তাঁহাকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে মেক্সিকো দেশে একটী স্ত্রীলোককে ডাকিনী বলিয়া জীবন্তশরীরে দগ্ধ করা হইয়াছিল। অদ্যাপি ইংলণ্ডের ফৌজদারী আদালতে ডাকিনী বলিয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে যন্ত্রণা দিবার মোকদ্দমা হইয়া থাকে। ভূতসিদ্ধ লোকেরা দৈববলে অসাধারণ কার্য্য করিতে পারে। আকাশে বসিয়া থাকা, বাতাসে উড়িয়া যাওয়া, বহুদূর হইতে সংবাদ আনা, মৃতকে জীবন দেওয়া অনুরাগ উৎপাদন করা, গুরুভার দ্রব্য দূরে নিক্ষেপ করা, প্রভৃতি কোন কর্ম্মই তাহাদের অসাধ্য নহে। সকলেই সেরূপ নানা ঘটনার কথা শুনিয়াছেন।

---

# পঞ্চম পল্লব।

ক্ষুধা হইলে আহার করিতে ইচ্ছা হয়, ক্লান্তি বোধ হইলে নিদ্রা যাইতে হয়, এগুলি শরীরের নিত্য ধর্ম্ম। স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হইলে দেহ কুঞ্চিত বা স্ফারিত হয়, দৌড়িতে হয় বা নৃত্য করিতে হয়—এগুলিও নিত্য। গাত্র লেহন বা চুম্বন, হাস্য বা ক্রন্দন অনেক সময়ে স্নায়ুকণ্ডুয়নে জন্মে। সকল সময়ে সে কার্য্যগুলি সহানুভূতিসূচক নহে। দুইটী জীব স্ত্রীপুরুষ সমেত যত্নে সন্তান প্রতিপালন করিয়া থাকে, ইহাকেও জীবের নিত্য ধর্ম্ম বলি। যখন পরস্পরের স্বেচ্ছাচার ন্যূন করিয়া সমেত যত্নে সাধারণের স্বার্থ সাধনে অনেকে মিলিয়া কার্য্য করে, তখন সামাজিকতার আরম্ভ। একটি মহিষকে আক্রমণ করিলে আর একটি মহিষ যদি আততায়ীকে আক্রমণ করে, তাহাও নিত্য ধর্ম্ম হইতে পারে। স্নায়ুর উত্তেজনায় সেরূপ কার্য্য অনেক সময়ে ঘটে। কিন্তু যখন কয়েকটীকে প্রহরী রাখিয়া আর কয়েকটীকে আবশ্যক কর্ম্ম সাধন করিতে দেখি, মণ্ডলীর সমস্ত কার্য্য বিভাগ করিয়া, এক এক দলকে এক এক প্রকার কার্য্য করিতে লক্ষ্য করি, তখন বলি ইহারা সামাজিক জীব। নিত্য ধর্ম্ম সম্পাদন করিতে করিতে ক্রমোন্নতির সহিত জীব সামাজিক ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছে,

সুতরাং কোথায় একটীর অন্ত, অন্যটির আরম্ভ ঠিক বলা যায় না। কিন্তু যখন দেখি, একজনের সাধ্যাতীত কর্ম্ম অনেকে সমেত যত্নে সাধন করিতেছে, তখন তাহাকে সামাজিক ক্রিয়া বলিয়া সহজে নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

মৌমাছি, বোল্‌তা ও পিপীলিকা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। দেহের উন্নতির সহিত জীবের মনের উন্নতি হয় এবং মনের উন্নতির সহিত সামাজিক প্রবৃত্তির বিকাশ হইতে থাকে। দেহের উন্নতি অনুসারে পিপীলিকাদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। নিম্নতম শ্রেণীর পিপীলিকাদের সামাজিক ভাবের লেশমাত্র নাই। প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান হইয়া বাস করে। কিন্তু ঐ জাতীয় জীবের উচ্চতম শ্রেণীতে সামাজিকতার অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতের মধ্যে কার্য্যবিভাগ, গৃহনির্ম্মাণ, ভিন্ন কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ, দাস রক্ষা বা গার্হস্থ্য জীব পালন দেখা যায়। ইহারা বিপদে পরস্পরের সাহায্য করে, পীড়িতের শুশ্রূষা করে, এবং ভবিষ্যতের আয়োজন করিয়া রাখে। ইহাকেও প্রকৃত সামাজিকতা বলা যায় না—পারিবারিকতা বলা যাইতে পারে। কারণ ইহারা সকলে এক মায়ের সন্তান—এক পরিবার। জ্ঞাতি বা জাতীয় জীব সকলে একত্র মিলিয়া যখন কোন কর্ম্ম করে, তখন তাহাকেই সামাজিকতা বলা যায়। পরস্পর নিকটবর্ত্তী পরিবার সকল একত্র হইয়া ক্রমে এক সমাজ হয়। পরস্পর নিকটবর্ত্তী সমাজ সকল একত্র হইয়া একটী রাজ্য গঠন করে।

মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জন্তুদিগের মধ্যে প্রকৃত সামাজিকতার আরম্ভ। বায়সেরা বহু পরিবার একত্রে বাস করে। অপরিচিতকে স্থান দেয় না। এক প্রকার শাসন-নীতি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। দোষীরা দণ্ড পায়, দোষের পরিমাণানুসারে দণ্ডেরও তারতম্য হইয়া থাকে এবং দোষ বিশেষ গুরুতর হইলে নির্ব্বাসনের বিধি প্রচলিত আছে। অর্জ্জনকারী স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ভোগ করিতে পায়। ভবিষ্যতের বিপদ নিবারণের উপায় করিতে জানে। চরিবার সময় ইহারা প্রহরী রাখিয়া চরে। উত্তর আমেরিকার বনে দেখা গিয়াছে, মহিষীদিগের প্রসব সময়ে মহিষেরা তাহাদিগকে মধ্যে রাখিয়া আপনারা দল বাঁধিয়া পাহারা দিতে থাকে যেন হিংস্র জন্তুরা বৎসদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে। পশুদিগের মধ্যে সর্দ্দার বা রাজা দেখিতে পাওয়া যায়;—ইহাও তাহাদের সামাজিকতার প্রমাণ। সমেত যত্নে, বীবরদিগের গৃহনির্ম্মাণ প্রসিদ্ধ। মনুষ্যের ন্যায় আকারবিশিষ্ট জন্তুদিগের মধ্যে প্রভুভক্তি, সমেত যত্ন, প্রহরী রক্ষণ,

সঙ্কেতজ্ঞতা, স্বত্বাধিকার, পরিশ্রমের আদান প্রদান, অনাথপালন এবং বিপন্নের উদ্ধার চেষ্টার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়।

জীবদেহ বীজে বিন্দুমাত্র—ক্রমে আয়তন বৃদ্ধি হয়, আয়তন বৃদ্ধির সহিত আকৃতির পরিবর্ত্তন হয়, আয়তন বৃদ্ধি ও গঠন পরিবর্ত্তনের সহিত দেহগত কার্য্য প্রণালী মিশ্র ও পরস্পরের সাপেক্ষ হইয়া উঠে। অতি নিম্ন শ্রেণীর জীবগণের ইন্দ্রিয়-চিহ্ন নাই, শরীরের বিভিন্ন কার্য্যের জন্য বিভিন্ন অঙ্গ নাই। সে অবস্থায় শরীরের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশ যেন স্বতন্ত্র প্রাণবিশিষ্ট। সমস্ত শরীর হইতে এক অংশ কাটিয়া লও, শরীর পূর্ব্বেও যেমন পূর্ণ ও প্রাণবিশিষ্ট ছিল, এখনও তেমনি পূর্ণ ও প্রাণবিশিষ্ট দেখিবে। আবার যে অংশটী সমস্ত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলে, সে স্বয়ং স্বতন্ত্র প্রাণবিশিষ্ট একটী পূর্ণ জীব হইয়া মাতৃজীবের মত জৈবিক সকল কার্য্য সম্পাদন করিবে। তাই বলিতেছিলাম দেহের সকল অংশই যেন স্বতন্ত্র প্রাণবিশিষ্ট। ক্রমে অতি অস্ফুট দুই একটী অঙ্গ দেখা যায়। এই অঙ্গ সকল কেহ কাহারও সাপেক্ষ নহে, প্রত্যেকে স্বাধীন, যে যাহার কার্য্য সাধন করে, এমনি ভাবে কার্য্য করে যেন, জগতে দ্বিতীয় কেহ নাই। তখনও মস্তিষ্ক জন্মে নাই যে, সকলের কার্য্য বিভাগ করিয়া দিবে, পরস্পরের দিকে চাহিয়া কার্য্য সাধনে প্রবৃত্তি জন্মাইবে; পরস্পরের কার্য্য মিলাইবে; আমরা সকলে এক পরিবার, পরস্পরের দিকে চাহিয়া কার্য্য করিলে সকলেরই সুবিধা হইবে এ কথাটী বুঝাইয়া দিবে। প্রত্যেকে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করাতে একটী অঙ্গের ক্ষতি বৃদ্ধিতে অন্য অঙ্গের ক্ষতি বৃদ্ধি বোধ হয় না। এক দেহ সংযুক্ত হইলেও কার্য্য-প্রণালী দেখিলে বোধ হয়, যেন এক একটী অঙ্গ এক একটি ভিন্ন দেহের।

ক্রমে মস্তিষ্ক জন্মে। মস্তিষ্ক জীবদেহের সর্দ্দার। এখন আর পূর্ব্বের মত যথেচ্ছাচার নাই, প্রত্যেকের স্বতন্ত্রতা নাই, কার্য্য-প্রণালীর অমিশ্রতা নাই। অঙ্গ বৃদ্ধির সহিত কার্য্য-প্রণালী ক্রমে বিমিশ্র হইয়া আসিতেছে, পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষ হইয়া পড়িতেছে। প্রত্যেকের কার্য্যগত বিভিন্নতার মধ্যে সাধারণের হিতকরী একটি একতা জন্মিয়াছে। এখন একটি অঙ্গের ক্ষতি বৃদ্ধিতে সকল অঙ্গের ক্ষতি বৃদ্ধি হয়; সুতরাং পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি জন্মিয়াছে। যাহাতে কাহারও ক্ষতি না হয়, সে জন্য সকলে সতর্ক হইয়াছে, যাহাতে কাহারও উপকার হয়, সে জন্য সকলের বাসনা জন্মিয়াছে। এইরূপে দেহের অঙ্গ সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত কার্য্য-প্রণালী যত বিমিশ্র হইয়া উঠে, তত পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষ হইয়া

পড়ে। জীবরাজ্যে উন্নত হইতে উন্নততর শ্রেণি পরীক্ষা করিয়া দেখ, ক্রমে বিমিশ্রতা ও সাপেক্ষতা বৃদ্ধি হইয়াছে।

সমাজের ক্রমবিকাশ জীবদেহের ক্রমবিকাশের অনুরূপ। অতি নিকৃষ্ট অবস্থায় প্রত্যেক লোক স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করে, কেহ আপন কাজ ছাড়া অন্যের হিতাহিত কিরূপ ঘটে, তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। সকলে এমনি যথেচ্ছাচার কার্য্য করে, যেন জগতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করাতে দেহ-রক্ষার জন্য যে কোন কার্য্য আবশ্যক প্রত্যেককে তাহার সকলি করিতে হয়। প্রত্যেকে আপন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে, প্রত্যেকে আপন পরিধেয় প্রস্তুত করে, প্রত্যেকে আপন গৃহ নির্ম্মাণ করে, জীবন রক্ষার জন্য যাহা কিছু চাই, সকলি আপনাকে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়—সুতরাং যে অবসর উন্নতির জন্মদাতা—সেই অবসর অভাবে এই অবস্থা হইতে দ্বিতীয় বা পশুপালন অবস্থায় যাইতে যত সময় লাগে, পশুপালন অবস্থা হইতে কৃষিজীবী অবস্থায় যাইতে তত সময় লাগে না। অন্যদিকেও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। একদিন কেহ একটী বৃহৎ পশু বধ করিয়া রাশী রাশী ভক্ষণ করিল, তথাপিও সমস্ত পশুটী নিঃশেষ করিতে পারিল না। আমরা এমন অবস্থায় দশ জনের সঙ্গে ভাগ করিয়া উপভোগ করি। যে দিন আবার আমার আহার্য্য না থাকিবে, অন্যেরা তাহাদিগের আহার্য্যের আমাকে অংশ দিবে। নিকৃষ্টতম স্বাতন্ত্র্যপ্রধান অবস্থায় তাহা ঘটে না। প্রথম দিনের ভোগাবশিষ্ট যাহা থাকিবে, গলিত দুর্গন্ধ অবস্থায় অন্য দিন তাহা আহার করিতে হইবে বা ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে—অথচ কোন কোন দিন আহার্য্য অভাবে উপবাস-যন্ত্রণাও সহ্য করিতে হয়। যাহা হউক এ অবস্থার কি কি কষ্ট, তাহা দেখান আমাদের উদ্দেশ্য নহে, সামাজিকতা কিরূপে বিকশিত হইয়াছে, তাহাই দেখাইতে হইবে। এখন আমরা সামাজিক জীব; সামাজিকতা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, পরস্পরের দিকে চাহিয়া কার্য্য করা, আমাদের এমনি অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, যে সামাজিকতা মানবজাতির প্রকৃতিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়;—অবস্থান্তর এখন আমরা অনুমান করিতে পারি না। সিংহলের বন ব্যাধেরা এক একটী দম্পতি স্বতন্ত্র বাস করে—বিশেষ আবশ্যক না হইলে দশ পনর জন একত্র হয় না। বুশমানেরা এক একটী পরিবার দূরে দূরে বাস করে,—কচিৎ কয়েকটী পরিবার একত্র হয়। ফুয়েজিরা দশ বারটীর অধিক একত্র বাস করে না। অষ্ট্রেলিয়, ট্যাসমেনিয় ও আণ্ডামান দ্বীপের অধিবাসীদিগকে চল্লিশ পঞ্চাশটীর অধিক

একত্র দেখা যায় না। আবাসস্থানের অনুর্ব্বরতাও সামাজিকতার একটি অন্তরায়। উত্তর মহাসাগরের তটবাসী এস্কিমো জাতি; আমেরিকার ডিগার ইণ্ডিয়ান, ও জুয়াঙ্গ প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় বন্যজাতিদিগের মধ্যে সামাজিকতার অভাবের ইহা একটী প্রধান কারণ। ফুয়েজি দেশে ( Terra Del Fuego ) কোন স্থানে কুড়ি পঁচিশ জনের অধিক লোকের আহার্য্য ক্বচিৎ মিলে। তরঙ্গান্বিত সমুদ্রপার্শ্বে আণ্ডামান দ্বীপে প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র নাই—অদূরেই দুর্ভেদ্য শ্বাপদপূর্ণ অরণ্যানী—মৃগয়া হেতু আবাসস্থল পরিত্যাগ করিয়া সে বনে প্রবেশ করিতে অধিবাসীদিগের সাহস হয় না ;—অথচ অনেকের আহার্য্য মৃগ সে অপ্রশস্ত বেলাভূমিতে মিলে না। অগত্যা প্রতিবেশী সংখ্যা নূ্যন হইয়া পড়ে। মরুভূমে ভ্রমণ করিয়া বুশমানদিগকে উদর পূর্ণ করিতে হয়,—সুতরাং একত্রে অনেকে ভ্রমণ করিলে সকলেরই মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। অগত্যা দুভাগ্যদিগকে আপনাপন পরিবার সঙ্গে বিভিন্ন পথে সেই বালুকাময় প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে হয়।

নিকৃষ্টতম জীবের যোনি বিভিন্নতা নাই। দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন নূতন জীবমূর্ত্তি ধারণ করে। ইহারা স্বতন্ত্রভাবে বিচরণ করে, আবার কখন কখন সকলে একত্র হইয়া একটী জীবের মত হয়। নিকৃষ্ট মানবসমাজও এইরূপ। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিবার বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল স্বাধীনভাবে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভ্রমণ করে, কেহ অন্যের অপেক্ষা করে না, আবার কখন কখন অনেকে একত্র হইয়া একটী বৃহত্তর দল হয়। কিছুকাল একত্র থাকিয়া আবশ্যক কার্য্য সাধন হইলে বা কারণান্তর ঘটিলে আবার স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন মুখে চলিয়া যায়। অতি বন্য অবস্থায় প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ; তাহা অপেক্ষা একটু উন্নত অবস্থায় সকলে আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও কোথায় কোথায়ও পরস্পরের সহিত কিয়ৎপরিমাণে একতা রক্ষা করিতে পারে। আত্মরক্ষার জন্য শত্রুর উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য পশুপক্ষীও কখন কখন দলবদ্ধ হয়। বন্য মনুষ্যেরাও সেই কারণে প্রথমে দলবদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় দলবদ্ধ থাকিবার সময়েও তাহাদিগের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ প্রখর থাকে, এবং সে দলবন্ধন অচিরস্থায়ী হয়। কিন্তু বারম্বার এইরূপ দলবদ্ধ হইতে হইতে দল বাঁধিবার উপকারিতা প্রতীত হয়, তখন দলবন্ধন অপেক্ষাকৃত অধিক দিন স্থায়ী হইয়া পড়ে। যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে অপেক্ষাকৃত বলবান, বয়স্ক বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বতঃই দলের সর্দ্দার হইয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় সর্দ্দারের কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব থাকে না। ক্রমে যুদ্ধবিগ্রহে যথেচ্ছাচার ব্যবহারের অনিষ্টতা, ও একজনের আদেশমত সকলে মিলিয়া বিভিন্ন

প্রকারে একটী সাধারণ কার্য্য করিবার উপকারিতা যত প্রতীত হয়, ততই সর্দ্দার বা প্রধানের আবশ্যকতা স্বীকৃত হয়, স্বেচ্ছাচারের ন্যূনতা হয়। সর্দ্দারের নিকট যুদ্ধ বিগ্রহের সময় অধীনতা স্বীকার করিতে করিতে সকল অবস্থাতেই একজন সর্দ্দার স্বীকার করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। এমনি সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিলেও সকল দলে একজন সাধারণ প্রভু স্বীকার করে।

উত্তর আমেরিকরা কোমাঞ্চি জাতি নানা দলে বিভক্ত। এই সকল দলই একজনকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু প্রভুর গুণানুসারে প্রভুভক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে যত বলবান, সে তত ভক্তি আদায় করিতে পারে। দাকোটা ইরোকোয়া প্রভৃতি জাতি সকল এইরূপে কেহ চল্লিশ, কেহ পঞ্চাশ, কেহ ততোধিক দলে বিখ্যাত। প্রভুর ক্ষমতা থাকিলে এই সকল বিভিন্ন দলের যথেচ্ছাচার ও স্বাতন্ত্র্য কিয়ৎপরিমাণে ন্যূন করিয়া একটি দলের মত বদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সহিত সকল বন্ধন ছিন্ন হয়,—বিকেন্দ্র হইয়া তখন বিভিন্ন দল পূর্ব্বের মত বিভিন্ন পথে স্বতন্ত্র ভাবে ধাবমান হয়। দাহোমি, আসান্টি, মাদাগাস্কার, পালনেসিয়া, মিসর, গ্রীশ, জার্ম্মানি প্রভৃতি নানা জনপদে এই ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। যাহা হউক বারম্বার এইরূপ একত্র হইতে নানা দল মিলিত হইয়া অবশেষে একটী দল হইয়া পড়ে। তখন বিভিন্ন জাতি একত্র হইয়া এক জাতি করিবার উদ্যম আরম্ভ হয়। বারম্বার জয় পরাজয়ের পর তাহাই ঘটিয়া পড়ে। এইরূপে ক্রমশঃই সামাজিক আয়তন বৃদ্ধি হইতে থাকে।

জীবদেহে যেমন আয়তন বৃদ্ধির সহিত আকৃতিরও ক্রমবিকাশ হয়, এক একটী করিয়া নূতন নূতন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা দিতে থাকে, মানবসমাজেও সেইরূপ আয়তন বৃদ্ধির সহিত নূতন নূতন অঙ্গ দেখা দেয়। মানবসমাজে সর্দ্দার সৃষ্টি হইবার কথা আমরা এইমাত্র উল্লেখ করিলাম। প্রথমাবস্থায় যুদ্ধবিগ্রহ, মৃগয়া প্রভৃতি বাহিরের সকল কার্য্য পুরুষে করিয়া থাকে, হীনতর ও অধিক পরিশ্রমের কার্য্য সকল স্ত্রীলোকেরা সম্পন্ন করে। কিন্তু যুদ্ধহেতু সমাজবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাসের শ্রেণী গঠিত হইতে থাকে। যুদ্ধে যাহারা হত হয়, শত্রুরা তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা যুদ্ধে যোগ দেয় না, বিজয়ী শত্রু তাহাদিগকে বন্দী করিয়া গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করে—তাহাদিগের সাহায্যে গৃহকর্ত্তা ও গৃহমেধিনী উভয়ের পরিশ্রম লাঘব হয়; সুতরাং দাস দাসীর সংখ্যা

বৃদ্ধি করিতে স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মে। যদি আহার্য্যের অসচ্ছলতা না থাকিত, তবে অসভ্য সমাজে কৃতদাসের সংখ্যা থাকিত না। বন্য সমাজে পুরুষমাত্রেই যুদ্ধ করে, সুতরাং পুরুষবন্দীদিগকে আহার করিয়া স্ত্রীলোকদিগকেই দাসী করা হয়। ক্রমে নরমাংস ভক্ষণ রীতির হ্রাস হইলে পুরুষদিগকেও বন্দী করিয়া দাসত্বে নিযুক্ত করা হয়। এইরূপে সমাজ মধ্যে একটী শ্রমজীবীশ্রেণী ক্রমে গঠিত হয়। চিনুক জাতির মধ্যে যে সকল কার্য্য আয়াসসাধ্য দাসেরাই তাহা করিয়া থাকে। বেলুচস্থানে কৃষিকার্য্য দাসেরা সম্পন্ন করে, গোল্ডকোষ্টেও এই প্রথা। ফেলাটা-দিগের মধ্যে দাসেরা গৃহ নির্ম্মাণ করে, ধাতুদ্রব্য, বস্ত্র ও জুতা প্রস্তুত করে এবং ব্যবসা বাণিজ্য করে; দাসীরা সুতা কাটে ও রন্ধন করে এবং অবসর কালে পথে পথে জল বিক্রয় করিয়া প্রভুর জন্য অর্থ সঞ্চয় করে।

বিভিন্ন দল বা বিভিন্ন জাতি যত দিন স্বতন্ত্র থাকে, স্থানের সঙ্কীর্ণতা, সংখ্যার অল্পতা প্রভৃতি নানা কারণে কার্য্যবিভাগ তাহাদের মধ্যে অল্পই ঘটিয়া থাকে। যখন এক একটী পরিবার স্বতন্ত্র ভ্রমণ করিত, তখন জীবনরক্ষার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, পরিবার মধ্যে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইত। যখন কয়েকটী পরিবার একত্র হইয়া একটী দল হইয়াছিল, তখন পূর্ব্বের ন্যায় সকল প্রকার কার্য্য এক জনকে করিতে না হইলেও অনেকগুলি কার্য্য তাহাকে করিতে হইত। এইরূপে যখন নানা দল একত্র হইয়া একটী জাতি গঠিত হয়, তখন কার্য্যবিভাগ আরো অধিক হইয়া পড়ে। বাসস্থান, কার্য্যকুশলতা প্রভৃতি নানা কারণে কার্য্য বিভাগ সহজ হইয়া আইসে। যাহারা দেশ মধ্যে বাস করে, মৎস্যের জন্য আর তাহা-দিগকে সমুদ্রতটে আসিতে হয় না। সমুদ্রতটবাসীরা মৎস্য ধরিয়া তাহাদিগকে অংশ দেয়। দেশ-মধ্যবাসীরা মৃগয়ালব্ধমাংসের অংশ তটবাসীদিগকে প্রতিদান করে। ফলমূল যাহাদিগের সুলভ, তাহারা ফলমূলের অংশ দিয়া মৎস্য মাংস লাভ করে। অষ্ট্রেলিয়েরা অদ্যাপি দলবদ্ধ হইতে শিখে নাই, তথাপি তাহা-দিগের মধ্যে এক প্রকার বিনিময় প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং যে সকল জাতি একপ্রভুতা কিয়ৎ পরিমাণে শিক্ষা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিস্তৃত বিনিময় প্রথা সহজেই আশা করা যাইতে পারে।

ফিজিদ্বীপপুঞ্জের কোথায়ও থালী কোথায়ও করগু, কোথায়ও বর্ণক কোথায় বা অস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। এক একটী দ্বীপ এক এক দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। সানোয়া দ্বীপে অভ্যন্তরীণ পল্লী সকলে জাল প্রস্তুত হয়, কারণ জাল প্রস্তুত করিবার উপাদান সেখানেই জন্মিয়া থাকে। লোয়াঙ্গো দেশে সমুদ্র-তটে মৎস্য-

জীবী ও লবণকারেরা বাস করে। আসাণ্টিদেশে সমুদ্র তটে কুম্ভকারদিগের নিবাস ;—যে যে কার্য্য করে, যেখানে সেই কার্য্য চালাইবার সুবিধা, সে সেই-খানেই বাস করিয়া থাকে : অথবা যে যেখানে বাস করে, সেখানে যে কার্য্যের সুবিধা, সে সেই কার্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে। আদিমবাসীদিগের পক্ষে দ্বিতীয় কারণ বলবত্তর, ঔপনিবেশিকেরা প্রথম কারণ মত কার্য্য করিয়া থাকে। প্রাচীন মেক্সিকো দেশে যেখানে লবণ ও যবক্ষার প্রস্তুত করিবার সুবিধা ছিল, সেই সেই স্থলের লোকেরা লবণ ও যবক্ষারের ব্যবসায় করিত। এইরূপ যেখানে জল মৃত্তিকার সুবিধা ছিল, সেখানে কুম্ভকার, প্রস্তরপ্রধান দেশে ভাস্কর, কুসুমপ্রধান স্থানে মালাকার ও মৎস্যপ্রধান দেশে মৎস্যজীবীদিগকে দেখা যাইত। প্রাচীন পেরুদেশে ঘৃতকুমারীর পত্রে জুতা প্রস্তুত হইত, এজন্য যে সকল স্থানে ঘৃতকুমারী প্রচুর পরিমাণে জন্মিত, সেই স্থানে জুতাকারেরা জীবিকা-অর্জ্জন করিত। সভ্যতম দেশ সকলে গতায়াতের নানাবিধ উপায় সত্ত্বেও যেখানে অঙ্গারের আকর আছে, তাহারই নিকট নানা প্রকার বাষ্পযন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়—সমুদ্র-তটেই জাহাজ নির্ম্মাণার্থ পোতাশ্রয় সকল স্থাপিত হইয়া থাকে—এবং যেখানে অঙ্গার ও লৌহ যথেষ্ট, সেই স্থানেই বিপুল পরিমাণে আয়স দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এই জন্যই বার্মিংহাম ও সেফিল্ড, ম্যাঞ্চেষ্টার ও ষ্টুরব্রিজ, কেহ বা কার্পাস বস্ত্র, কেহ বা লৌহসামগ্রীর জন্য সমৃদ্ধ, সৌভাগ্যশালী ও ভুবনবিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। যখন সমস্ত বঙ্গদেশের ইতিবৃত্ত তিমিরাচ্ছন্ন, তখনও ঢাকা ও শান্তিপুর কৌশেয় বস্ত্র হেতু যুরোপীয় সমাজে গৌরবান্বিত। চিন্তা কর কেন এমন হইয়াছিল—দেখিবে যে জন্য ম্যাঞ্চেষ্টারের আজ এত গৌরব, সেই প্রাকৃতিক কারণেই উহারাও সৌভাগ্যশালী হইয়াছিল।

সমাজে একতা যত বৃদ্ধি হয়, কার্য্য বিভাগ তত অধিক হয়, কার্য্য বিভাগ যত অধিক হয়, পরস্পর সাপেক্ষতার তত আধিক্য হয়। সভ্য সমাজে কার্য্য বিভাগ এত অধিক যে, একখানি বস্ত্র প্রস্তুত করিতে অন্যূন একশত বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মকারের সাহায্য আবশ্যক হয়। অতি বন্য সমাজে যে পুরোহিত সেই দৈবজ্ঞ, সেই যাদুকর, সেই ওঝা, সেই চিকিৎসক। অপেক্ষাকৃত উন্নততর সমাজে বিভিন্ন লোকে এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে এবং তাহাদের সকলের পদমর্য্যাদা সমান নহে। টানা দেশে বৃষ্টি আনিবার জন্য স্বতন্ত্র পুরো-হিত আছে, ফিজি দ্বীপের দৈবজ্ঞেরা পুরোহিত নহে, সাণ্ডুইচ দ্বীপে পুরোহিত ও দৈবজ্ঞ স্বতন্ত্র ব্যক্তি, নবজিলাণ্ডে পুরোহিত ও যাদুকর স্বতন্ত্র। কাফিরদিগের

মধ্যে দুই প্রকার চিকিৎসক আছে। এক দল দৈব সাহায্যের উপর নির্ভর করে, অপর শ্রেণী দ্রব্যগুণে রোগ আরাম করিয়া থাকে। প্রাচীন মেকসিকো দেশে চিকিৎসক ও পুরোহিতের কোন সংস্রব ছিল না এবং পুরোহিতেরা আবার যাজ্ঞিক, গায়ক, গাথাকার, দৈবজ্ঞ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এইরূপে এক এক জনের কার্য্য সমাজ উন্নতির সহিত নানা জনের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে; এক এক দল এক এক প্রকার কার্য্য করে, আবার তাহাদিগের অধীনে নানা দল গঠিত হয়। কার্য্যের কুশলতার জন্য প্রথমাবস্থায় প্রত্যেকে আপন আপন পরিবারের সাহায্য লয়, সুতরাং এক প্রকারের কার্য্য কর্ম্মকারের পরিবারেরা যেমন করিতে পারে, তাহারা তাহার রহস্য যত অবগত থাকে, অন্যের সেরূপ হইবার উপায় থাকে না। এইরূপে এক এক প্রকার কার্য্য এক এক পরিবারে বদ্ধ হইয়া পড়ে। বংশানুক্রমে সেই পরিবারের সকলে সেই কার্য্য শিক্ষা করে, অন্যকে শিখায় না বা অন্যেরা শিখিতে চাহে না। এইরূপে কার্য্যবিশেষ বংশগত হওয়াতে ক্রমে এক এক প্রকার কার্য্য করিবার জন্য এক একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী গঠিত হয়। ইহাই সামাজিক জাতিভেদের মূল কারণ।

অতি দীন অবস্থায় যখন নির্দ্দিষ্ট একটী আশ্রয় কুটীরও থাকে না, তখন স্বদেশ বা স্বগৃহ রক্ষার জন্য কেহ যুদ্ধ করিতে চাহে না। তথাপি উৎকৃষ্টতর ভোজ্যসুলভ বিচরণভূমি, স্ত্রী পুত্র বা অস্ত্রাদি রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট বিবাদ অসভ্যদিগকে করিতে হয়। যখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে আহার্য্য সংগ্রহ ও শত্রু-দমন উভয় প্রকার কার্য্যই করিতে হইত, তখন কোন কার্য্যটিই সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইত না। ক্রমে গৃহ-সম্পত্তির যত আধিক্য হয়, দলবদ্ধ হওয়াতে শত্রু দমন অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও বিগ্রহ, বিসম্বাদের ন্যূনতা হয় না। এই সময় সামাজিক অন্যান্য বিষয়ে কার্য্যবিভাগের ন্যায় দেশরক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ক্ষত্রিয় শ্রেণী গঠিত হইতে থাকে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে কার্য্য বিভাগ যত শীঘ্র সম্পাদিত হয়—ক্ষত্রিয় শ্রেণীর স্বতন্ত্রতা সম্পূর্ণ হইতে তদপেক্ষা অনেক অধিক সময় লাগে। অদ্যাপি সভ্যতম জনপদ বিশেষেও স্বতন্ত্র ক্ষত্রিয় শ্রেণী দেখা যায় না। কি গৌরবস্পৃহা, কি সন্দিগ্ধচিত্ততা, কি আত্মসমর্থনপ্রিয়তা, দেহ, সম্পত্তি ও পরিবার রক্ষা বিষয়ে অন্যের সাপেক্ষ হইতে ইহারা ও ইহাদিগের ন্যায় অন্য সহস্র কারণ বিষম বিসম্বাদী।

এইরূপে দেবার্চ্চনা করিবার জন্য, রাজ্যপালন করিবার জন্য, দেশরক্ষা

করিবার জন্য, পরস্পরের উপকার জন্য ক্রমে মানব সমাজ বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায়, মনুষ্যের প্রথমাবস্থার স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তাব বিস্তর লাঘব হয়। কেহই আপনার জন্য কিছুই করে না, সকলেই অন্যের জন্য খাটিয়া থাকে—সুতরাং কাহারই কোন ক্ষতি হয় না; এবং এই অবস্থায় সমাজের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ কোন কারণে কিছুমাত্র পীড়িত হইলে সমস্ত সমাজ জর্জ্জরিত হইয়া উঠে। প্রত্যেকের কার্য্য এমনি নির্দ্দিষ্ট, এমনি স্বতন্ত্র, এমনি অন্যের অপরিজ্ঞাত হইয়া পড়ে যে এক জনের অভাবে আর এক জন তাহার স্থান অধিকার করিয়া ক্ষতি পূরণ করিতে পারে না। দেহ শৈশবাবস্থায় যখন কোমল থাকে, তখন হস্তের কার্য্য পদ দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে, কিন্তু দেহ যখন পরিস্ফুট হয়, তখন সাধ্যকি এক অঙ্গ অন্যের অভাব পূর্ণ কবিবে? যদি কোন অভূতপূর্ব্ব কারণে আজ তন্তুবায় শ্রেণী এক দিনে আমাদিগের সমাজ হইতে অন্তর্হিত হয়, সমাজে এমন কোন্ শ্রেণী আছে যে, বস্ত্রাভাব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? সুতরাং কি কাংস্যকার, কি মৎস্যজীবী সকলেরই স্বার্থ হইয়া পড়ে,—তন্তুবায় প্রভৃতি সমাজের কেহ যেন, কোন কারণে, কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

রোমান ইতিহাসে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। রোম দেশে এক সময়ে সাধারণতন্ত্র প্রণালী প্রচলিত ছিল অর্থাৎ রাজা, সর্দ্দার বা ডিক্টেটর বলিয়া কেহ ছিল না—সকলে মিলিয়া কার্য্য চালাইয়া লইত। কেবল বিপদ আপদের সময় কাহাকেও ডিক্টেটর রূপে বরণ করা হইত; তিনি সে কার্য্য উদ্ধার করিয়া দিলে আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। ডিক্টেটর পদে যাঁহার আজ্ঞায় শত শত লোকের ধনপ্রাণ নষ্ট হইতে পারিত, সময়ান্তরে তাঁহাকে সাধারণ প্রজা হইতে বিশেষ করিবার কোন উপায় থাকিত না। সিন্‌সিনেটস্ এইরূপে কয়েকবার ডিক্টেটর হইয়াছিলেন। একবারের কথা এইরূপে লেখা আছে—সহসা শত্রুগণ রোম অবরুদ্ধ করিল, সাধারণ উপায়ে তাহাদিগের নিকট অব্যাহতি পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং একজন ডিক্টেটর নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হইল। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে সিন্‌সিনেটস্ সেই একাধিপতি পদে বৃত হইলেন। তখন দূত সিন্‌সিনেটসের অন্বেষণে যাইয়া দেখে তিনি হলমুষ্টি ধরিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছেন। রোম বিপন্না,—সুতরাং ক্ষেত্র পানে সস্পৃহ দৃষ্টি করিতে করিতে সিন্‌সিনেটস্ রোমমুখে ধাবমান হইলেন।

রোম যাহা করিত, আদৌ সকল সমাজ তাহাই করিয়া থাকে। যুদ্ধ সভ্য সমাজের ঘৃণিত। যুদ্ধ সভ্যতার দারুণ প্রতিবাদী। অথচ যুদ্ধই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শত্রু পীড়িত হইলে ছত্রভঙ্গ স্বতন্ত্র পরিবার বা দল সকল একত্র হইয়া একজনের অধীনতাক্রমে শত্রুর সম্মুখে অগ্রসর হয়। বিপদ কালে সময় সময়ে এইরূপ প্রভু নির্ব্বাচন হইতে ক্রমে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়ান্তরে যুদ্ধ হেতু সমাজ এত উপকার লাভ করিয়াছে। এই কথাটি আর একটু বিশদ রূপে বলিবার আবশ্যক হইতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার ফুয়েজি, বন্য ইণ্ডিয়ান, সিংহলের বনব্যাধ ও দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যানদিগের মধ্যে কোন সর্দ্দার দেখা যায় না। এস্কিমোগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন। কেহ অন্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহে না, কেহ অন্যের অধীনতা স্বীকার করে না। পূর্ব্বোক্ত জাতির ন্যায় ইহারাও সর্দ্দার কাহাকে বলে জানে না। চিপেবাদিগের মধ্যে কোন সর্দ্দার নাই। ভারতবর্ষীয় আবোরগণ বলে, তাহারা ব্যাঘ্রপ্রকৃত—দুই জনে এক গহ্বরে বাস করিতে পারে না। মলাক্কাস-বাসী মনুষ্যগণ একটু কথান্তর হইলেই পরস্পরের সঙ্গ পরিত্যাগ করে। অপেক্ষা-কৃত উন্নত বিভিন্ন পাপুয়ান জাতির মধ্যেও কোন সর্দ্দার দেখা যায় না—তাহারা অতি শান্তপ্রকৃতি, পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ্যে বাস করে। নীলগিরিবাসী তোডা ও বাঙ্গালার প্রান্তবাসী লেপ্চা, বোদো ও ধীমল জাতীও অতি নিরীহ,—বিবাদ বিসম্বাদ জানে না। ইহাদের মধ্যে কোন সর্দ্দার নাই। কারিব জাতি শান্তি সময়ে কাহারও অধীনতা স্বীকার করে না, কিন্তু শত্রুসম্মুখে অনেকে মিলিয়া দল বাঁধিয়া একজন সর্দ্দারের অধীনতা স্বীকার করে। ইহারা বলে যুদ্ধে যেমন সাহস চাই, তেমনি সর্দ্দারও চাই। বিপদ ভিন্ন অন্য সময়ে ক্রীক-দিগকে অধীনতা স্বীকার করান দুষ্কর। যুদ্ধের সময়ে ত্যাসমেনিয়া বাসীগণ একজন সর্দ্দার মনোনিত করিয়া লয়। যুদ্ধ সমাপনান্তে তাহার কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না। প্রতিবেশীদিগের ন্যায় তাহাকেও তখন অতি দীনভাবে দিনপাত করিতে হয়। কামাস্কাটকা, সামোয়া, পাটাগোনিয়া, উত্তর আমেরিকা, মিসর, পালষ্টিন, গ্রীস, রোম, জার্ম্মানি সর্ব্বত্র এই ভাবে রাজ্যতন্ত্র প্রথা উৎপন্ন হইয়াছে। অসভ্যদেশের ন্যায় সভ্য জনপদ সকলেও যুদ্ধবিগ্রহ সময়ে রাজার প্রতাপ অধিক হয়, শান্তি সময়ে হ্রাস হইয়া পড়ে। রাজাতন্ত্র বা সর্দ্দার নিয়োগ-প্রথা হইতে সমাজের ভিত্তি দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। ক্রমে সমাজ যত পরিপক্ব হইতে থাকে, শান্তি যুদ্ধের স্থান অধিকার করে, রাজপদের সার্থকতা ন্যূন হয়। যখন শান্তি ও সভ্যতা একার্থ হইবে, তখন সর্দ্দার বা রাজার আবশ্যক থাকিবে না। যুনাই-টেড ষ্টেট্সের অধিবাসীরা শান্তিপ্রিয়, সেখানে রাজা নাই। ইংলণ্ডের রাজার

ক্ষমতা অতি অল্প। জার্ম্মানি ও রুসিয়া অতি কলহপ্রিয়—তত্রত্য রাজগণের ক্ষমতা অদ্বিতীয়। গ্রীকভাষায় রাজা শব্দের অর্থ অত্যাচারী। কার্গিজেরা সর্দ্দারকে "মানাপ" নামে অভিহিত করে। "মানাপ" শব্দের অর্থ নিষ্ঠুর যথেচ্ছাচারী ক্ষমতাপ্রিয় লোক। আফ্রিকাবাসী নরমাংসভুক নিয়া-নিয়াম জাতির সর্দ্দার প্রজাগণের ধনপ্রাণের একাধিপতি। আশান্টি ও দাহোমি দেশের রাজকর্ম্মচারীরা রাজার গোলাম। প্রভু যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিতে হইবে—ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিবার সাধ্য নাই। ফিজিবাসিগণ অতি কলহপ্রিয়, সেখানে সর্দ্দারের ক্ষমতা এত অধিক যে, প্রজাগণ মনে করে রাজার ভোজনার্থ তাহাদের দেহের মাংস কাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এবং দেবার্চ্চনা জন্য রাজা নরবলি দেওয়া আবশ্যক মনে করিলে, প্রজাগণ আপন আপন প্রাণ দিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করে।

সমাজের উন্নতির সহিত অন্যান্য কার্য্যে যেমন ক্রমে শ্রম বিভাগ স্থাপিত হয়, রাজকার্য্যেও সেইরূপ। বেটজুয়ান জাতির রাজা দোষীর উপর যে দণ্ডবিধান করেন, স্বহস্তে সে দণ্ড প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যদি কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, রাজা স্বয়ং জল্লাদের কার্য্য করিয়া থাকেন। মাঙ্গাপিঙ্গ জাতির রাজ দরবারে বা রাজ সমক্ষে কখন কোথায়ও জনতা হেতু গোলমাল হইলে, রাজা স্বহস্তে বেত্রাঘাত করিয়া জনতা ভঙ্গ করেন। বাকাসিন জাতির রাজা যে কোন আদেশ করেন, রাজার সহোদর তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকেন। এইরূপে অল্পে অল্পে এক এক প্রকার রাজকার্য্য সমাধানহেতু প্রথমে পরিবার, তাহার পর আত্মীয় স্বজন, শেষে গুণবান দেখিলেই এক এক জনের উপর ন্যস্ত হয়। ক্রমে অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় রাজকার্য্যেও এত শ্রমবিভাগ হইয়া পড়ে যে, অতি গুরুতর কার্য্য ভিন্ন আর সকল কার্য্যই কর্ম্মচারী দ্বারা নির্ব্বাহ হয়।

রাজকার্য্যের ন্যায় দেবার্চ্চনা প্রভৃতি সকল প্রকার কার্য্যেই এইরূপে ক্রমে শ্রমবিভাগ স্থাপিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক বিষয় বিশেষরূপে বলিবার আবশ্যক নাই।

---

# ষষ্ঠ পল্লব।

স্ত্রী পাইবার জন্য বিবাদ জীব জন্তুসকলের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বন্য সমাজে বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া বিবাহ করিবার রীতি। মনোমত নারীকে বিবাহ করিবার জন্য চিপেবাজাতি প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। অন্যের স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ জন্মিলে টুস্কিরা তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্ত্রীটীকে কাড়িয়া আনে। বুশমানদের মধ্যে বলবানেরা দুর্ব্বলের স্ত্রী কাড়িয়া লয়। সিংহীর স্বামী পরাস্ত হইলে, সিংহী আপনি বিজেতার গহ্বরে যায় শুনিয়াছি। অস্ট্রেলিয়ার অসভ্য-দিগের কোন দল যুদ্ধে পরাভূত হইলে, নারীগণ বিজেতাদিগের নিকট আপনারাই উপস্থিত হয়। সামোয়ানেরা শত্রুর অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় তাহাদের স্ত্রীদিগকে ভাগ করিয়া লয়। কারিবেরা নরমাংসভুক্। কিন্তু স্ত্রীলোকের মাংস ইহাদের মতে অখাদ্য। যুদ্ধে বালিকা বন্দী পাইলে ইহারা পশুর ন্যায় তাহাদিগকে পুষিয়া রাখে। অস্ট্রেলিয়ায় কাহারও বিবাহ করিতে হইলে সে গোপনে গোপনে ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন স্ত্রীলোককে একাকিনী পাইলে লাঠির এক আঘাতে তাহাকে অজ্ঞান করিয়া চুলে ধরিয়া টানিয়া নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে লইয়া যায়। ক্রমে সে সংজ্ঞালাভ করিলে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনে। অভাগিনীর সর্ব্বত্র সমান সুখ। সুতরাং সে অকারণ অধিক প্রহার সহ্য করিতে চায় না। সিডনীর লোকেরাও এইরূপে বিবাহ করে। যখন হাতে ধরিয়া প্রহারে সংজ্ঞাহীন অভাগিনীকে টানিয়া লইয়া যায়, পথে কাঁটা বা পাথর পড়িয়া থাকিলেও ভ্রূক্ষেপ করে না। একটা নিরাপদ স্থানে পৌঁছিতে পারিলেই হইল। অভাগিনীর আত্মীয় স্বজন পরে জানিতে পারিলে, তাহারা আক্রমণকারীকে কোন তাড়না করে না; কেবল তাহার পরিবারের কাহাকে সেইরূপে কাড়িয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। বালি দ্বীপের লোকেরাও কাহাকে একাকিনী পাইলে ঐরূপে চুরি করিয়া লয়, আত্মীয় স্বজনকে কিছু পণ দিলে আর কোন গোলযোগ হয় না।

যে সকল জাতি অপেক্ষাকৃত সভ্য হইতেছে, দুর্ব্বল বা শান্ত, তাহাদের মধ্যে এখন কাড়িয়া লইয়া বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও, বিবাহ করি-বার সময় তাহাদিগকেও কাড়িয়া লইবার অনুকরণ করিতে হয়। উড়িষ্যার খোন্দ জাতি বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে পৃষ্ঠে লইয়া পলাইবার সময়ে শ্বশুরপক্ষীয় স্ত্রীলোকেরা চীৎকার করিয়া প্রহার করিতে থাকে। বরপক্ষীয়েরা বরের পক্ষে লড়াই করে। কোন

জাতির বিবাহ স্থির হইলে বর বিবাহ করিতে আসিবার সময়ে উভয় পক্ষের স্ত্রী পুরুষে কিছুক্ষণ আপোষে লড়াই হয়। তাহার পর সকলে একত্র আহারাদি করে। বাদাগা, হোস, ওরাঁও, গোন্দ প্রভৃতি জাতির মধ্যেও কন্যাকে কাড়িয়া লইবার ভাণ করে। গারোদিগের মধ্যে বরকন্যার মত হইলে তাহারা বনমধ্যে কয়েক দিন নির্জ্জনে বাস করিয়া গ্রাম মধ্যে ফিরিয়া আইসে, তখন বিবাহের কথা সকলকে বলা হয়। তাহার পর একটা লড়াই করিয়া বিবাহ কার্য্য সমাপ্ত হয়। মলয় উপদ্বীপে বিবাহআসরে সকলে একত্র হইলে কন্যা ছুটিয়া পলায়, বর যদি তাহাকে ধরিতে পারে, তবেই তাহাদের বিবাহ হয়। কামকদের মধ্যে বর নির্দ্ধারিত পণ দিবার পর কন্যা লইয়া কাড়াকাড়ি হয়। কন্যা ঘোড়ায় চড়িয়া ছুটিয়া পলায়, বর তাহাকে ধরিবার জন্য দৌড়িতে থাকে; যদি ধরিতে পারে, তবে কন্যাকে স্ত্রীরূপে আপন গৃহে লইয়া যায়। যদি কন্যার তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা না থাকে, বর কোনরূপেই তাহাকে ধরিতে পারে না। তুঙ্গুসি ও কামস্কাটকার অধিবাসীদিগের মধ্যে বর বলপূর্ব্বক কন্যাকে দখল করিতে না পারিলে বিবাহের কোন কথাই হয় না। বাড়ীর বাহিরে কোথাও একাকিনী পাইয়া কন্যাকে আক্রমণ করিতে হয়, নতুবা তাহার আত্মীয়েরা অপমান মনে করিয়া লড়াই করিতে আসে। সামোয়ার অধিবাসীদিগের মধ্যে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। মোগলদের বর বিবাহ করিতে উপস্থিত হইলে কন্যা কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়া লুকাইয়া থাকে। কন্যাকর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, যদি পার খুঁজিয়া লইয়া যাও। তখন বর চতুর্দ্দিকে খুঁজিতে থাকে। ধরিতে পারিলে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়। সাইবেরিয়ার সর্ব্বত্র বলপূর্ব্বক বিবাহ করিবার রীতি। স্মিথ দ্বীপে এস্কিমোদিগের মধ্যে অনেক পূর্ব্ব হইতে কাহার সঙ্গে কাহার বিবাহ হইবে স্থির করিয়া রাখে। তথাপি বর আসিলে কন্যা তাহার সহিত চীৎকার করিয়া ঝগড়া বিবাদ করিতে থাকে। অনেক আঁচড় কামড়ের পর, একবার বরের বাটীতে লইয়া উপস্থিত করিতে পারিলে সে হাসিমুখে গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। গ্রীনলাণ্ডে বিবাহ করিতে হইলে কন্যার পিতামাতার সম্মতি লইয়া বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে হয়। আমেজান নদবাহে অসভ্যদিগের মধ্যে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লওয়া ভিন্ন বিবাহের আর কোন অনুষ্ঠান করিতে হয় না। দক্ষিণ আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা পিতামাতার সম্মতি লইয়া সহসা আক্রমণ করিয়া কন্যাকে লইয়া বনে পলায়। সেখানে কয়েক দিন বাস করিয়া স্বামীস্ত্রী রূপে ফিরিয়া আইসে। টেরাডেলফিউগো দেশে কোন

যুবক মাছ কি পাখী ধরিয়া পরিবার প্রতিপালনে সমর্থ হইলে, সে একখানি ডোঙ্গা প্রস্তুত করে বা চুরি করে এবং সুবিধা বুঝিলে কন্যাকে লইয়া পলায়। কন্যার মত না থাকিলে সে বনের মধ্যে এমনি পলায় যে, বর কোনরূপে খুঁজিয়া পায় না। নবজিলাণ্ডেও কাড়িয়া লইবার প্রথা। কন্যার মত না থাকিলে কখন কখন উভয়ে প্রাণান্ত যুদ্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু একবার গৃহে লইয়া যাইতে পারিলে তাহার স্ত্রী হইতে রমণীর আর কোন আপত্তি হয় না।

ফিলিপাইন দ্বীপের আহট জাতীয়দিগের মধ্যে এবং নর্ঘাগিনিতে বিবাহের দিন স্র্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বর যদি কন্যাকে ধরিয়া আনিতে পারে, তবেই তাহাদের মধ্যে বিবাহ হয়। কাফিরদিগের মধ্যে পণ দিয়া স্ত্রী ক্রয় করিবার প্রথা; তথাপি পণ দিবার পরে, বর ও কন্যা পক্ষে লড়াই হয়। বরপক্ষ পরাস্ত হইলে সময়ান্তরে কন্যাকে কোথাও একাকিনী দেখিলে বর তাহাকে চুরি করিয়া লয়। পশ্চিম আফ্রিকায় ধন দিয়া কন্যা পক্ষের মনস্তুষ্টি করিতে হয়। তথাপি কন্যাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া লইয়া যাইবার সময় তাহারা তাহাকে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে। পশ্চিম আফ্রিকার মাণ্ডিঙ্গো জাতির মধ্যে প্রথমে কন্যার মায়ের মত লইতে হয়; তাহার পর সে যখন রাঁধিতে বসে, তিন চারিটী বন্ধুর সঙ্গে বর আসিয়া কন্যাকে লইয়া পলায়। কন্যা আঁচড়াইতে কামড়াইতে পা ছুড়িতে ও চেঁচাইতে থাকে; পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অন্য স্ত্রীলোকেরা হাসে আর দেখে। আচড় কামড়ের মাত্রা বেশী না হইলে নির্লজ্জা বলিয়া কন্যার নিন্দা হয়। উত্তর আফ্রিকায় কন্যা স্বামীর গৃহের দ্বারে আসিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে নামিতে চাহে না, অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া তাহাকে ভুলাইতে হয়। সাইনে পর্ব্বতের আরাবদিগের বিবাহের পত্র হইলে পথে চলিবার সময়, দুই চারিটী বন্ধুর সাহায্যে কন্যাকে বলপূর্ব্বক লইয়া পলাইতে হয়—সে ইট ছুড়িয়া ও অন্যান্য প্রকারে আত্মরক্ষা করে। কখন কখন বরপক্ষ গুরুতর আঘাত পায়। সারকেশিয়ায় কন্যা ও বর পক্ষীয়েরা যখন আহার করিতে বসে, বর তরবারি আঘাতে কন্যার গুণ্ঠন কাটিয়া বন্ধুদিগের সাহায্যে তাহাকে লইয়া পলায়। পূর্ব্বে স্পার্টা নগরে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথা মত হেলেনাকে বিবাহ করাতে পারিসের কোন নিন্দা হয় নাই। পোলাণ্ড, লিথুনিয়া, রুসিয়া এবং প্রুশিয়ার কোন কোন অংশে কন্যাকে কাড়িয়া লইবার পর, পিতা মাতার অনুমতি লইবার প্রথা প্রচলিত। ওয়েলস্ দেশে বর বিবাহ করিতে উপস্থিত হইলে কন্যাকে লইয়া তাহার আত্মীয় স্বজনেরা পলাইত। ছুটাছুটি করিয়া ক্লান্ত হইলে বর কন্যাকে ধরিতে

পারিত। তখন আমোদ করিয়া বিবাহ সমাধা হইত। ভারতবর্ষে হিন্দুবরকে বিবাহ সময়ে অদ্যাপি কিছু কিছু প্রহার সহ্য করিতে হয়। কানাডা, চীন, আবিসিনিয়া ও প্রাচীন রোম দেশে, কন্যাকে বলপূর্ব্বক দ্বার পার করিতে পারিলে বিবাহ হইত। আমাদের দেশে দ্বারষষ্ঠীর, বোধ হয়, এইরূপে জন্ম হইয়াছে। স্ত্রী লইয়া দেশে যাইবার সময় ইংলণ্ডে কন্যাপক্ষীয়েরা বরকে চটী জুতা ফেলিয়া মারে। বিবাহ পরেই হিন্দুদিগের স্ত্রী লইয়া যাইবার প্রথা এবং সাহেবদের "সুখচন্দ্র" বোধ হয় এইরূপে উদ্ভূত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি, শ্বশুরপক্ষীয়ের নাম গ্রহণ অসভ্য সমাজে নিষিদ্ধ। বোধ হয় বিবাহজনিত বিবাদ হেতু।

বন্যদিগের মধ্যে সচরাচর দাম্পত্য প্রেমের লেশমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন কোন অসভ্যভাষায় ভালবাসা, প্রেম বা প্রণয়সূচক কোন শব্দই নাই। হটেণ্টট জাতির স্ত্রী পুরুষের ব্যবহারে প্রণয়রাগ কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। কুশাকাফিরদিগের বিবাহে প্রণয়ের কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। টিনে ইণ্ডিয়ান ও আলগঙ্কিন জাতির ভাষায় "প্রণয়" শব্দ নাই। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা প্রণয় কাহাকে বলে জানে না। আহাহুয়েলিনদের মধ্যে একটী দম্পতী দেখা গিয়াছিল। তিন বৎসর বিবাহ পরেও কেহ কাহারও ভাষা বুঝিতে পারিত না। অসা বা চিককিজাতির ভাষায় আদিরসের একটী কবিতা বা গান নাই। বুসার রাজা রাজকর্ম্ম সারিয়া নিজেই গৃহকার্য্য দেখেন এবং পরিধেয় প্রস্তুত করিয়া লন। রাণীর সঙ্গে তিনি পৃথক। গোলডকোষ্টে স্বামীস্ত্রীর কিছু মাত্র ভালবাসা দেখা যায় না। মাণ্ডিঙ্গোদের বিবাহ দাসী ক্রয় করা মাত্র। স্বামী স্ত্রীকে কখন পরিহাস করে না। তাহারা বলে স্ত্রীর সহিত তামাসা করিলে সে আর কথা শুনিবে না, হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় জাতিরা বিবাহকে এক প্রকার পাশব সংযোগ মনে করে। বিবাহ করিলে রাঁধা ভাত খাইবার সুবিধা হয়। সামোয়াবাসীদিগের মধ্যেও দাম্পত্য প্রেম কিছুমাত্র দেখা যায় না। পারাগোয়ের গাইকুরুজাতির মধ্যে বিবাহবন্ধন এত শিথিল যে, কোন কারণে মনান্তর হইলে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়। গুয়ারাণী জাতির মধ্যেও এইরূপ। স্ত্রীসুলভ লজ্জাশীলতা উহাদের মধ্যে কিছুমাত্র নাই। অষ্ট্রেলিয়ায় দাসী পাইবার জন্য অসভ্যেরা বিবাহ করে। ইহারা বলে কাঠ, জল ও আহার সঞ্চয়ের জন্য এবং কোথায় যাইবার সময় বোঝা বহিবার জন্য স্ত্রীর প্রয়োজন। ইহারা অতি সামান্য কারণে স্ত্রীকে পশুবৎ প্রহার করিয়া থাকে। অধিকতর

সুন্দর হইলে অভাগিনীর ভাগ্যে অধিকতর যন্ত্রনালাভ হয়। বাঙ্গালীদিগকে বিবাহ করিতে যাইবার সময় প্রথা মত 'কোথায় যাও' মা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয়, "তোমার দাসী আনিতে যাইতেছি।"

অসভ্যদিগের বিবাহে কোন প্রকার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষের কুড়ুম্ব ও বাদাগা জাতির মধ্যে বিবাহ শব্দই নাই। দশজনকে জানাইয়া কাহাকে গ্রহণ করিলেই বিবাহ করা হয়। কালিফর্ণিয়ার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে বিবাহ শব্দই নাই—ইচ্ছা হইলেই ইহারা পশু পক্ষীর মত যোট বাঁধে। কুচিন ইণ্ডিয়ানদের কি জন্মে, কি বিবাহে, কোন অনুষ্ঠান নাই। রেডস্কিন্ জাতির মধ্যে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সম্মতি হইলেই যথেষ্ট—পুরোহিত ডাকিতে হয় না—কাহাকে সাক্ষী মানিতে হয় না। অরবাক প্রভৃতি ব্রাজিলবাসী অসভ্যদিগের মধ্যে এবং অস্ট্রেলিয়ার অনেক স্থানে বিবাহে অনুষ্ঠান নাই। আবিসিনিয়া দেশে পরস্পরের সম্মতি হইলে আর কাহারও সম্মতির আবশ্যক হয় না। আবার কোন পক্ষের অমত হইলেই বন্ধন ছিন্ন হয়; ইচ্ছা হইলে আবার পুনর্ব্বন্ধন হইতে পারে—একবার পরিত্যক্ত বলিয়া, অন্য স্বামী আছে, কি তাহার ঔরসের পুত্র আছে বলিয়া, কোন বাধা হয় না। সিকিমের একটি রাণী একে একে সাতটি স্বামী গ্রহণ করিয়াছিল—শেষে মনোমত না হওয়ায়, স্বামীত্ব চ্যুত করিয়া পারিষদ কর্ম্মে সাত জনকে নিযুক্ত করিয়াছিল। উগাণ্ডাদেশে বিবাহ প্রথাই নাই। বেডুইন আরাবদের মধ্যে কুমারী-বিবাহে কিছু অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু বিধবা-বিবাহে অনুষ্ঠানের কোন আবশ্যক নাই। আশান্টি ও মাণ্ডিঙ্গোজাতির কোন অনুষ্ঠান করিয়া বিবাহ হয় না। কঙ্গো এবং আঙ্গোলায় বিবাহ করিতে জ্ঞাতি বন্ধুর অনুমতি লইতে হয় না বা কোন অনুষ্ঠান করিতে হয় না। চিপেবা, এস্কিমো, আলুট ও সিংহলের ব্যাধদিগের মধ্যে কোন অনুষ্ঠান নাই।

কোন কোন জাতির মধ্যে আবার এক এক প্রকার অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। টাহিটিদ্বীপে বিবাহ সময়ে ত্বকচ্ছেদ ও উল্কি পরিতে হয়। বনাবিদ্বীপে কন্যার গায় শ্বশুর বংশের (বংশ চিহ্নের) মস্তকের দাগ দেয়। চুটিয়া নাগপুরের মুণ্ডারিদিগের বিবাহ সময় কন্যা মাথায় জলের কলসী লইয়া এক হস্তে হল ধরিয়া মাঠ চসিতে থাকে। বর পশ্চাৎদিক হইতে হাতের ফাঁক দিয়া একটী তীর ছোড়ে। যেখানে তীর পড়ে, কন্যা সেই অবধি গিয়া পায়ে করিয়া তীর হাতে তুলিয়া বিনীতভাবে স্বামীকে দেয়। বীরহোর প্রভৃতি কতকগুলি জাতির মধ্যে বিবাহ সময় বরকন্যার রক্ত লইয়া পরস্পরের গায় দেয়। সিন্দুর ব্যবহার বোধ হয়

এইরূপে রক্ত মাখান প্রথার সভ্যতাসম্মত সঙ্কেত মাত্র। হিন্দুদিগের কোন কোন জাতির মধ্যে বিবাহ সময় প্রথমে কোন দেবতা বা বৃক্ষের সহিত বিবাহ হয়। কুর্ম্মিদিগের বরের সহিত আম্র এবং কন্যার সহিত মালতী বৃক্ষের প্রথম বিবাহ হয়। কানেডার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সর্দ্দার যদি বলে "বিবাহ হইয়াছে" তাহা হইলে কন্যাকে পিঠে তুলিয়া বর আপন কুটীরে যায়। আবিসিনিয়াতেও বর কন্যাকে স্কন্ধে লইয়া যায়; তবে বাড়ী অধিক দূর হইলে স্ত্রীকে স্কন্ধে লইয়া কয়েক বার শ্বশুর বাড়ী প্রদক্ষিণ করে। কোন কোন জাতির মধ্যে আগুন জ্বালিয়া তাহার পার্শ্বে বসিলেই বিবাহ হয়। তোডাদের মধ্যে বরের সংসারে কোন কর্ম্ম করিয়া দিলেই বিবাহ হয়, নবগিনিতে কন্যা বরকে পান তামাক দেয়। নবজ জাতিরা একটা পাত্রে কিছু রাখিয়া দুই জনে খায়। প্রাচীন রোমানদের মধ্যে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া বর কন্যায় একত্র খাইত। আমাদের "বউভাতের" বোধ হয় এইরূপ কারণ। ইংরাজদের বিবাহ পরে 'ব্রাইড-কেক' খাইতে হয়। নূতন বউ পিঠা করিয়া দেয়, আর সকলে খায়। ইরিকো জাতির মধ্যে বউ পিঠা তৈয়ার করিলে, স্বামীস্ত্রী একত্র খায়। ফিজি ও সামো-য়ানদের মধ্যেও এই রীতি। ত্রিপুরায় কন্যা সরবৎ প্রস্তুত করিয়া স্বামার কোলে বসিয়া আপনি অর্দ্ধেক খায়, অর্দ্ধেক স্বামীকে দেয়। তাহার পর আঙ্গুল মোড়ামুড়ি করে। ভারতবর্ষের সকল অসভ্য জাতির মধ্যে এক প্রকার 'বউ-ভাত' প্রচলিত আছে। মাদাগাস্কারে বরকন্যা এক পাত্রে আহার করে।

বিবাহ করিতে যেমন বেশী আড়ম্বরের আবশ্যক হয় না, বিবাহ ভাঙ্গিতেও সেইরূপ। চিপেবা জাতির মধ্যে স্ত্রীকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলেই বিবাহ ভঙ্গ হয়। পেরিকু জাতি যত ইচ্ছা বিবাহ করে, স্ত্রীদিগকে ক্রীত দাসীর মত খাটায়—কাহারও উপর চটিলে তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। টুপিরা স্ত্রীকে বিলাইয়া দিতে পারিলে যত ইচ্ছা বিবাহ করে। বারম্বার হাত ফেরত না করিয়া একটী স্ত্রী লইয়া মানুষে কেমন করিয়া বাঁচে, ট্যাসমেনিয়ার লোকেরা বুঝিতে পারে না। খসিয়া জাতি এতবার স্ত্রী পরিবর্ত্তন করে যে, তাহাকে বিবাহ বলা যায় না। নবজিলাণ্ডে স্ত্রীকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেই বিবাহভঙ্গ হয়। টাহিটী দ্বীপে কোন পক্ষের ইচ্ছা হইলেই বিবাহ বন্ধন কাটিয়া যায়। মেক্সিকোর প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যে এবং খসিয়াজাতির স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কখন কখন স্বামীকে তাড়াইয়া দিয়া বিবাহ ভঙ্গ করিবার প্রথা আছে।

বিবাহের পবিত্রতা বা সতীত্বের আদর যে অসভ্য সমাজে নাই, বিশেষ

করিয়া আর বলিবার আবশ্যক নাই। স্ত্রী দাসীমাত্র—সম্পত্তি বিশেষ—উপভোগ্যা—অধিক আর কিছুই নহে। হাসানিয়া আরাবদের মধ্যে স্বামীর গৃহে তিন দিন বাস করিতে হয়, কিন্তু চতুর্থ দিবসে স্ত্রী যথেচ্ছ ব্যবহার করিলে অন্যায় করা হয় না। সিংহলে প্রথমে পনর দিনের জন্য বিবাহ হয়; তাহার পর ভাবগতিক বুঝিয়া বিবাহ চিরস্থায়ী করা হয়, বা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। দক্ষিণাপথের রেড্ডি-জাতির মধ্যে বয়স্থা কুমারীর সহিত পাঁচ ছয় বৎসরের বালকের বিবাহ দিবার রীতি। তখন সে নিজ পিতৃপক্ষ ভিন্ন অন্য যে কাহারও সহিত সহবাস করিতে পারে। মাতুল, মাতৃপক্ষীয় ভ্রাতা, শ্বশুর বা সেই পক্ষীয় কাহার ঔরসে সন্তান হইলে সেই শিশু, শিশুস্বামীর সন্তান বলিয়া গণ্য হয়। হডসন উপসাগরের তটবর্ত্তী ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে কোন দুর্ব্বল লোকের স্ত্রীর উপর বলবান লোকের দৃষ্টি পড়িলে তাহাকে স্ত্রী ছাড়িয়া দিতে হয়। গ্রীনলাণ্ডের এস্কিমোদের মধ্যে বন্ধুকে স্ত্রী ছাড়িয়া দেওয়া মহানুভবতার লক্ষণ। প্রাচীন রোমান ও পার্থিয়ান-দের মধ্যে কাহারও গর্ভে দুই তিনটী সন্তান হইলে পত্যন্তর গ্রহণের জন্য স্ত্রীকে অনুমতি দিতে হইত। কমানার লোকেরা যত ইচ্ছা বিবাহ করে। এবং তাহাদের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, অতিথি আসিলে তাহাকে উপহার দিয়া অতিথির অভ্যর্থনা করে। স্ত্রী বা কন্যা দিয়া অতিথি সেবা করা, এস্কিমো, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ইণ্ডিয়ান এবং পালিনেশিয়ার অধিবাসিদিগের মধ্যে এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রো, আরাব, আবিসিনিয়ান, কাফির মোগল ও টুর্কি জাতির মধ্যে দেখা যায়। স্বামীর অনুমতি পাইলে বুসমান রমণীরা যথা ইচ্ছা যাইতে ও যে কাহারও সহিত সহবাস করিতে পারে। বেঙ্গুয়েলায় বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার বেশ্যাবৃত্তিদ্বারা পিতা অর্থ সঞ্চয় করে। মেক্সিকোদেশে কন্যা বয়স্থা হইলে পিতার আদেশমতে বেশ্যাবৃত্তিদ্বারা বিবাহের ব্যয় সংগ্রহ করিত। ডেরি-য়ান্ যোজকের প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যেও আত্মবিক্রয় করা নিন্দনীয় ছিল না। বরং ভদ্রবংশীয়া রমণীরা এই প্রকারের অনুরোধ রক্ষা না করা নীচতা মনে করিত। আণ্ডামান দ্বীপেও এইরূপ ব্যবহার ভদ্রতার লক্ষণ। হাসানীয়া আরাবদের বিবাহ সপ্তাহের মধ্যে কেবল কয়েক দিনের জন্য হইলেও শ্বাশুড়ীরা জামাইকে পীড়াপীড়ি করিত, যেন কন্যাকে সপ্তাহ মধ্যে দুই দিনের অধিক সতীত্ব পালন করিতে বাধ্য করা না হয়। ইহাদিগের কাহারও স্ত্রীর প্রতি অন্যে আসক্ত হইলে, সে উহা গৌরবের বিষয় মনে করে। মধ্য-আমেরিকার প্রাচীন চীব্‌চা জাতি অক্ষত রমণীকে অভাগিনী মনে করিয়া বিবাহ করিতে

ইচ্ছা করে না। কলম্বিয়ার শুস্পপ জাতি বিনা লাভে স্ত্রী ছাড়িয়া দেওয়া কলঙ্কের কথা মনে করে। চীপেবা জাতি আপন গর্ভধারিণী, ভগিনী বা কন্যার সহিত কখন কখন সহবাস করিয়া থাকে। কাদীয়াক্ জাতির মধ্যেও এই প্রথা। ভগিনী বা কন্যা বিবাহ করা অদ্যাপি তেনাসরিমের ফিরাত জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। গন্জাব এবং গাবুন নামে আফ্রিকার দুইটী অন্তরীপের রাজপরিবারের রাজারা আপন কন্যাদিগকে এবং রাণীরা আপন পুত্রদিগকে বিবাহ করে। পান্‌চী জাতির মধ্যে ভাই ভগিনীর বিবাহ হয়। কালীদেশে ভগিনী ভাগিনেয়ী এবং ভ্রাতুষ্কন্যাকে বিবাহ করার রীতি আছে। নূতন স্পেনদেশে ভগিনী বিবাহ করিয়া থাকে। পেরুদেশের যুবরাজ জ্যেষ্ঠ সহোদরাকে বিবাহ করেন। সাইচু দ্বীপে রাজপরিবারে ভাই ভগিনীর বিবাহ হয়। মালাগাজীদের মধ্যে বৈমাত্রেয় ভাই ভগিনীর বিবাহ হয়। প্রাচীন মিসর ও স্কান্‌ডীনেভীয়া দেশে রাজারা সহোদরা ভগিনী বিবাহ করিত। হিব্রুদিগের মধ্যে এবং প্রাচীন পারস্য ও আসিরিয়া দেশে বৈমাত্রেয় ভগিনী বিবাহ হইত। সিংহলের ব্যাধ-দিগের মধ্যে পিতৃস্বসা বা জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিবাহ করা নিন্দনীয়; কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনী বিবাহ করিলে গৌরব হয়। কোনিয়াগ জাতির মধ্যে বিবাহের পরে অসতীত্ব নিন্দনীয়; কিন্তু পূর্ব্বে যথেচ্ছাচার করিলে দোষ হয় না। কুমানা ও পেরুদেশে এই রীতি। রোমদেশীয় বিখ্যাত কেটো আপন স্ত্রী একটী বন্ধুকে দিয়াছিলেন। সেই বন্ধুর মৃত্যু হইলে যেরিয়া আবার কেটোর গৃহে ফিরিয়া আসেন। আথেন্স্ নগরে বেশ্যাদিগকে সকলে সম্মান করিত। সক্রেটিসের ন্যায় নীতিজ্ঞগণও আস্পেসীয়া নাম্নী বারাঙ্গনার সহিত আলাপ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। প্লেটো বলিতেন, একটী স্ত্রীকে কেবল একজন পুরুষ অধিকার করিয়া রাখা অন্যায়। জাবা ও পশ্চিম আফ্রিকায় বেশ্যাগণ সাধারণের আদরের পাত্র। প্রাচীন বৈশালী নগরে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু নগরের প্রধান বেশ্যার পদ বড় উচ্চ ছিল। নগরের রাজা তাহাকে সম্মান করিত। স্বয়ং বুদ্ধদেব রাজনিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। মাহিরী বা দেবনর্ত্তকীদিগের অদ্যাপি ভারতবর্ষে কত সম্মান। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাইজী বলিয়া অনেকে বেশ্যাদিগকে সম্মান করে। নোদোবেসীদিগের মধ্যে একটী স্ত্রীলোককে দেশের সকল লোকে বড় সম্মান করিত; সে একদিন দেশীয় চল্লিশটী প্রধান যোদ্ধাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের সকলের সহিত সহবাস করিয়াছিল। ইহা তাহাদিগের দেশে প্রধান ব্রত বলিয়া গণ্য হয়। হেরো

রমণীগণ স্বজাতীয় যে কাহারও সঙ্গে সহবাস করে, কচিৎ অন্য জাতীয় লোকে উপগত হয়। মহুরাপ্রদেশে পিনি পাহাড়ে অসভ্য রমণীদিগের যথেচ্ছাচারে কোন বাধা নাই। নীলগিরি পাহাড়ে বিবাহ নাই, যখন যাহার সঙ্গে ইচ্ছা হয়, সহবাস করিতে কোন বাধা নাই। অযোধ্যার ভিহুর জাতির মধ্যে এবং আণ্ডামানেও এই রীতি। চীন ও গ্রীসদেশে প্রাচীনকালে, মেসাগিটি, ঔসিস, ইথোপিয়ান, গারামান্টি ও পেরুবিয় জাতির মধ্যে এই প্রথা দেখা যাইত এবং কালিফর্ণিয়া ও কুইন সার্লট দ্বীপে অদ্যাপি এই রীতি প্রচলিত আছে। বাবিলন, আর্মিনিয়া, সাইপ্রস, কার্থেজ ও লিডিয়াদেশে এইরূপ আচরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। বেলিয়ারিক দ্বীপে বিবাহ রাত্রে বধূ নিমন্ত্রিত মাত্রেরই স্ত্রী বলিয়া গণ্য হইত। নুকাহিবাতেও এইরূপ। বস্তুতঃ বন্য অবস্থায় সতীত্বের গৌরব কিছুমাত্র নাই। একদিকে পুরুষে যেমন অসংখ্য রমণীতে উপরত হইতে পারিত, রমণীগণের স্বাধীনতাও সেইরূপ ছিল। ক্রমে যথেচ্ছাচার জাতি মধ্য হইতে সঙ্কুচিত হইয়া কেবল পরিবার মধ্যে চলিতে থাকে। ভারতবর্ষীয় তাতয়ার জাতি ভাই, খুড়া, ভাগিনেয় সকলে এক সাধারণ স্ত্রী ভোগ করে; আরবীয় ফেলিকস দেশে পরিবারের সকলে মিলিয়া একটী স্ত্রী বিবাহ করিত। ক্রমে ইহাও কমিয়া যায়। সকল ভাই একটী রমণীকে ভোগ করিতে থাকে। তাহার পর জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হইলে তাহার বিধবাকে বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। সর্ব্বশেষে এক স্ত্রীর এককালে কেবল একটী স্বামী গ্রহণের নিয়ম হইয়াছে।

বহুবিবাহের বিস্তার পৃথিবীব্যাপী হইলেও বহুপতিত্বের বিস্তার সামান্য নহে। নীলগিরি পর্ব্বতের তোডাজাতির মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করে, কনিষ্ঠেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সেই রমণীতেই উপরত হয়। অপর পক্ষে রমণীর ভগিনীগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভগিনীর স্বামীদিগকে আপনাদের স্বামীরূপে গণ্য করে। তাতারবাসী কালমকেরা সকল ভাই মিলিয়া একটী বিবাহ করে। সিংহল ও তিব্বতদেশে বহুপতিত্ব অদ্যাপি প্রচলিত আছে। হিমালয়ের দক্ষিণাংশে কোন কোন ভারতবর্ষীয় জাতির মধ্যে বহুপতি প্রথা আছে। দফ্‌লা-জাতি দুই তিন জনে মিলিয়া একটি স্ত্রী বিবাহ করে। কাশ্মীর ও কুর্গদেশে, নায়র ও ফিলিজাতির মধ্যে, নবজিলাণ্ডে, প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপে, আলুট ও কসাকজাতির মধ্যে, প্রাচীন ব্রিটন ও পিক্‌টস্, মিডিয়ান ও গেটি-দিগের মধ্যে এবং কোন কোন অষ্ট্রেলিয়ান, হুকহিবন ও ইরিকোয়া জাতির মধ্যে এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। টাহিটানেরা স্ত্রীকে অন্য পতি গ্রহণ

করিতে দেয়। কারিব, খসিয়া, এস্কিমো ও বরণজাতির মধ্যে এবং কানেরি ও লান্‌সরতা দ্বীপেও এই রীতি। সিংহলের ভদ্র রমণীরা সচরাচর তিন চারিটি কখন কখন সাতটি পর্য্যন্ত স্বামী গ্রহণ করে। আমেরিকার অবরো ও ময়পুর জাতির মধ্যে এবং আসিয়ার লাডক, সির্মুর, কিনেয়ার ও কিস্তেয়ার দেশে এই রীতি। মোগল ও কাফিরদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠেরা তাহার স্ত্রীকে গ্রহণ করে। ইহাদিগের মধ্যেও এইরূপ। কনিষ্ঠের ঔরসে যে সকল সন্তান হয়, তাহারা জ্যেষ্ঠের সন্তান বলিয়া গণ্য হয়। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার এক পত্নী গ্রহণে ভারতবর্ষীয় আর্য্য-সমাজে যেমন প্রাচীনকালে বহুপতিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, অম্বা ও অম্বালিকার গর্ভে ভীষ্মকে সন্তানোৎ-পাদন করিবার অনুরোধে তেমনি এই দ্বিতীয় রীতির প্রচলনেরও প্রমাণ পাই। ভারতবর্ষে মাড় প্রভৃতি অনেক জাতির মধ্যে এবং উড়িষ্যা ও বিহার দেশের নিম্ন শ্রেণীতে সাগী প্রথা মতে জ্যেষ্ঠের বিধবাকে বিবাহ করিবার প্রথা অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

আদিম সমাজে সতীত্বের অভাব এবং বহুপতিত্বের প্রচলন হেতু কে কাহার পুত্র নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠে। এজন্য পিতার সম্পত্তি পুত্রকে উত্তরাধি-কারী-সূত্রে অধিকার করিতে কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। গিনিদেশে ভাগিনেয় উত্তরাধিকার করে। লোয়াঙ্গোদেশে রাজার মৃত্যু পরে, রাজার ভাগিনেয় রাজা হয়; রাজপুত্র কখন রাজত্ব পায় না। মধ্য-আফ্রিকায় ভাগিনেয় রাজত্ব পায়। দক্ষিণ আফ্রিকার বাঙ্গালা জাতির মধ্যে ভাগিনেয় পুত্রের ন্যায় বিবেচিত হয়। আবশ্যক হইলে তাহাকে বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ দেওয়া হয়। বনাই জাতি সর্দ্দারের মৃত্যু হইলে তাহার ভাগিনেয়কে সর্দ্দার করিয়া লয়। উত্তর আফ্রিকার বর্ব্বর জাতির এই রীতি; উত্তর পূর্ব্ব আফ্রিকায় ও কঙ্গো দেশে, মাদাগাস্কার, প্রাচীন আথেন্‌স, ইত্রুরিয়া ও জার্ম্মানদেশে এই নিয়ম। খ্রীষ্টের জন্মের পরে আট শত বৎসর মধ্যে পিকৃটদিগের মধ্যে পুত্রকে পিতার সিংহাসনে বসিতে দেখা যায় নাই। ভারতবর্ষে খসিয়া, কোঁচ ও নায়র জাতির ভাগিনেয় বিষয় পায়। ত্রিবাঙ্কুড়ের পোনার ও নাম্বুরি ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সকল জাতির মধ্যে এবং তুলব দেশের বন্তর জাতিরও এই প্রথা। নায়র পিতা আপন সন্তানকে চিনে না—নায়র পুত্র আপন পিতাকে চিনে না। দার্জিলিঙ্গের লিম্বো জাতির মধ্যে প্রসূতিকে মূল্য দিয়া পুত্র ক্রয় করিয়া পিতা আপন জাতিভুক্ত করিয়া থাকে। বালিকারা মার নিকট থাকে ও মাতৃকুল প্রাপ্ত হয়। সুমাত্রার অধি-

বাসী বাট্টা, মলয় প্রভৃতি অনেক জাতির মধ্যে ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী হয়। কুচিন এবং কিনেয়ার জাতিরও এই রীতি। হড্‌সন উপসাগরের ইণ্ডিয়ান-দিগের সন্তানেরা মার নাম প্রাপ্ত হয়। ইরোকি জাতির মধ্যে উত্তরাধিকার কন্যাগত—সন্তানেরা মার গোত্র প্রাপ্ত হয়। মিত্রপুঞ্জে মা সম্ভ্রান্তবংশীয়া না হইলে সন্তানেরা সম্ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হয় না। পলিনিসিয়াতেও পূর্ব্বে এইরূপ প্রথা ছিল, ইদানী পুত্রগত উত্তরাধিকারের আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চিম অষ্ট্রে-লিয়ার সন্তানেরা মার গোত্র প্রাপ্ত হয়। মা ভিন্ন বলিয়া প্রাচীন য়িহুদা শাস্ত্রে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সহিত কোন সম্বন্ধ গণ্য হইত না। সোলন বৈমাত্রেয় ভগি-নীকে বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু সহোদরা বিবাহের কোন বিধি করেন নাই। আমেরিকার ইণ্ডিয়ান্‌দের মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্র ভিন্নগোত্র, কিন্তু ভাগি-নেয় স্বগোত্র।

উত্তরাধিকার কন্যাগত হইলে পিতার অপেক্ষা মাতুলের সম্মান অধিক হয়। অসভ্য সমাজে আমরা মাতুলকে পিতা অপেক্ষা অধিক সম্মানিত দেখিতে পাই। হেটী ও মেকসিকো দেশে, চক্তা ও উত্তর আমেরিকার সমস্ত ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে স্বামী অপেক্ষা ভ্রাতাকে সংসারে অধিক কর্ত্তৃত্ব করিতে দেখিতে পাই। রেডস্কিন-দের মধ্যে এই রীতি। কুটুম্বদিগকে সম্বোধন করিতে যে সকল শব্দ বিভিন্ন অসভ্য জাতির ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে তুলনা করিয়া জানা গিয়াছে. মাতুলের শ্রেষ্ঠত্ব এক সময় সকল জাতির মধ্যে স্বীকৃত হয়; তখন পিতা কেহই নহে। বস্তুতঃ সমাজের প্রথমাবস্থায় কেবল এক গোত্রজ বলিয়া সম্বন্ধ মিলনের আরম্ভ হয়, কিন্তু গোত্র বহুবিস্তৃত হইলে সম্বন্ধ, বিবাহ বা জন্মের উপর নির্ভর করিয়া পরিবারগত হয়। এই দ্বিতীয় অবস্থায় মাতা ও মাতুল সন্তানদিগকে পালন করে, লোকে মাতুলের উত্তরাধিকারী হয় সুতরাং সে সময় সম্বন্ধ মাতৃগত। মা, মামা, মামাত ভাই সকলের শ্রেষ্ঠ;—তখন খুড়ী, মাসী, মার মত পিতা ও পিতৃব্যদিগের স্ত্রী। সুতরাং "খুড়ী-মা" "মাসী-মা" শব্দ প্রচলিত হয়। সমাজের তৃতীয়াবস্থায় পিতৃবংশের শ্রেষ্ঠত্ব। কেহ কেহ বলেন, এই অবস্থায় পিতা ও পিতৃবংশ, মাতা ও মাতৃবংশের স্থলীয় হওয়ায় পিতাকে আঁতুড় ঘর বাস করা, সন্তান পালন করা প্রভৃতি যে অদ্ভুত আচরণের দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে, সকল জাতির মধ্যে এক সময় তাহার প্রচলন ছিল। একথা কতদূর সত্য বলা যায় না। সমাজের চতুর্থাবস্থায় পিতৃ ও মাতৃকুলের সাম্য। সন্তানের সুবিধা, এই, সে দুই পক্ষ হইতে আদর ও স্নেহে প্রতিপালিত হয়, ইহাই সভ্য সমাজের

অবস্থা। বন্য অবস্থায় সন্তান প্রতিপালন করা বড় কঠিন। আমরা যে বয়সে গরুর দুগ্ধ খাওয়াইয়া সন্তান বাঁচাইয়া থাকি, গৃহপালিত পশুর অভাবে সে বয়সেও কেবল স্তনপান করাইয়া বন্যদিগকে সন্তান পালন করিতে হয়। এ জন্য সন্তান জন্মিবার পর, অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বামী-স্ত্রী পৃথক থাকিতে হয়। বহুপতিত্বের এইটী অন্তরায়। ফিজিয়ানদের মধ্যে একটী সন্তান জন্মিবার তিন চারি বৎসর মধ্যে আবার সন্তান হইলে বড় নিন্দা হয় এবং জ্ঞাতি বন্ধু সকলে মিলিয়া দোষীকে শাস্তি দেয়। এই কারণে বহুপতিত্ব অপেক্ষা অসভ্য সমাজে বহুবিবাহের অধিকতর প্রাদুর্ভাব। আসান্টিদিগের রাজাকে তিন হাজার তিন শত তেত্রিশটী বিবাহ করিতে হয়। ফিজিয়ান, অষ্ট্রেলিয়ান, ও টাস্‌মেনিয়ানদিগের মধ্যে বহুবিবাহ হয়। নবকালিডোনিয়া, টানা, ভেট, ইরোমাঙ্গা এবং লিফুদেশে এই রীতি। টাহিটী, সাণ্ডুইচ, টঙ্গা, নবজীলাণ্ড, সুমাত্রা, মাদাগাস্কার এবং মলয় পালিনেশিয়াতেও এই রীতি। উত্তরমহাসাগরের তীরবর্ত্তী এস্কিমো হইতে আরম্ভ করিয়া যোজক প্রান্তবাসী মোস্কিটোজাতি পর্য্যন্ত উত্তরআমেরিকার সর্ব্বত্র এবং কারিব হইতে পাটাগোনিয়া পর্য্যন্ত দক্ষিণ-আমেরিকার সকল জাতির মধ্যে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন মেক্সিকো, পেরু ও মধ্য আমেরিকায় ইহা প্রচলিত ছিল। দক্ষিণে হটেন্‌টট, দামারা ও কাফ্রি, পূর্ব্বে কঙ্গো, নিগ্রো দাহোমা, মধ্যে আসান্টী, উত্তরে ফুলা এবং আবিসিনিয়ান, আফ্রিকার সকল জাতির মধ্যে ইহা সাধারণ ব্যবহার। সিংহলবাসী, ভারতবর্ষের পাহাড়ী জাতি, ইয়াকুত, হিন্দু ও মুসলমান হইতে আরম্ভ করিয়া বহুবিবাহ পূর্ব্বদেশীয় প্রথা বলিয়া সর্ব্বত্র বিদিত। পূর্ব্বকালে য়ুরোপেও ইহার প্রভাব সামান্য ছিল না। বস্তুতঃ দারিদ্র্য প্রভৃতি কয়েকটী অন্তরায় না থাকিলে আরও বহুলরূপে আমরা ইহার প্রচলন দেখিতে পাইতাম। বুস্‌মানেরা বড় গরিব; এজন্য তাহাদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন নাই। গোন্দজাতির মধ্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও এই কারণে তাহাদের মধ্যে ক্বচিৎ ইহা দৃষ্ট হয়। সিংহলের ব্যাধেরা এত দরিদ্র যে, বহুস্ত্রীপালন করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। অষ্টিয়াকদিগের মধ্যেও এই কারণে ইহার প্রাদুর্ভাব অল্প। তবে যদি স্ত্রীলোকেরা আপনার আহার আপনি সংগ্রহ করিতে পারে, স্বামী দরিদ্র হইলেও তাহার বহুস্ত্রী বিবাহের বাধা থাকে না। অষ্ট্রেলিয় ও ফিজিয়ানদের মধ্যে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

ইন্দ্রিয়লালসা পরিতৃপ্তি, যশ ও গৌরব, ধন ও পুত্রলাভের জন্য বহুবিবাহ

অসভ্যদিগের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী হইতে পারিত, যদি একটী স্বাভাবিক অন্তরায় না থাকিত। পৃথিবীতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক নহে। সকলকে বহুবিবাহ করিতে হইলে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বহুগুণ অধিক হওয়া আবশ্যক। এই কারণেই বন্য সমাজেও যেখানে যেখানে কেহ কেহ বহুবিবাহ করে, অন্যে সেখানে একটী মাত্র বিবাহ করিতে বা অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হয়। কুশাজাতির সাধারণ লোকে একটি মাত্র বিবাহ করে, সর্দ্দারেরা বহুবিবাহ করিয়া থাকে। জাবাদ্বীপে কেবল সম্ভ্রান্ত লোকেরা বহুবিবাহ করে, সুমাত্রা দ্বীপেও এইরূপ। মেক্সিকোর প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যে সাধারণ লোকে একস্ত্রীক ছিল, কিন্তু রাজারা কখন কখন সাত আট শত স্ত্রী গ্রহণ করিত। হণ্ডুরাশ্ ও নিকারাগোয়াতেও কেবল প্রধান ব্যক্তিরা বহুবিবাহ করে। এজন্য আদিম সমাজে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও বহু ও এক বিবাহের যুগপৎ আবির্ভাব কার্য্যগতিকে ঘটিয়া থাকে। যথেচ্ছাচার ও বহু পতিত্ব প্রথার পরে এক ও বহুবিবাহ প্রথা মানব সমাজের বিবাহ সম্বন্ধীয় তৃতীয় অবস্থারূপে প্রতীত হয়।

আমরা দেখাইয়াছি, মূলে চুরি বা বলপূর্ব্বক স্ত্রী গ্রহণ করিবার প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। সুতরাং সাহসী ও সম্ভ্রান্ত লোক ভিন্ন অন্যের বহুবিবাহ সম্ভব হইত না। এজন্য কালক্রমে বহুবিবাহ সম্মানসূচক হইয়া উঠে। আপাচী জাতির মধ্যে যে ব্যক্তি বহুস্ত্রী পালন করিতে পারে, তাহার বিশেষ গৌরব ও সম্মান লাভ হয়। মেক্সিকো দেশে সাহস ও সম্ভ্রম দেখাইবার জন্য প্রধানেরা বহুবিবাহ করিত। মাদাগাস্কার দ্বীপে রাজা ভিন্ন অপর কেহ দ্বাদশ স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। পূর্ব্ব আফ্রিকায় সর্দ্দারেরা বারটীর অন্যূন এবং ঊর্দ্ধ সংখ্যায় তিন শত পর্য্যন্ত বিবাহ করে। ইহা তাহাদের বড় অহঙ্কারের বিষয়। আসাণ্টি দেশে মর্য্যাদা অনুসারে স্ত্রী সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। হিব্রুদিগের রাজারা এইরূপে আপনাদের মহত্ব দেখাইত। মুসলমান বাদসাহদিগের শত শত বেগম রাখিবার ইহাই কারণ। পুরাকালে জার্ম্মান দেশে কেবল সর্দ্দারেরা বহুবিবাহ করিত। মেরোভিন্জীয় রাজাদিগের বহু বিবাহ কেবল সম্মানার্থে হইত।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ করা অপেক্ষা দাসত্ব করিবার জন্য স্ত্রীর অধিক প্রয়োজন হইত। বস্তুতঃ আহার যোগাইতে পারিলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অনেক অসভ্য জাতি বহু পত্নী সংগ্রহ করিয়া থাকে। নবকালিডোনিয়াতে সর্দ্দারেরা দশ, কুড়ি, ত্রিশটী স্ত্রী পুষিয়া থাকে। তাহাদের

সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, চাষ আবাদ ও খাদ্য সঞ্চয়ের ততই সুবিধা হয়। আফ্রিকাতেও এই কারণে লোকে বহু বিবাহ করিয়া থাকে। মাণ্ডিঙ্গো জাতির স্ত্রীরা জল ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়া থাকে। তাহারাই মাঠে হাল চসে, বীজ বুনে ও শস্য কাটিয়া থাকে। কাফির স্ত্রীরা গৃহকার্য্য করে ও মাঠে গরু চরায়। স্ত্রী একা হইলে অসভ্য গৃহের দুস্কর কার্য্য সকল সমাধা করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। সপত্নী সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয়; এক এক জনের পরিশ্রমের তত অল্প প্রয়োজন হয়, এই জন্য কোন কোন অসভ্য দেশের রমণীরা বহু সপত্নী প্রার্থনা করে। লিভিংষ্টোন সাহেবের মুখে বিলাতী এক বিবাহ রীতির কথা শুনিয়া মকালোলো স্ত্রীলোকেরা বলিয়াছিল "এমন দেশে স্ত্রী লোকেরা কেমন করিয়া বাস করে। বিলাতী রমণীদিগের রুচি কি অদ্ভুত।" ইহাদের মধ্যে বহু বিবাহ স্বামীর গৌরবসূচক। জাম্বেসি নদের তীরবর্ত্তী সকল স্থানে এই ভাব। যুদ্ধ বিগ্রহ হেতু অসভ্য সমাজে মৃত্যু সংখ্যা অধিক এবং আচ্ছাদনের অভাব, আহারের অনিয়ম ও মাতৃগণের দাসত্ব প্রযুক্ত অযত্নে শিশু সন্তানেরা বিস্তর মরিয়া যায়; অথচ যুদ্ধ বিগ্রহের অবস্থায় জন সংখ্যার আতিশয্য প্রয়োজনীয়। লোক সংখ্যা অধিক করিবার জন্যও বহুবিবাহের প্রয়োজন হয়। এক পত্নীকতা হেতু জন সংখ্যার অভাবে কোন জাতি বহুপত্নীক জাতির সংখ্যাগুণে পরাস্ত হইয়া স্বাধীনতা হারাইতে পারে। যুদ্ধে পুরুষদিগের মৃত্যু হেতু অসভ্য সমাজে বিধবার সংখ্যা অধিক হয়। তাহারা কোন পুরুষের আশ্রয় না পাইলে আহার্য্য অভাবে মরিতে পারে। ইহাও বহু বিবাহের আর একটী কারণ। চিপেবা জাতি বলে, যদি ভ্রাতার বিধবাকে বিবাহ না করি সে ও তাহার সন্তানগণ আহার অভাবে মরিয়া যাইবে। মিসরে ভ্রাতৃজায়া বিবাহের এইরূপ কারণ প্রদর্শিত হয়।

একবিবাহ সভ্য সমাজের রীতি। চুরি করিয়া বা কাড়িয়া লইয়া প্রথম অবস্থায় বিবাহ হইত। কন্যা চুরি অপরাধে এক জাতির সহিত অন্য জাতির ঘোর যুদ্ধ হইত—চোরের দণ্ড হইত। শ্বশুর পক্ষের ক্রোধশান্তির জন্য জামাতা সচরাচর অর্থ দণ্ড দিত। ক্রমে অর্থদণ্ড উপহার স্বরূপে পরিণত হয়, তাহার পর অর্থ দিয়া কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। সেই উপহার বা মূল্যস্বরূপ অর্থ সভ্য সমাজে যৌতুক বা বৃত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে। যাহা-হউক, অর্থ দিয়া বহু বিবাহ করা সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। অগত্যা এক পত্নী গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে হয়। এক বিবাহ চলিত হইবার দ্বিতীয় কারণ—

সমাজে যুদ্ধবিগ্রহ কমিয়া যত শান্তি স্থাপিত হইতে থাকে, ক্রমে নর নারীর সংখ্যা সমান হয়। পূর্ব্বে নারীসংখ্যা অধিক থাকাতে বহুবিবাহে কাহারও বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিন্তু উভয় পক্ষের সংখ্যা সমান হইলে একজন বহুবিবাহ করিলে অন্যদিগকে অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য করা হয়। কেহ সেরূপ ক্ষতি সহ্য করিতে পারে না; সুতরাং স্বতঃই লোকে এক বিবাহের পক্ষপাতী হইয়া উঠে। দায়াকদিগের সর্দ্দারেরা কেহ বহুবিবাহ করিয়া থাকে; কিন্তু যে এরূপ দোষ করে, সে প্রজাদিগের বড় অপ্রিয় হয়। তৃতীয়তঃ যুদ্ধবিগ্রহের সময় নারী-সংখ্যা অধিক থাকাতে অধিক সংখ্যক সন্তানোৎপাদন করিতে বহুবিবাহ উপযোগী। কিন্তু শান্তিসময়ে বহুবিবাহ অপেক্ষা এক বিবাহে অধিক সন্তান হয়। এখন অতিরিক্ত নারীসংখ্যা না থাকাতে একজনে দশটী নারীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে অপর নয় জনকে অবিবাহিত থাকিতে হয়। একজনে দশটী স্ত্রীর গর্ভে যত সন্তান উৎপাদন করিতে পারে, দশ জনে দশটী স্ত্রীর গর্ভে তাহা অপেক্ষা অধিক পারে। সুতরাং শান্তি সময়ে সন্তান-সংখ্যা পূর্ণ রাখিবার জন্য এক বিবাহ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। চতুর্থতঃ বহুবিবাহ জাত বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বিবাদে সমাজে বিস্তর অশান্তি ও অকৌশল উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বদেশীয় রাজ্য সকলে গৃহবিবাদে কত কত রাজবংশ উৎসন্ন গিয়াছে—বহুবিবাহ তাহার মূল। এক বিবাহ শান্তি বর্দ্ধন করে—সম্পত্তি রক্ষা করে—সম্বন্ধ সুনিয়মে বদ্ধ করে। সুতরাং বহুবিবাহ পরিবর্ত্তে এক বিবাহ সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়। কোথায় কোথায় ভিন্ন ব্যবস্থা দেখা যাইলেও সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে, যুদ্ধপ্রিয় অসভ্য সমাজ বহুবিবাহপ্রিয়, শান্তিপ্রিয় সভ্য সমাজ একবিবাহের পক্ষপাতী।

স্বগোত্রে বা ভিন্ন গোত্রে কোন গোত্রে বিবাহ করিতে হইবে অতি আদিম সমাজে তাহার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ভিন্ন গোত্র হইতে কন্যা অপহরণ করিয়া বলপূর্ব্বক বিবাহ করিবার প্রথা প্রথম অবস্থায় দেখিতে পাই, তখন গৌরব ও সম্মানসূচক, সাহস ও ধনের পরিচায়ক বলিয়া ভিন্ন গোত্রে বিবাহ প্রথাই প্রথম বলিয়া বোধ হয়। আবার যখন উত্তরাধিকার কন্যাগত হওয়াতে এক গোত্রের অর্জ্জিত সম্পত্তি শত্রুগোত্রে যাইতে লাগিল তখনই স্বগোত্রে বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিধিবদ্ধ হইয়া থাকিবে। অপর গোত্র হইতে কন্যা চুরি করিবার জন্য দুই গোত্রে যুদ্ধ বাঁধিত—সুতরাং যুদ্ধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যও স্বগোত্র-বিবাহ আবশ্যক হইয়া উঠে। শান্তিপ্রিয় সমাজ স্বগোত্রে বিবাহ

করে। বর্ত্তমান অসভ্য সমাজের অর্দ্ধেক স্বগোত্রে এবং অর্দ্ধেক ভিন্ন গোত্রে বিবাহ করে। কিন্তু সার জন লবক বলেন স্বগোত্র অপেক্ষা ভিন্ন গোত্রে বিবাহ অধিক সংখ্যক জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন উভয়রীতিই এক সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। অষ্ট্রেলিয়ায় স্বগোত্রবিবাহ নিষিদ্ধ। পূর্ব্ব-আফ্রিকায় সোমল ও বকালারিজাতি স্বগোত্র-বিবাহ করিতে পারে না। মধ্য-আফ্রিকার পশ্চিমাংশে এক এক জাতি নানা শাখায় বিভক্ত। সন্তানেরা মায়ের শাখার মধ্যে গণ্য হয়—কেহ আপন মাতৃবংশে বিবাহ করিতে পারে না, অথচ পিতার বা ভ্রাতার স্ত্রীকে গ্রহণ করা, ইহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ নহে। হিন্দুরা স্বগোত্রে, স্বনামবিশিষ্ট বা সমরাশিতে জাত কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে না। খসিয়া, জুয়াঙ্গ এবং বারালি জাতির কেহ আপন শাখায় বিবাহ করিতে পারে না। মগদিগের মধ্যে এই রীতি। হোস, মুণ্ডা এবং ওরাঁও জাতি নানা শাখায় বিভক্ত—কেহ আপন শাখার বিবাহ করিতে পারে না। মণিপুরি, কুপুই, মৌ, মুরাঙ্গ এবং মুরিঙ্গ জাতির মধ্যে এই রীতি। খন্দজাতি স্বগোত্রে কন্যা বিবাহ দেওয়া নিন্দনীয় মনে করে। নেপালের পাহাড়ীরা নানা শাখা বা থুমে বিভক্ত—আপন থুমে বিবাহ নিষিদ্ধ। কালমক জাতি নানা দলে বিভক্ত। কেহ আপন দলে বিবাহ করিতে পারে না। সারকেসিয়ান ও সামোয়িডদের মধ্যে এই রীতি। স্বনামবিশিষ্টা বা স্বগোত্রের কন্যা বিবাহ করা অষ্টিয়াক জাতি পাপ বলিয়া মনে করে। সাইবিরিয়ার ইয়াকুত্‌দিগের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ হয় না। চীনদেশে সর্ব্বশুদ্ধ একশতটী বংশসংজ্ঞাপক উপাধি প্রচলিত আছে—কেহ আপন উপাধিবিশিষ্টা কন্যা বিবাহ করে না। উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার টীনে ইণ্ডিয়ানেরা ভিন্ন গোত্রের স্বনামযুক্ত কন্যা বিবাহ করিলে ভগিনী বিবাহ করিয়াছে বলিয়া উপহাসাস্পদ হয়। ঐ প্রদেশে কিনেরায় নামে আর এক জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যেও এই নিয়ম। বৃটিশ কলম্বিয়ার টিম্‌সিয়ান জাতি নানাগোত্রে বিভক্ত। এক এক গোত্রের বিভিন্ন সন্তক আছে। কাহার সন্তক বাঘ, কাহার সন্তক ভেক ইত্যাদি। বাঘ, বাঘের কন্যা বিবাহ করিতে পারে না, ভিন্ন গোত্রে বিবাহ করিতে হয়। সাঁওতালেরা মারাণ্ডী, মুর্মু, হেমরোম প্রভৃতি এগারটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মারাণ্ডী মারাণ্ডীর কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে না। অপর সম্প্রদায়ে বিবাহ করিতে হয়। রেড্‌স্কিন্‌ ও গায়েনাবাসী ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও এই রীতি। এইরূপে পশ্চিম ও পূর্ব্ব আফ্রিকা, সারকেসিয়া, হিন্দুস্থান, তাতার, সাইবিরিয়া, চীন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে ভিন্ন গোত্রে

বিবাহের রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে রোমদেশেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। শ্যামদেশের রাজা আপন ভগিনী বিবাহ করে বটে, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে যাহাদের মধ্যে সাত পুরুষের সংস্রব আছে, তাহাদের মধ্যে বিবাহ হয় না। সুমাত্রার বাট্টাজাতির মধ্যে কেহ স্বগোত্রে বিবাহ করিলে, জ্ঞাতিরা বরকন্যাকে কাটিয়া লবণ ও লঙ্কা দিয়া তাহাদের কাঁচা মাংস খায়। অনেক জাতির মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও দুই পুরুষ কি তিন পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা আছে। সামোয়া, বেরুয়া এবং লাপজাতির মধ্যে স্বগোত্র—বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ। আবিপোন জাতির অনেকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের মধ্যে স্বগোত্র বিবাহ প্রচলিত থাকি-লেও এই অসভ্যেরা প্রাণান্তে স্বগোত্রে বিবাহ করে না। পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা অনেক অসভ্যজাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন রোম ও বর্ত্তমান সারকেশিয়া দেশে এবং মুসলমানদিগের মধ্যে যে দুই বংশের মধ্যে পোষ্যপুত্রের আদানপ্রদান হয়, তাহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

ভিন্ন গোত্রে বিবাহ দিতে হইলে আপন গোত্রের সহিত কন্যা—গোত্রের সমকক্ষতা স্বীকার করা হয়। স্বগোত্র—বিবাহ প্রচলনের ইহা একটী কারণ। উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার আহটজাতি যুদ্ধে ভিন্নজাতীয় কন্যাদিগকে বন্দীকৃত করিয়া দাসত্বে নিযুক্ত করে, কদাপি তাহাদিগকে বিবাহ করে না। ভারতবর্ষীয় আবোর ও কোচজাতি কখনও ভিন্ন গোত্রে বিবাহ করে না। দক্ষিণ-ভারত-বর্ষের এরকলাজাতির মধ্যে মাতুলানী ও পিতৃস্বসার কন্যার সহিত বিবাহ হয়। ইহাদিগের ও ডঙ্গনাক জাতির মধ্যে স্বগোত্র-বিবাহ প্রচলিত। জাবার কালঙ্গ জাতির বিবাহ সময়ে বরকে কন্যা-গোত্রে আপন জন্ম প্রতিপন্ন করিতে হয়। মাঞ্চু-তাতারদের মধ্যে ভিন্ন সন্তকে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিরাত জাতি আপন কুটুম্ব মধ্যে বিবাহ দিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার আকোম্বিজাতি অন্য গোত্রে বিবাহ দেয় না। সাণ্ডুইচ ও নবজিলাণ্ড দ্বীপে স্বগোত্র-বিবাহ-রীতি প্রচলিত আছে। গুয়ামদেশে আপন ভগ্নীকে বিবাহ করিতে পারিলে বড় গৌরব হয়।

# সপ্তম পল্লব।

বনবাসে অসভ্যের প্রধান চিন্তা কিরূপে শত্রুসম্মুখে আত্মরক্ষা করা যায়, কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। প্রস্তর ব্যবহারকালীন অস্ত্র শস্ত্র সকলের আমরা দ্বিতীয় পল্লবে উল্লেখ করিয়াছি। বনবাসিগণ অধিকাংশ স্থলে অদ্যাপি ধাতু-নির্ম্মিত দ্রব্যাদির ব্যবহার শিক্ষা করে নাই; অদ্যাপি অস্থি, কাষ্ঠ বা প্রস্তর সাহায্যে তাহাদের অস্ত্র সকল নির্ম্মিত হয়। প্রস্তর—ব্যবহার যুগের সেই ধনুর্ব্বাণ, সেই বর্শা, সেই কুঠার, সেই মুদ্গর, সেই ঘর্ষণী, সেই করপত্র, অস্থি, কাষ্ঠ বা প্রস্তরনির্ম্মিত, বন্যসমাজে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে অধিকাংশ জাতি ধাতুর ব্যবহার জানিত না। য়ুরোপ, আসিয়া ও আফ্রিকায় অনেক পূর্ব্বে ধাতু-ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল। প্রস্তরের পর পিত্তল এবং পিত্তলের পর লৌহ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। লৌহ ব্যবহার আধুনিক ও সভ্যতার পরিচায়ক। বোধ হয়, আর্য্যজাতি আসিয়া মহাদেশে প্রথম ধাতুদ্রব্য ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিল এবং তাহারাই য়ুরোপে উহা প্রথম প্রচার করে।

হটেণ্টটেরা ধনু, বিষাগ্র বাণ, বর্শা, লাঠি ও কিরিচ ব্যবহার করে। এই সকল অস্ত্রহস্তে তাহারা হস্তী, গণ্ডার, সিংহ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জন্তুদিগকে আক্রমণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। বুশমানেরা কোন প্রকারের ধাতুদ্রব্যের ব্যবহার জানে না। ধনুর্ব্বাণ ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র। সিংহলের ব্যাধেরা কুঠার ও ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা দূর হইতে লক্ষ্য করিতে পারে না, অজ্ঞাতসারে নিকটে যাইয়া পশু পক্ষী বধ করে। বাণপ্রয়োগে আণ্ডামানবাসিগণ বড় সুদক্ষ। জাহাজভাঙ্গা লৌহ সংগ্রহ করিয়া, ইহারা এখন লৌহ দ্বারা তীরের ফলা প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। গদা, ছুরি, লাঠী ও কর্ত্তরি অষ্ট্রেলিয়দিগের কয়েকটী প্রধান অস্ত্র। এতদ্ভিন্ন বুমরাঙ্গ নামে আর এক প্রকার অস্ত্র ইহারা ব্যবহার করিয়া থাকে। ধনুরাকৃতি এই অস্ত্র এমন ভাবে গঠিত হয় যে, কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিলে তাহাকে আঘাত করিয়া আবার প্রয়োগকারীর নিকট উপস্থিত হয়। বর্শা, ফিঙ্গা, লাঠী ও ধনুর্ব্বাণ ফিজিবাসীরা ব্যবহার করে। ইহারা নারিকেল কাষ্ঠে দশ বার হাত লম্বা বর্শা প্রস্তুত করিয়া থাকে। বর্শার অগ্রভাগ

সুচল করিয়া ঈষৎ দগ্ধ করিয়া লইলে ফলা প্রস্তুত হয়। কখন কখন অস্থিখণ্ড বসাইয়া থাকে। ইহারাও ধাতু ব্যবহার জানে না। নবজিলাণ্ডবাসী মেওরি জাতি ধনুর্ব্বাণেরও ব্যবহার জানিত না, সম্প্রতি শিখিয়াছে। গদা ও বর্শা লইয়া ইহারা আত্মরক্ষা ও পশুহত্যা করিয়া থাকে। টাহিটীবাসীগণ ধাতু কাহাকে বলে জানিত না। শামুকের খোলা, পাথর, কাঠ ও হাড়ের অস্ত্র দ্বারা তাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। এখন ইহারা লৌহ ব্যবহার শিক্ষা করিতেছে। লাঠী বর্শা ও ফিঙ্গা ইহাদের প্রধান অস্ত্র। কেবল নরবলি দিবার সময় এক প্রকার কুঠার ব্যবহার করিয়া থাকে। উত্তর মহাসাগরের তটবর্ত্তী এস্কিমোগণ টেঁটা, বড়শি, ছুরি, বাটালি, কোদালি, রেঁদা, বাণ প্রভৃতি নানা প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে; কিন্তু ইহাদিগের কেহই ধাতু নির্ম্মিত নহে। ইহাদিগের অস্ত্র সকল দেখিলে আকার প্রকারে প্রাচীন প্রস্তর যুগের অস্ত্রাদি বলিয়া বোধ হইবে। পাটাগোনিয়াবাসী বন্যগণ ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছে। কি মৃগয়াকার্য্যে, কি যুদ্ধ করিতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া আঘাত করা ইহাদিগের একমাত্র উপায়। আইস্‌লাণ্ডের লোকেরা কাঠের বাঁট দিয়া পাথরের হাতুড়ি প্রস্তুত করে এবং মেক্সিকোর ইণ্ডিয়ানেরা পাথরের ছুরি দিয়া ফোঁড়া কাটে। তাস্‌মেনিয়ার লোকেরা পাথর চাচিয়া ছুরি প্রস্তুত করে এবং পাপুয়ানেরা পাথর দিয়া বর্শার ফলা করিয়া লয়। আলুটজাতি তিমি মাছের হাড়ে ঘর প্রস্তুত করে, কণ্ঠার হাড়ে দ্বার প্রস্তুত করে।

আণ্ডামানবাসিগণ গাছের ফল ও মধু খাইয়া এবং জঙ্গল হইতে শূকর ও সমুদ্র হইতে মৎস্য ও কচ্ছপ মারিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ব্রাজিলবাসী বন্যগণ কৃষিকার্য্য জানিলেও বনজাত ফলমূলে উদর পূর্ণ করে। ফল মূল, মধু, ডিম্ব, পিপীলিকা, পতঙ্গ, কীট, পশু, পক্ষী, সর্প গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বনমধ্যে অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়; সুতরাং জীবিকা হেতু অসভ্যদিগকে তাদৃশ কষ্ট পাইতে হয় না। অনুর্ব্বর দেশে বনবাসীর বড় কষ্ট। অস্ট্রেলিয়গণ তৃণশূন্য প্রান্তরে ঘুরিয়া যাহা পায়, তাহাই খায়। রকি পর্ব্বতবাসী ইণ্ডিয়ানদিগকে ক্ষুধার যন্ত্রণায় কোটর মধ্য হইতে সর্প, গিরিগিটী, টিকটিকি প্রভৃতি বাহির করিয়া ভক্ষণ করিতে দেখা গিয়াছে। ফুয়েজি জাতি সমুদ্রতটে ভ্রমণ করিয়া শম্বুক ও মৎস্য মাংসে জীবন রক্ষা করে।

ব্রাজিলবাসী বাটুকুদো জাতি চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা সাহায্যে পশু পক্ষীর অন্বেষণ করিয়া থাকে। ইহারা পশু পক্ষীর স্বরের সুন্দর অনুকরণ করিতে

পারে। সেই স্বরে কাতরভাবে চীৎকার করিলে সরলপ্রাণ বনজন্তুগণ অসন্দিগ্ধ-চিত্তে তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়; তখন বিষাগ্র বাণ সংযোগে তাহাদের প্রাণহত্যা ঘটিয়া থাকে। অস্ট্রেলিয়গণ পাখী ধরিবার জন্য এক টুকরা মাংস হাতে করিয়া মরার মত পড়িয়া থাকে, পাখী যেমন ছোঁ মারিয়া মাংস লইতে আসে, অমনি তাহাকে ধরিয়া ফেলে। মৌমাছি ধরিয়া তাহার গায় আঠা দিয়া একটা পালক লাগাইয়া ছাড়িয়া দেয়। মৌমাছিটী উড়িয়া যে দিকে যায়, তাহার অনুসরণ করিয়া মৌচাক বাহির করে। মাথায় জলজাত লতা জড়াইয়া ইহারা নীরবে সাঁতার দিতে দিতে, হংসকারণ্ডাদি পক্ষীদলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া পাখী ধরে। মিসর দেশেও এইরূপে পাখী শিকার করিতে দেখা যায়। দাগ্রিব ইণ্ডিয়ানেরা একটা হরিণের মাথা লইয়া, দুই জনে চারিটা পা হইয়া, লতা দিয়া, দেহ আবৃত করিয়া, হরিণরূপে হরিণযূথে প্রবেশ করিয়া, হরিণ শিকার করে। শুনা যায়, ব্যাঘ্রচর্ম্মে দেহ আবৃত করিয়া ব্যাধেরা সুন্দরবনে মৃগয়া করিয়া থাকে। বাজপাখী পুষিয়া পাখী শিকার করা বা কুকুর দ্বারা পশু শিকার করার কথা সকলেই অবগত আছেন। পশুদিগের গতায়াতপথে গর্ত্ত কাটিয়া লতাপাতায় আবৃত করিয়া, জাল বা ফাঁদ দ্বারা অথবা তীরকলে পশু পাখী বধ করাও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। জলে বিষ দিয়া মাছ মারিতে দক্ষিণ আমেরিকার অনেক জাতি অবগত আছে। টেঁটা, কোঁচ বা তীর মারিয়া, বাড় বাঁধিয়া, বঁড়শি দিয়া বা জাল ফেলিয়া মাছ ধরিবার প্রথা অনেক দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ধকার মধ্যে আলোক দেখিলে মাছেরা আলোকের নিকট আসে, তখন তাহাদিগকে বর্শা ফেলিয়া মারিতে সুবিধা হয়। নরওয়ে, সুইডেন, স্কটলাণ্ড, বঙ্কুবর দ্বীপ প্রভৃতি সভ্য অসভ্য নানা স্থানে এ রীতিও অবলম্বিত হয়। ভোঁদড় প্রভৃতি জন্তু এবং বাজ ও মাছরাঙ্গা পাখী দ্বারাও মাছ শিকার করা যায়। তাল প্রভৃতি বৃক্ষ বল্কলে কোন কোন দেশে জাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন কোন জাতি সাঁতার দিয়া মাছের অনুসরণ করিয়া মাছ ধরিতে পারে—চেনো ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি কোন কোন জাতি কুকুর দিয়া মাছ শিকার করিয়া থাকে। মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে করিতে মনুষ্য বন্যজন্তু পোষ মানাইতে আরম্ভ করে। পশুপালনের পর কৃষিকার্য্য। সচরাচর পশুপালনের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে কৃষি ব্যবসায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। হটেণ্টটেরা পশুপালন করে, কিন্তু ভূকর্ষণ করে না। গরু, মেষ ও কুকুর ইহাদিগের গৃহপালিত পশু। সভ্যজাতীয় রাখালেরা মাঠে গরু রক্ষা

করিবার জন্য কুকুর পুষিয়া থাকে, ইহারা গরু দ্বারা মেষ রক্ষণ-কার্য্য চালাইয়া লয়। যুদ্ধ কার্য্যেও আমাদের অশ্বের মত ইহাদের গরু কার্য্যকর হইয়া থাকে। বুশমানেরা পশুপালনও করে না, কৃষিকার্য্যও জানে না। বন্য ফলমূল ভক্ষণ ও মৃগয়াই ইহাদিগের জীবিকার প্রধান উপায়। সিংহলের ব্যাধেরা শিকার করিবার জন্য কুকুর ও মহিষ পুষিয়া থাকে। মহিষের অন্তরালে থাকিয়া ইহারা নিকটে গিয়া হরিণ শিকার করে। ইহারা কৃষিকার্য্য জানে না। আণ্ডামানের অধিবাসীরা কোন প্রকার পশু পালন করে না—কিন্তু কয়েক প্রকার পক্ষী পুষিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়া, তাসমেনিয়া ও ফিজিবাসিগণ মৃগয়াজীবী। তাহারা কোন প্রকার পশু পক্ষী প্রতিপালন করে না। নবজিলাণ্ডবাসী মেওরিজাতি কচু, তরমুজ প্রভৃতি কয়েক প্রকার ফলমূলের চাস করিয়া থাকে। অসময়ে খাইবার জন্য ইহারা কুকুর পুষিয়া থাকে। টাহিটীবাসীরা শূকর, কুকুর ও কয়েক প্রকার মুরগী পুষিয়া থাকে। ইহারা কুকুর ও ইঁদুরের মাংস খায়। এস্কিমোজাতি গাড়ী টানিবার ও শিকার করিবার জন্য কুকুর পুষিয়া থাকে। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা ধান ও ভুট্টার চাষ করিয়া থাকে—সে দেশের প্রান্তরে ঐ সকল শস্য স্বতঃই উৎপন্ন হয়। পারাগোয়েবাসী ইণ্ডিয়ানেরা পশু পালন বা কৃষিকার্য্যের কিছুই জানে না। ফুয়েজিজাতি মাছ ধরিবার জন্য কুকুর পোষে। যাহারা কৃষিকার্য্য জানে না, মূল উৎপাটন করিবার জন্য তাহারা এক প্রকার সূচল লাঠী ব্যবহার করে। যাহারা অল্প পরিমাণে কৃষিকার্য্য শিখিয়াছে, তাহারা ভূমি খনন করিবার জন্য এইরূপ সূচল লাঠী ব্যবহার করে, ক্রমে বর্শা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতফলক অস্ত্রের প্রচলন হয়। অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতি কাষ্ঠখণ্ডে বক্রভাবে প্রস্তর, অস্থি, বা অপর কাষ্ঠখণ্ড সংলগ্ন করিয়া খনন কার্য্য নির্ব্বাহ করে। তাহা হইতে কোদালির উৎপত্তি—ক্রমে কোদালি হইতে লাঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে।

একখানি কাঠে ছিদ্র করিয়া ছিদ্রমুখে আর একখানি সূক্ষ্মাগ্র কাঠ দিয়া জোরে ঘুরাইলে অগ্নি উৎপন্ন হয়; টাহিটী, নবজিলাণ্ড, সাণ্ডুইচ, টঙ্গা, সামোয়া এবং রাডাকদ্বীপপুঞ্জের অসভ্যেরা অদ্যাপি এইরূপে অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকে। দুই খণ্ড বাঁশে ঘর্ষণ করিলেও অগ্নি উৎপন্ন হয়। আসিয়ার পূর্ব্বভাগে, বোর্ণিও এবং সুমাত্রা-দ্বীপের লোকদিগের মধ্যে এই ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। একখানি কাঠের উপর আর একখানি কাঠ রাখিয়া দুই হাতে ঘুরাইয়া অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা দুই মিনিটের মধ্যে আগুন জ্বালিতে পারে। নীচের কাঠখানি পা

দিয়া বা হাঁটু দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়। কেরোলাইন, উনালস্কা, কামস্কাটকা ও দক্ষিণ আফ্রিকা দেশে এবং সিংহলের ব্যাধ ও কানারী দ্বীপের গোয়াঞ্চী জাতির মধ্যে এবং উত্তর আমেরিকার এস্কিমো ও ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে এইরূপে অগ্নি উৎপাদন করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ আমেরিকাতেও এককালে লোকে এইরূপে অগ্নি উৎপাদন করিত। ব্রাজিলে গৌকা জাতি প্রায় এক হাত লম্বা একখানি বাঁকা কাঠ আর একখানি কাঠের ছিদ্রের মধ্যে দিয়া অপর প্রান্ত বুকে চাপিয়া ধরিয়া হাত দিয়া ঘুরায়। ইহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতি; চক্‌মকি পাথরের ব্যবহার জানে। তথাপি এইরূপে মধ্যে মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকে। হাত দিয়া ঘুরাইলে যত পরিশ্রম হয়, ছুতরদিগের রেন্দা ঘুরাইবার মত দড়ি জড়াইয়া ঘুরাইলে তত কষ্ট হয় না। গ্রীণলাণ্ডের এস্কিমোজাতির মধ্যে এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। এস্কিমোরা কখন কখন দাঁত দিয়া কাঠখানি চাপিয়া ধরিয়া দুই হাতে দড়ি টানিয়া একজনেই আগুন বাহির করে। দড়ির পরিবর্ত্তে ধনুকের ছিলা জড়াইয়া উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান ও দাকোটাজাতি এক হাতে ধনুক টানে, অন্য হাতে লম্বমান কাঠখানি চাপিয়া ধরে। চক্‌মকি পাথরে আগুণ বাহির করা ফিজিয়ান, উত্তর আমেরিকার কোন কোন জাতি, কোন কোন এস্কিমোজাতি, আলগন্‌কিন ইণ্ডিয়ান, ও ভারতবর্ষীয় নানাজাতি এবং চীনেদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে গ্রীস ও রোমদেশীয়েরা চক্‌মকি পাথর ব্যবহার করিত। দুই খানি পাথরে ঠোকাঠুকি করিয়া আলুটজাতি ও উনালস্কার লোকেরা আগুন বাহির করে। নিগ্রোরা কাঠের উপর বালু ছড়াইয়া পাথর দিয়া ঘসিয়া আগুন বাহির করে। সূর্য্য-কিরণে কাঁচ ধরিয়া পূর্ব্বে রোমান ও গ্রীকেরা অগ্নি বাহির করিত। চীনেরা অদ্যাপি এই প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকে। প্লীনি বলেন, কাঁচের গোলার মধ্যে জল রাখিয়া সূর্য্যকিরণে ধরিলে এত উত্তপ্ত হয় যে, কাপড় পুড়িয়া যাইতে পারে। ফিন্ ও লাপ জাতি অদ্যাপি কাষ্ঠ-ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীতে জার্ম্মানদেশে গো-মড়ক নিবারণ করিবার জন্য এইরূপে অগ্নি জ্বালিবার প্রথা ছিল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে হানোবর দেশে এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেও গো-মড়ক নিবারণের জন্য এই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল।

কোন কোন অসভ্যজাতিকে কখন কখন আম মাংস ভক্ষণ করিতে দেখা যাইলেও অগ্নিপক্ক করিয়া খাইবার প্রথা সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। আণ্ডামানবাসী

বন্যজাতি তরুকোঠরে অগ্নি জালিয়া রাখে এবং আবশ্যক মত উপরের ভস্মগুলি ফেলিয়া দিয়া শূকর বা মৎস্য সিদ্ধ করিয়া লয়। আফ্রিকার অধিবাসীরা বল্মীক-স্তূপ অগ্নিতপ্ত করিয়া তাহার উপর গণ্ডার মাংস সিদ্ধ করিতে দেয়। দক্ষিণ সাগর-দ্বীপে, মাদাগাস্কার ও পোলিনেশিয়ায় মাংসের উপর উত্তপ্ত প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে হয়। কানারীদ্বীপের গোয়াঞ্চি জাতি গর্ত্ত-মধ্যে মাংস রাখিয়া তাহার উপর আগুন জ্বালে। সার্ডিনিয়া-দ্বীপেও এই প্রথা অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। মালাগাজিদিগের ন্যায় বেডুইন জাতি এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন জাতি উত্তপ্ত প্রস্তর দ্বারা মাংস সিদ্ধ করে। অস্ট্রেলিয়ার লোকেরা কখন বা প্রস্তর দ্বারা কখন বা গর্ত্ত-মধ্যে মাংস রাখিয়া তাহার উপর অগ্নি চাপাইয়া সুপক্ক করিয়া লয়। মাটিতে গর্ত্ত করিয়া রন্ধন করিবার প্রথা অসভ্যজাতির মধ্যে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাজিল দেশেও ইণ্ডিয়ানেরা আগুনের চারিদিকে চারিটা খুঁটা বসাইয়া খুঁটার উপর সারি সারি কাঠ দেয়। তাহার উপরে মাংস রাখিয়া নীচে অল্প অল্প জ্বাল দেয়। উত্তর আমেরিকার ফ্লরিডা উপদ্বীপ পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণ আমেরিকার সর্ব্বত্র এইরূপ ঝাঁজরি করিয়া পক্ক করিতে দেখা যায়। আফ্রিকা, কামস্কাটকা, পূর্ব্ব-উপদ্বীপ, এবং পেলুদ্বীপ-পুঞ্জে এই প্রথা। লবণ না মাখাইয়া এইরূপে সিদ্ধ করিয়া রাখিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত পচে না। উত্তর আমেরিকার অজিবাসজাতি মাটিতে গর্ত্ত কাটিয়া তাহার মধ্যে কোন জন্তুর টাটকা চামড়া চাপিয়া দেয়। তাহাতে জল রাখিয়া মাংস দেয়। নিকটবর্ত্তী আর এক স্থানে আগুন জ্বালিয়া কয়েক টুকরা পাথর অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করে। সেই পাথরগুলি জলে ফেলিয়া দিলে মাংস সিদ্ধ হয়। দাকোটাজাতি বলে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোন জন্তু বধ করিলে তাহারই চর্ম্ম চারিটি খুঁটার উপর বাঁধিয়া সেই চর্ম্মমধ্যে জল, মাংস, পাথর দিয়া ঐরূপে সিদ্ধ করিত। বাঙ্গালা দেশের কোন কোন স্থানে বিদেশে যাইবার সময় পথে হাঁড়ি না পাইলে বৃক্ষ-পত্রের স্থালী করিয়া তাহার নিম্নভাগে মাটি লেপিয়া অন্নপাক করিতে দেখা গিয়াছে। উত্তর আমেরিকার কোন কোন ইণ্ডিয়ানেরা কাঠের স্থালীতে জল রাখিয়া উত্তপ্ত প্রস্তর দ্বারা সিদ্ধ করে। মিকমাক, সুরিকোয়া, ব্লাকফিট এবং ক্রিজাতি এইরূপে পাথর দ্বারা সিদ্ধ করে। গাছের শিকড় বুনিয়া স্থালী করিয়া পাথর দ্বারা সিদ্ধ করিবার প্রথা শোশোনি, স্লেব, ডগ্‌রিব ও রকি পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। হুটকা এবং পোর্টফ্রেঞ্চ দ্বীপে কাঠের স্থালী দেখিতে পাওয়া যায়। পাথর তাতাইয়া সিদ্ধ করিবার

প্রথা আইসি অন্তরীপের এস্কিমোদিগের মধ্যে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দেও দেখা গিয়াছিল। এই সকল জাতির কেহ কেহ ধাতু বা মৃণ্ময় পাত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়া পূর্ব্ব-অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রুসিয়ানদিগের নিকট লৌহ-স্থালীর ব্যবহার দেখিয়াও কামস্কাটকার লোকেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত কাঠের স্থালীর ব্যবহার পরিত্যাগ করে নাই। তাহারা বলিত, কাঠের স্থালীতে সিদ্ধ মাংস বড় সুমিষ্ট হয়। নবজিলাণ্ড এবং পলিনেশিয়ান দ্বীপ-পুঞ্জে এক সময়ে পাথর দ্বারা সিদ্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। নবকালিডোনিয়া, ফিজি, পেলু এবং টঙ্গান দ্বীপপুঞ্জে অনেক দিন হইতে মৃণ্ময় পাত্রের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে এবং ইউরোপীয়দিগের নিকট দেখিয়া পলিনেশিয়াতেও এত দিনে মৃণ্ময় পাত্রের ব্যবহার প্রচার হইয়া থাকিবেক। য়ুরোপে ফিনজাতির মধ্যে পাথর দিয়া সিদ্ধ করিবার রীতি বর্ত্তমান শতাব্দীতে দেখা গিয়াছে। সাইবিরিয়ার অষ্টিয়াক্ জাতি এবং কোরিয় জাতি, প্রাচীন সিথিয়ানেরা ও য়ুরোপীয় হেব্রেডিজ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা কোন জন্তু বধ করিলে তাহাদের উদর ভাগ স্থালীরূপে ব্যবহার করিত। সুতরাং বলা যাইতে পারে, মৃণ্ময় স্থালী ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উত্তপ্ত প্রস্তর ফেলিয়া সিদ্ধ করিবার প্রথা আদিম সমাজে প্রচলিত ছিল।

এস্কিমো এবং প্রাচীন পৃথিবীর অনেক জাতি খোবরাল পাথর স্থালীরূপে ব্যবহার করিত। আসিয়া ও আমেরিকার অনেক জাতি বৃক্ষত্বক এই রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীরা নারিকেল গাছের মোচায় খাদ্য সিদ্ধ করে। কাম্বোডিয়ার ষ্টিয়েন জাতি, সুমাত্রার অধিবাসীরা এবং বোর্ণিয়োর দায়াকেরা বাঁশের চোঙ্গায় এবং টাহিটী ও রাডাক দ্বীপ-পুঞ্জের লোকেরা নারিকেল মালায় অন্ন সিদ্ধ করে। কাষ্ঠ স্থালীতে মৃত্তিকা লেপিয়া খাদ্য সিদ্ধ করিবার প্রথা দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত ছিল। এস্কিমো জাতি ও উনালস্কার অধিবাসীরা পাথরের তলা করিয়া মৃত্তিকা বা তিমি মৎস্যের ডানা দিয়া এক প্রকার হাঁড়ি প্রস্তুত করে। ফিজিদ্বীপেও নারিকেল বা অন্য কোন ফলের মালার গায় মৃত্তিকা লেপিয়া স্থালী করিবার প্রথা আছে।

মহ ও বলগা হরিণের সমকালীন মানবসন্তান ভূ-গহ্বর বা গিরিগুহা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কোটরে আশ্রয়স্থান লাভ করিয়াছিল। অদ্যাপি দক্ষিণ আফ্রিকার বুশমানেরা গুহা মধ্যে বাস করিয়া থাকে। পাখীর কুলায়, বীবরের গৃহ ও বানরের মঞ্চ নির্ম্মাণ ক্ষমতা দেখিলে কেহ বলিতে সাহস করিবে না, মনুষ্য কোন দিন আশ্রয়স্থান শূন্য ছিল; তবে আবশ্যক বশতঃ বা অনাবশ্যক বোধে কোন

কোনও জাতি অনাচ্ছাদিত প্রান্তরে বা বৃক্ষ-মূলে দিনপাত করিতে পারে। আণ্ডামানবাসিদিগকে সমুদ্রতটে শম্বুক অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে পর্ব্বতাশ্রয়ে বালুকা মধ্যে গর্ত্ত কাটিয়া দিনপাত করিতে দেখা গিয়াছে। ব্রাজিলের বন মধ্যে নগ্নদেহ পুরিজাতি দুইটা খুঁটি ঢেরার মত বসাইয়া বড় বড় নারিকেল পত্রে আচ্ছাদিত করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে। কয়েকটা নারিকেল পত্র গোলাকারে মাটীতে পুতিয়া তাহাদের অগ্রভাগ একত্র বাঁধিয়া বাটুকুদো জাতি তাহার মধ্যে বাস করে। আমাদের দেশে আত্মশ্রাদ্ধ করিবার সময় যজ্ঞবেদী এইরূপে আচ্ছাদিত করা হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কলাপের মধ্যে অনেক সময় প্রাচীন রীতির লুপ্তাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য সকল প্রকার আচার ব্যবহারে লোকে যত সহজে পরিবর্ত্তন অনুমোদন করে, অন্ত্যেষ্টিকার্য্যে সেরূপ করে না। সুতরাং প্রাচীনতম আর্য্যবংশের গৃহ সকল এইরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল অনুমান করিবার আমাদের অধিকার আছে। পাটাকো জাতি জীবন্ত বৃক্ষ সকল গোলাকারে রোপণ করিয়া অন্যান্য পত্রে তাহাদিগের শাখা সকল আবৃত করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে। অষ্ট্রেলিয়গণও এইরূপে বৃক্ষশাখা একত্র করিয়া তৃণ, পত্র বা বল্কলে আবৃত করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করে। ইহারা শাখা বা পত্রে গৃহের চারিদিক ঘেরিয়া রাখে, কখন কখন তাহার উপর মাটীর লেপ দিয়া থাকে। এইরূপে কুটীর নির্ম্মাণ পদ্ধতির ক্রমবিকাশ হইয়াছে, বুঝা যাইতে পারে। মৃগয়া ব্যাপারে বনে বনে ভ্রমণ করিবার সময় নিত্য নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করা সহজ নহে। এজন্য পর্য্যটনশীল জাতি সকল কয়েকটী খুঁটি এবং আবশ্যক পরিমাণে বৃক্ষ-বল্কল বা পশুচর্ম্ম সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করে, যখনই প্রয়োজন হয়, আবাসগৃহের অনুকরণে বৃত্তাকারে খুঁটি পুতিয়া বল্কল বা চর্ম্ম আচ্ছাদনে আশ্রয়-স্থান নির্ম্মাণ করে। এইরূপ চর্ম্ম বা বল্কলাবাস হইতেই ক্রমে বস্ত্রাবাসের সৃষ্টি হইয়াছে। আসিয়া মহাদেশে বল্কল বা চর্ম্মাবরণের পরিবর্ত্তে কেশ বা লোম-নির্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহৃত হয়—য়ুরোপে এখন তুলা বস্ত্রে বস্ত্রাবাস আবৃত করিবার রীতি।

মাটীতে পাতা পুতিয়া ঘর প্রস্তুত করিলে সে ঘর তত উচ্চ হয় না। বস্তুতঃ এরূপ গৃহকে ঘর না বলিয়া কেবল চাল বা ছাত বলিলেই হয়। উঠিতে বসিতে এরূপ ঘরে বড় কষ্ট। এজন্য চালের নীচে মাটীর মধ্যে গর্ত্ত কাটিয়া অনেক জাতি গৃহের উচ্চতা বৃদ্ধি করে। কালক্রমে খুঁটির উপর বা প্রাচীরের উপর চাল বসাইতে মনুষ্য শিক্ষা করে। গোলাকারে খুঁটি বসাইয়া তাহার উপর বা

সেই খুঁটির সহিত বেড়া বাঁধিয়া সেই বেড়ায় মাটী লেপিয়া তাহার উপর অথবা মৃৎপ্রাচীরের উপর চাল বসাইয়া গোলাকার কুটীর নির্ম্মাণ-পদ্ধতি অনেক দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। চতুষ্কোণ গৃহ-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি সভ্যতার লক্ষণ, অসভ্যদিগের মধ্যে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে বৃক্ষ দুর্লভ, সেখানে প্রস্তর দ্বারা গৃহের প্রাচীর নির্ম্মিত হয়। প্রথমাবস্থায় পাথর কাটিতে না পারিয়া উপর্য্যুপরি বসাইয়া দেয়। ক্রমে পাথর কাটিয়া বসাইতে শিখে। পাথর অভাবে মাটীর চাপ পাথরের মত বসাইয়া গৃহ প্রস্তুত করা হয়। মাটী পোড়াইয়া (ইষ্টক দ্বারা) গৃহ নির্ম্মাণ করিবার রীতি কেবল সভ্য জাতির মধ্যে দেখা যায়। বোধ হয় প্রাচীরে মাটী লেবিবার রীতি হইতে মৃৎপ্রাচীর ও ইষ্টক প্রাচীরের উদ্ভব হইয়াছে।

অসভ্যেরা অত্যন্ত অলঙ্কারপ্রিয়। সত্য বটে, অতি নিকৃষ্ট বন্য জাতিদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগকে অলঙ্কার পরিতে দেখা যায় না, কিন্তু তাহাদেরও পুরুষেরা সর্ব্বদাই অলঙ্কারে সুশোভিত থাকে। যে সকল বন্য জাতি দেহ আচ্ছাদন আবশ্যক বলিয়া মনে করে না, তাহাদিগকেও নানা বর্ণে চিত্রবিচিত্রিত হইতে দেখা যায়। শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত এবং লোহিত বর্ণই অসভ্যদিগের অধিক প্রিয়। সাধারণতঃ এই চারি বর্ণে তাহাদিগকে অঙ্গরাগ সাধন করিতে দেখা যায়। বোটানিবে-নিবাসী অষ্ট্রেলিয়ানেরা উলঙ্গাবস্থায় বাস করে, তাহারাও সিন্দুর সাদা মাটি এবং কয়লার গুঁড়া দিয়া আপনাদিগকে চিত্রিত করে। লাল রঙ্গ শরীরের স্থানে স্থানে চাপড়াইয়া দেয়, সাদা রঙ্গের রেখা টানে, এবং ছোট ছোট ফোঁটা চোখের চারিদিকে গোল করিয়া দেয়। ইহারা নাকের ডাঁটি ফুঁড়িয়া এক এক টুকরা হাড় পরে। হাড়খানি আঙ্গুলের মত মোটা এবং পাঁচ ছয় ইঞ্চ লম্বা। এই হাড়খানি পরিলে তাহাদের নিশ্বাস টানিতে বড় কষ্ট হয়। কিন্তু দেখিতে সুন্দর হইবে বলিয়া সে কষ্ট গ্রাহ্য করে না। ইহারা শুক্তির মালা গাঁথিয়া গলায় পরে, কাণে মাকড়ী দেয়, হাতে দড়ির বালা পরে এবং চুলের দড়ি কোমরে ঝুলায়। কাহার গলায় হাড়ে বড় শামুক বা কড়ি বাঁধা থাকে। কোরোডো জাতির স্ত্রীলোকেরা রঙ্গ দিয়া আপনাদের দেহ চিত্রিত করে। সে চিত্র গালের উপর একটী বৃত্ত। তাহার উপর দুইটী তিলক। নাকের নীচে(M) চিহ্নের মত কতকগুলি দাগ থাকে। ঠোঁটের পার্শ্ব হইতে দাড়ির উপরের বৃত্ত পর্য্যন্ত দুইটী করিয়া সমান্তরাল রেখা। তাহার নীচে উভয় পার্শ্বে আবার কতকগুলি তিলক। বক্ষের উপর কয়েকটী অর্দ্ধচন্দ্র এবং দুই হাতে দুই

সর্প। এই সুন্দরীরা বানরের দাঁতের মালা ভিন্ন আর কোন অলঙ্কার পরেন না টানাদেশের লোকেরা মুখের এক পার্শ্বে রাঙ্গা মাটি দিয়া রঙ্গ করে। অপর পার্শ্ব চর্ম্মের স্বাভাবিক কটা বর্ণ থাকিয়া যায়। কেহ কেহ বা কপাল ও গাল লাল রঙ্গে রঞ্জিত করে। অপরে সমস্ত মুখে লাল রঙ্গ মাখিয়া কপালে একটা কাল ফোঁটা পরে। পরিবারের কাহার মৃত্যু হইলে ইহারা সমস্ত মুখে কাল রঙ্গ মাখে।

সচরাচর অসভ্যেরা মালা, আংটি, বালা, মল, তাড়ু ও খাড়ু পরিয়া থাকে। কোন কোন জাতির মধ্যে হাঁটুর উপরে এক প্রকার মল পরিবার রীতি আছে এই সকল অলঙ্কারের ভার সামান্য নহে। উড়িষ্যা দেশে কোন কোন রমণীকে পনর সের ভার কাঁসার খাড়ু পড়িতে দেখা গিয়াছিল। আদর করিয়া আলিঙ্গন করিবার সময় গুরুভার অলঙ্কারের সহসা আঘাতে ইহাদের প্রিয়জনেরা কখন কখন পঞ্চত্ব লাভ করে। অসভ্যেরা অসংখ্য অঙ্গুরীয় ব্যবহার করে। বেতুয়ান জাতির একটি রমণীকে ৭২টী আংটী পরিতে দেখা গিয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রি-কার একটি সর্দ্দার-পত্নীর অলঙ্কার লিভিংষ্টোন সাহেব এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তাহার হাঁটুর উপর প্রত্যেক পায়ে আঠার গাছি নিরেট মল ছিল। এক এক গাছি মল আঙ্গুলের মত মোটা। হাঁটুর নীচে এক এক পায়ে তিনগাছি করিয়া তামার মল ছিল। বাম হাতে ঊনিশ গাছি ও ডান হাতে আট গাছি খাড়ু ছিল। এবং প্রত্যেক হাতে এক এক গাছি হাতীর দাঁতের তাড়, গলায় হার ও কোমরে মালা ছিল। অলঙ্কারের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের প্রয়োজন নাই। তামা, কাঁসা, লোহ, চর্ম্ম, হাতিদাঁত, পাথর, গেঁড়ী, কাচ, অন্যান্য জন্তুর দাঁত, গাছের বীজ, কাঠের টুকরা, কিছুই ফেলিয়া দিবার আবশ্যক হয় না। প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণবর্ত্তী দ্বীপে মানুষের হস্ত লইয়া তাড়ুর মত ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে। টিনের বাক্স, লোহার কড়া, এ সকলও তাহারা গৌরবের সহিত অলঙ্কাররূপে পরিয়া থাকে।

মধ্য-আফ্রিকার ভেলাটা রমণীরা অঙ্গরাগ করিতে ঘণ্টা ঘণ্টা সময়পাত করে। ইহারা পূর্ব্ব রাত্রে মেদীপাতা বাটিয়া হাত পায়ের আঙ্গুলে মাখায়; একটা নীল, একটা পীত, একটা লাল, এইরূপে সব দাঁতগুলিতে রঙ্গ মাখায়, মাঝে মাঝে এক একটাকে স্বাভাবিক রঙ্গে রাখিয়া দেয়। চক্ষে কাজল দেয় এবং চুলগুলিতে নীল রঙ্গ মাখায়। এতদ্ভিন্ন বাঘের নখ, শুক্তির মালা প্রভৃতি অলঙ্কারের ত কথাই নাই। মেকেঞ্জি নদীর পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী এস্কিমো জাতি

চিবুকে দুইটা ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতর হাড় বা কাঠের টুকরা রাখিয়া ক্রমে ছিদ্র বাড়াইয়া যায়। শেষে সেই ছিদ্র মধ্যে এক এক টুকরা পাথর পরে। সলোমন দ্বীপের অধিবাসীরা নাক ফুঁড়িয়া তাহার মধ্যে কাঁকড়ার দাড়া পরে। পশ্চিম আমেরিকার অধিকাংশ স্থানে এবং আফ্রিকাদেশে অধরের মধ্যভাগে বাল্যকালে ছিদ্র করিয়া রাখে এবং নানা উপায়ে সে ছিদ্র বাড়াইয়া লয়। প্রায় দুই ইঞ্চ প্রমাণ ছিদ্র হইলে তাহাতে কাঠের বা হাড়ের টুকরা পরে। কোন কোন জাতি কাণের নিম্নভাগে আমাদের দেশের মত এবং কোন কোন জাতি কাণের মধ্যভাগে ছিদ্র করিয়া :সোলা, হাড়, কাঠ, পাথর প্রভৃতি পরে। ক্রমে কাণ ঝুলিয়া কাঁধ পর্য্যন্ত নামিতে দেখা যায়।

নানা আকারে দাঁত কাটিবার রীতিও অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। কোনটা বা সূচল, কোনটা অগ্রশূন্য, কোন কোনটার মধ্য কোরা ; নানা ভাবে দন্তের স্বাভাবিক আকার পরিবর্ত্তন করিতে দেখা গিয়াছে। সুমাত্রা দ্বীপের রেজাঙ্গজাতির দাঁত স্বাভাবিক বড় সুন্দর ; কিন্তু দেশভেদে এমনি রুচিভেদ যে, তাহারা সৌন্দর্য্যের জন্য কাটিয়া কাটিয়া দাঁত যেরূপ বিকৃত করে, আমাদের নিকট অতি কদর্য্য বোধ হয়। যাহার দাঁত কাটিতে হইবে সে চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে, আর একজন এক টুকরা পাথর লইয়া দাঁত ঘসিতে থাকে। লামোঙ্গ দেশে স্ত্রীলোকেরা দাঁত ঘসিয়া ঘসিয়া মাড়ির সঙ্গে সমোচ্চ করিয়া লয়। মিসি বা অন্য রঙ্গ ভাল ধরিবে বলিয়া অনেক জাতি দাঁত ছুলিয়া লয়। পায়ে আল্‌তার রঙ্গ ভাল ধরিবে বলিয়া এ দেশীয় রমণীগণ ঝামা পাথর বা ছুরি দিয়া পা ছুলে। দায়াকজাতি উপর সারির সম্মুখের ছয়টী দাঁতে সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতর সরু সরু কাঠি দিয়া রাখে। কাঠিতে লাগিয়া ওষ্ঠ উঁচা হইয়া থাকে ; এইরূপ করিলে দাঁতের শোভা সকলে ভাল করিয়া দেখিতে পায়। আফ্রিকার অনেক জাতির মধ্যে দাঁত কাটিবার রীতি আছে, স্বতন্ত্র জাতির স্বতন্ত্র ধরণে কাটা হয়।

উল্কি পরিবার রীতি অসভ্য জাতি মাত্রেই দেখা যায়। এক এক জাতি এক এক প্রকারে দেহ চিত্রিত করে। কখন বা এক জাতির বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ভাবে, যাহার সৌন্দর্য্যের যেমন আদর্শ সে তেমনি করিয়া, চিত্র করিয়া লয়। প্রতিদিন নূতন অঙ্গরাগ করিতে বিস্তর সময় অতিপাত হয় ; শিকারে দৌড়াদৌড়ি করিয়া ঘামে রঙ্গ ধুইয়া যায়। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য চিরস্থায়ী চিত্র উল্কির উদ্ভব হইয়াছে। এক আবোকুটা জাতির মধ্যে

কাহারও দেহে তিলের মত ছোট ছোট, কাহারও দেহে বড় বড়, কাহারও অঙ্গে কচ্ছপ, কাহারও কুম্ভীর, গিরিগিটী, নক্ষত্র, সমকেন্দ্রীভূত বৃত্তমালা, সরল রেখা, ত্রিভুজ, সহস্র সহস্র আকারের চিত্র দেখা যায়। দেহমধ্যস্থ ভূত তাড়াই-বার জন্য যে ক্ষত করা হয়, তাহারও চিহ্ন তাহাদের মধ্যে মধ্যে। প্রত্যেক জাতি গোত্র বা বংশের স্বতন্ত্র টিকা আছে। দেখিলে কে কোন জাতি বলিয়া দেওয়া যায়। জাতি নির্ণায়ক এইরূপ চিহ্নকে উড়িষ্যাদেশ-প্রচলিত সন্তক শব্দে আমরা স্থানান্তরে অভিহিত করিয়াছি। দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়াম্বা জাতি কপাল হইতে নাক পর্য্যন্ত ছোট ছোট মটরের মত উল্কি পরে। বাচাপিন কাফিরদিগের মধ্যে যাহারা যুদ্ধে জয়লাভ করে, :জানুতে একটা লম্ববান ক্ষত করিয়া ছাই দিয়া ঘসিয়া নীল রঙ্গের উল্কি পরে। আফ্রিকার বুন্ জাতি মাথা হইতে মুখ পর্য্যন্ত তিন জায়গায় চিরিয়া খানিকটা মাংস বাহির করিয়া লয়। তাহার পর নারিকেল তৈল ও কাঠের ছাই ক্ষতস্থানে ঘসিয়া দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবীজ জাতি মুখের এক এক পার্শ্বে ২০টা করিয়া দাগ করে; এবং কপালের মধ্যস্থলে একটা, এক একটা হাতে ৬টা, প্রত্যেক পায়ে ৬টা, বুকের এক এক পার্শ্বে চারি চারিটা, দুই পার্শ্বের পঞ্জরের উপর ৯টা করিয়া, সর্ব্বশুদ্ধ ৯১টা ক্ষত করিয়া থাকে। একে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, তাহাতে মক্ষিকার উৎপাত, কষ্ট কত হয় অনুমান করা যাইতে পারে। টরিসস্ট্রেট্ দ্বীপবাসীরা দক্ষিণ স্কন্ধের উপর বড় বাদামের মত একটা দাগ করে। কেহ কেহ বাম স্কন্ধের উপর আর একটা করিয়া লয়। ইয়র্ক অন্তরীপের অধিবাসীরা বুকের উপর দু তিনটা ক্ষত করে। কাহারও বা দ্বিশাখ শৃঙ্গের ন্যায় দুইটা করিয়া দাগ থাকে। উল্কি পরিবার প্রথা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত থাকিলেও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহার কিছু আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাইবিরিয়ার অষ্টিয়াক্ রমণীরা হাতে, অঙ্গুলির উপর এবং পায়ে উল্কি পরে; কিন্তু পুরুষেরা কেবল কোমরেই পরিয়া থাকে। টুঙ্কি জাতীয় রমণীরা চিবুকের উপর কয়েকটা দাগ করে। কিন্তু পুরুষদিগের মধ্যে যে ভালুক মারিতে পারিয়াছে, তিমি মাছ ধরিতে পারিয়াছে বা যুদ্ধে শত্রুহত্যা ইত্যাদি কোন সাহসের কর্ম্ম করিয়াছে, সেই কেবল মুখের উপর একটা দাগ করিতে পারে। আরাবদিগের মধ্যে আইনেজি জাতির স্ত্রীলোকেরা ঠোঁট চিরিয়া তাহাতে নীল রঙ্গ করিয়া লয়। সারহান স্ত্রীলোকেরা গালে, বুকে এবং হাতের উপর উল্কি পরে। আমোর স্ত্রীলোকেরা পায়ে উল্কি পরে। আলুট জাতীয়েরা হাতে ও মুখে কোন পশু পক্ষী বা ফুলের আকারে উল্কি পরে। তুঙ্গুসি

জাতির সরল বা বক্র রেখা হইলেই হয়। বেট্‌সিনেও জাতির রমণীরা হাতে এবং মুখে এবং পুরুষেরা বুকের উপর চিত্র করে। ভারতবর্ষীয় অনেক জাতির মধ্যে উল্কি পরিবার প্রথা আছে। আবোর জাতির পুরুষেরা কপালে ত্রিশূল চিহ্ন করে, স্ত্রীলোকেরা অধরের উপর সেইরূপ একটি চিহ্ন এবং মুখের চারি পার্শ্বে সাতটী সরল রেখা টানে। খায়েল জাতিরা শরীরের নানা স্থানে পশু পক্ষীর চিত্র করে। তাহারা বলে, উল্কি সৌন্দর্য্যসাধক নহে, কিন্তু তাহাদের রমণীরা স্বভাবতঃ এত সুন্দরী যে, এরূপ না করিলে অন্য জাতির পুরুষেরা তাহাদিগকে কাড়িয়া লইয়া যায়। বীরভূম অঞ্চলে, উড়িষ্যা ও পূর্ব্ব বাঙ্গলায় অদ্যাপি রমণীদিগকে উল্কি পরিতে দেখা যায়। বাঙ্গলা দেশের অন্যান্য ভাগেও পূর্ব্বে উল্কি পরিবার প্রথা দেখা যাইত। ওরাঁও রমণীরা কপালে তিনটী এবং রগে দুইটী দাগ করে। ইহাদের পুরুষেরা হাতের উপর অংশে দগ্ধ করিয়া ক্ষত করে। নবগিনির দক্ষিণ অংশে এবং ক্রুমার দ্বীপের রমণীরা হাতে মুখে এবং শরীরের সম্মুখ ভাগে সর্ব্বত্র সোজা রেখা টানে। দুইটি রেখার ব্যবধানে এক ইঞ্চ পরিমিত স্থানও থাকে না। আবার লতা কাটিয়া একটি রেখার সহিত আর একটি রেখার যোগ করিয়া দেয়। ইহাদের হাত, মুখ ও কোমর দেখিলে বোধ হয়, যেন জাল বুনিয়াছে। ইহাদের পুরুষেরা দক্ষিণ বুকের উপর কয়েকটি রেখা টানে বা নক্ষত্র আঁকে। কেহ কেহ বা কাঁধ হইতে নাভি পর্য্যন্ত দুই সারি টিক পরে। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, টানাদেশের লোকেরা রঙ্গ দিয়া সর্ব্ব শরীর চিত্রিত করে। কিন্তু তাহাতেও তাহাদের তৃপ্তি হয় না। তাহারা হাতের ও বুকের উপর অধিকন্তু উল্কি পরিয়া থাকে। উল্‌কিগুলি গাছ, ফুল, নক্ষত্র বা অন্যান্য জন্তুর আকারে করা হয়। ফরমোসাদ্বীপে শরীরের সর্ব্বত্র গাছ, ফুল বা জীবজন্তুর আকারে উল্‌কি পরা হয়। ভারতবর্ষের দক্ষিণাপথের রমণীরা হাত, বুক ও কপালের উপর ফুলের আকারে উল্‌কি পরিয়া থাকে। সেগুলি আবার নানা রঙ্গে চিত্রিত করা হয়। গিনিদেশেব প্রধান লোকদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন, গায়ের উপর ফুল সাজাইয়া রাখিয়াছে। টঙ্গাদ্বীপের পুরুষেরা বুক হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত চিত্রিত করে। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা কেবল হাত ও আঙ্গুলের উপর ছোট ছোট উল্‌কি পরিয়া থাকে। ফিজিদ্বীপে পুরুষেরা উল্‌কি পরে না। উহা ফিজি রমণীগণের একচেটিয়া। গ্যাম্বিয়া দ্বীপে উল্‌কি-শূন্য একটি মানুষও দেখিতে পাওয়া যায় না। কাঁধ হইতে পা পর্য্যন্ত সকলের শরীর উল্‌কিতে পূর্ণ থাকে। কেবল বুকের উপর কাহারও কাহারও একটি

মাত্র দাগ থাকে। কেহ বা বুকে মোটেই উল্‌কি পরে না। বয়োবৃদ্ধ হইলে মুখটিও খালি থাকে না। এক কাণ হইতে অন্য কাণ পর্য্যন্ত নাকের উপর দিয়া বৃদ্ধেরা অনেকগুলি রেখা টানিয়া লয়।

উল্‌কি পরিয়া অসভ্যেরা অনেক সময় কাপড়ের কার্য্য সারিয়া থাকে। ক্যারোলীন দ্বীপেও সকল লোকে উল্‌কি পরে। সাণ্ডুইচ দ্বীপবাসিদিগের যেরূপ হউক একটা দাগ করিলেই হইল। নবজিলাণ্ডে সরল বা বক্র রেখায় সর্ব্ব শরীর চিত্রিত করা হয়। অধর ও ওষ্ঠ চিত্রিত করিতে বড় কষ্ট হয়। কিন্তু কষ্ট পাইবার কিছুমাত্র চিহ্ন প্রকাশ করা কাপুরুষতার লক্ষণ। ওষ্ঠের স্বাভাবিক বর্ণ লোককে দেখান, ইহাদের রমণীরা বড়ই নিন্দার কথা মনে করে। তাহারা সোজা সোজা রেখা টানিয়া স্বাভাবিক বর্ণ ঢাকিয়া ফেলে। যে দেশের রমণীরা মিশি বা কশ লাগাইয়া অথবা তাম্বুলে আরক্ত করিয়া অধর ওষ্ঠ বা দন্তের স্বাভাবিক বর্ণ সাধ্যমতে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, নবজিলাণ্ড রমণীদিগের ব্যবহার তাহাদিগের নিকট অসভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

শ্যাম, জাবা, চীন ও জাপান দেশে রমণীরা দুই হাতে বড় বড় নখ রাখিয়া থাকে। নখগুলি ৬।৭ ইঞ্চ বড় হইতে দেখা গিয়াছে। শৈশবাবস্থা হইতে পা ছোট করিবার জন্য রমণীরা লোহার জুতা পরে। যার পা যত ছোট, সে তত সুন্দরী। কাহার কাহার পা ৫।৬ ইঞ্চ অপেক্ষা বৃহৎ নহে। বিলাতী রমণীরা তিমি মাছের অস্থি বাঁধিয়া বা অন্য প্রকারে কোমর সরু করিয়া থাকে। যাহার কোমর যত সরু সে তত সুন্দরী। এই অস্বাভাবিক চেষ্টায় য়ুরোপীয় অনেক রমণী শ্বাসরোগে পঞ্চত্ব পায়। অনেক দেশে বিশেষ কষ্ট করিয়া মাথা লম্বা, গোল বা বাদামের আকারে পরিণত করা হয়। সামোয়াদ্বীপে এবং আমেরিকার অনেক জাতির মধ্যে এই প্রথার বিশেষ প্রাদুর্ভাব।

কেশবিন্যাস নানা দেশে নানা প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন জাতি চিরদিন মুণ্ডিত মস্তকে থাকে। কেহ বা কেবল একটী গুচ্ছ রাখিয়া দেয়। কাফির জাতি কেবল একটী বৃত্ত রাখা বড় সৌন্দর্য্যের কথা মনে করে। কেহ যুদ্ধে পরাস্ত হইলে উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে একটি টিকি রাখিবার প্রথা আছে। ইয়র্ক অন্তরীপের লোকেরা চুল বাড়িতে দেয় না। টরিসষ্ট্রেট দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা এক কাণ হইতে অপর কাণ পর্য্যন্ত এক সারি চুল রাখিয়া সমস্ত মস্তক মুণ্ডিত করে। কেহ কেহ বা নলের আকারে বিউনি করিয়া রাখিয়া দেয়। টানাদ্বীপের রমণীদের দীর্ঘ কেশ বড় নিন্দার কথা।

ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশগুলি লতাবন্ধনে শত শত গুচ্ছে বিভক্ত করিয়া রাখে; কিন্তু পুরুষেরা এক হাত পর্য্যন্ত লম্বা চুল রাখে, এবং ছয় সাত শত বিউনিতে বিভক্ত করিয়া লয়। বিউনিগুলি লতা দিয়া জড়িত করা হয়; এবং তাহাদের অগ্রভাগ তৈল মাখাইয়া কোঁকড়া করিয়া রাখে। ফিজিয়.নেরা কেশ বিন্যাস করিতে বিস্তর সময় নষ্ট করে এবং বিশেষ যত্ন করিয়া থাকে; ইহাদের সর্দ্দারদিগের কেশবিন্যাসক নিযুক্ত আছে। খোঁপা করিতে সর্দ্দারদের ছয় সাত ঘণ্টা সময় লাগে। এক একটী খোঁপার পরিধি ৩।৪ ফুট হয়। একজনের পাঁচ ফুটও দেখা গিয়াছিল। এত বড় খোঁপা করিয়া নিদ্রা যাইতে কষ্ট হয় বলিয়া ইহারা কাঠে উচ্চ উপাধান করিয়া তাহার উপর স্কন্ধ রাখিয়া নিদ্রা যায়। চুলগুলিতে নানা রঙ্গ মাখান হয়। কাল রঙ্গ ইহারা অধিক ভাল বাসে; কেহ কেহ শ্বেত, রক্ত এবং অন্যান্য রঙ্গও মাখাইয়া থাকে। কেহ কেহ বা বিভিন্ন বর্ণে চিত্রিত করিয়া থাকে। কতক ছাঁটিয়া মাঝে মাঝে অনেকগুলি খোঁপা পরারও রীতি আছে। ৬।৭ ইঞ্চ করিয়া একটী খোঁপা হয়: প্রশান্তসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা স্বাভাবিক সুন্দর কেশসত্বেও পরচুল ব্যবহার করিয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত য়ুরোপে সুশিক্ষিত লোকেরাও পরচুল ব্যবহার না করা নিন্দনীয় মনে করিত। অদ্যাপি তত্রত্য রমণীদের মধ্যে পরচুল ব্যবহারের প্রথা আছে। সুদানের দিনকা জাতি চুলে লাল রঙ্গ মাখাইয়া অগ্নিশিখার মত ঝুলাইয়া রাখে। পত্র পুষ্প ও লতা দ্বারা অঙ্গের অলঙ্কার ও কেশের শোভা বর্দ্ধন করা নানা জাতির মধ্যে দেখা যায়। কেশ বিন্যাসের সহস্র প্রথা সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং সে বিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই।

---

# অষ্টম পল্লব।

সাধারণতঃ অসভ্যদিগের সংখ্যার হিসাব বড় সামান্য। একজন কৃষককে জিজ্ঞাসা কর তাহার বয়স কত—সে যে উত্তর দিবে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবে না। অশীতিবর্ষের বৃদ্ধকে তাহার বয়স "দশ কুড়ি" বৎসর বলিতে শুনা যায়। রাস্তায় কত লোক? হাজার হাজার, শত শত, নিদেন বিশ পঞ্চাশ। অসভ্য সমাজেও ঐইরূপ দেখা যায়। কিন্তু কোন কোন জাতির মধ্যে উন্নততর অবস্থাও দেখা যায়। টঙ্গানদিগের ভাষায় লক্ষবাচক শব্দ আছে। পশ্চিম আফ্রিকায়

ব্যবসা বাণিজ্যের আতিশয্য হেতু বালকেরা কড়ি দিয়া অনেক সংখ্যা গণিতে পারে। যরুবা জাতির কাহাকে "ননাম কত জানে না" বলা বড় অপমান-সূচক। ইহাদিগের গণনা করিবার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অধিক বলিতে হইবে। মূর্খ বলিতে হইলে জার্ম্মানেরা বলে "সে পাঁচ পর্য্যন্ত গণিতে পারে না।" ইংরাজ-দের মধ্যেও এইরূপ কথা। স্পানিয়ার্ডেরা বলে "সে জানে না কিসে কিসে পাঁচ হয়।" শ্যামদেশে যে দশ গণিতে জানেনা তাহার সাক্ষ্য লওয়া হয় না। পূর্ব্বে ইংলাণ্ডের কোন কোন স্থানে বারটা পেনি গণিতে না পারিলে তাহাকে নাবালক বলিত।

দক্ষিণ আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন জাতির ভাষায় পাঁচ বলিবার কোন একটী শব্দ নাই। ব্রাজিলের বন্য জাতিরা অঙ্গুলির পর্ব্বে তিনটি পর্য্যন্ত গণিতে পারে। তাহার অধিক হইলেই "অনেক" বলে। বাটুকুদো ও পুরী-ভাষায় এক দুই বলিয়াই "অনেক" বলিতে হয়। তাস্‌মেনিয়ানদের মধ্যেও এইরূপ। নবহলাণ্ডে দুইয়ের অধিক আর সংখ্যা নাই। বাচাণ্ডি জাতীয়েরা এক দুই "অনেক" "খুব অনেক" এইরূপে গণনা করে। কুইন্সলাণ্ডেও এইরূপ। কামিলরয় ভাষায় এক, দুই, তিন, দুই-দুই, দুই-তিন, তিন-তিন, বলিয়া ছয় অবধি গণনা করা যায়। এস্থলে একথা বলা আবশ্যক যে, ভাষায় শব্দ না থাকিলেও ইসারা দ্বারা অধিক গণনা করিতে অসভ্য জাতিমাত্রেই শিক্ষা করিয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত বাচাণ্ডী জাতি পনর বলিতে হইলে তিনবার হাত দেখায়। ভিক্‌টোরিয়ার অসভ্যদিগের ভাষায় দুইয়ের অধিক সংখ্যাবাচক শব্দ নাই তথাপি তাহারা পাঁচ পর্য্যন্ত গণিতে পারে, এবং অঙ্গুলি, হস্ত ও মস্তকের অস্থি সাহায্যে তিথি গণনা করিতে পারে। কামস্কাটকার লোকেরা হস্ত পদের অঙ্গুলির সাহায্যে এক এক কুড়ি করিয়া এক শত পর্য্যন্ত গণিতে পারে। যে সকল জাতির ভাষায় বহুসংখ্যাবাচক শব্দ আছে, তাহারাও অঙ্গুলি সাহায্যে গণনা করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ ও য়ুরোপে ইহা সচরাচর দেখা যায়। দক্ষিণ-আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা ভাষা মধ্যে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকিলেও অঙ্গুলি দ্বারা সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। পাঁচটি ফল বলিতে হইলে তাহারা পাঁচটি আঙ্গুল দেখাইয়া ফল বলে। দুই হাত দেখাইয়া দশটি বলে। এবং দুই পায়ের উপর দুই হাত রাখিয়া কুড়িটি বলে। টমস্ক জাতি তিন বুঝাইতে হইলে তর্জ্জনী মধ্যমা ও কনিষ্ঠা দেখায়; অপর দুইটি অঙ্গুলি বদ্ধ করিয়া রাখে। ময়পুর জাতি বৃদ্ধাঙ্গুলি মধ্যমা ও তর্জ্জনী দেখাইয়া অপর দুইটি বদ্ধ করে। অশিক্ষিতদিগের

মধ্যে ভাষা সঙ্কুলান না হইলে, তাহারাই যে কেবল অঙ্গুলি সাহায্যে গণনা করে এমন নহে। সভ্যজাতি মাত্রেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ অঙ্গুলি সাহায্যে যে গণনা-প্রথা আরম্ভ হইয়াছে, সভ্যজাতির বালকদিগের প্রথম অঙ্ক শিক্ষার সময় দেখিলে সন্দেহ থাকে না। যাহারা কথা বলিতে পারে না, তাহারাও অঙ্গুলি সাহায্যে গণনা করিতে পারে। অঙ্গুলি বা হস্ত নির্দ্দেশ করিয়া গণনা-প্রথা আরম্ভ বলিয়া সংখ্যাবাচক শব্দগুলিও প্রায় সকল ভাষার হস্ত পদ বা অঙ্গুলিবাচক। নানা জাতির মধ্যে হস্ত অর্থে পাঁচ, দুই-হস্ত বা অর্দ্ধ মনুষ্য অর্থে দশ, মনুষ্য অর্থে কুড়ি। অরিনকো তটবর্ত্তী টমঙ্ক জাতি ছয় হইতে নয় পর্য্যন্ত বলিতে হইলে অন্য হস্তের একটি দুইটি তিনটি চারিটি এবং দশের অপেক্ষা অধিক বলিতে হইলে পায়ের একটী দুইটি ইত্যাদি বলিয়া থাকে। ইহাদের ভাষায় ইণ্ডিয়ান অর্থে কুড়ি এবং অন্য ইণ্ডিয়ানের হাতের একটি দুইটি ইত্যাদি অর্থে একবিংশতি, দ্বাবিংশতি; দুইটি ইণ্ডিয়ান অর্থে চল্লিশ ইত্যাদি। কেরেরি, টুপি, আবিপোন, কারিব ও মাগুয়া জাতির মধ্যেও এইরূপ। বগোটা দেশীয় সভ্য মইস্কা জাতির মধ্যেও এইরূপ। গ্রীনলাণ্ড দেশেও এইরূপ। যে সকল জাতি অপেক্ষাকৃত সভ্য হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও এই প্রাচীন প্রথার চিহ্ন কিয়ৎপরিমাণে বর্ত্তমান আছে। আজটেক, মেক্সিকান ও টেকি ইণ্ডিয়ানেরা পাঁচ বলিতে হইলে হস্ত বলে, দশ বলিতে হইলে অর্দ্ধ মনুষ্য বলে। তাস্মেনিয়ান ভাষায় পুগ্‌গন অর্থাৎ মনুষ্য অর্থে পাঁচ। পশ্চিম-অস্ট্রেলিয়ার অসভ্যদিগের মধ্যে ও মিলানেসিয়ানদিগের ভাষায় এইরূপ। মলয় পলিনেসিয়ান ভাষায় লিমা, টঙ্গান ভাষায় নিমা, মার্কুয়েসান ভাষায় ফিমা এবং মালাগাজি ভাষায় ডিমি অর্থে হস্ত, পাঁচ বুঝাইবার জন্য প্রয়োগ হয়। আফ্রিকার সর্ব্বত্র এইরূপ। জুলু জাতি এক, দুই তিন বলিয়া পাঁচ বলিতে হইলে এডিস্তান অর্থাৎ পূর্ণহস্ত বলে। লাব্রেডর দেশে তালেক অর্থাৎ হস্ত অর্থে পাঁচ, হস্ত ও পদ অর্থে কুড়ি। জামুকা ও মৌস্কা ইণ্ডিয়ান, জারুরো, অরবাক, কোরোডো ও গুয়ারাণী জাতির এবং বালি ও গায়েনাবাসিদিগের মধ্যে, বুগি, মান্ধার, এণ্ডি, মাকাসার, মাসক, বিমা, সেম্বোয়া ও মোঙ্গি ভাষায় এবং কুসা কাফির ও বেড্‌জুয়ান জাতিদিগের মধ্যেও এইরূপ। আমাদিগের ভাষায় পঞ্চ, পারস্য ভাষায় পেঞ্চা এবং গ্রীক ভাষায় পেণ্ট্‌ অর্থে হস্ত। "ত্রিপাদ দোষ" "ত্রিপাদ ভূমি" ইত্যাদি শব্দে দেখা যায়, পদ দ্বারা পরিমাণ করিবার প্রথা আমাদের দেশে এক সময় প্রচলিত ছিল। ইংরাজি পরিমাণ "ফুট" শব্দের অর্থ "পদ"। কাঠা ও গণ্ডা পরিমাণ পাঁচ

করিয়া হয়। হাতের পাঁচটী অঙ্গুলি হইতে যে এইরূপ পরিমাণ কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। পাঁচের গুণিতক দশমিক গণনা সর্ব্ব দেশে প্রচলিত। দশটী গণিয়া বালকেরা আবার এক দুই করিয়া আর দশটী গণনা করে। অসভ্যাবস্থায় সকল মনুষ্য এইরূপ করিত। সেই জন্য দশ পূর্ণ হইবার পরে একাদশ, দ্বাদশ, Twenty (দ্বিদশ) Thirty, (ত্রিদশ) Twenty one (দ্বিদশ এক) Twenty two (দ্বিদশ দুই) ইত্যাদি গণনা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। দশ কেবল পাঁচের গুণিতক, তিন চারি দিয়া ভাগ করিবার সুবিধা নাই, এই জন্য দশমিক গণনায় বিস্তর অসুবিধা ঘটে; তথাপি প্রাচীন প্রথার সার্ব্বজনিকতা কত মনোহর! Duodecimal বা দ্বিদ্বশ গণনা প্রথা উদ্ভাবিত হইয়া থাকিলেও এবং তাহার সৌকার্য্য সর্ব্বজনঅনুমোদিত হইলেও লোকে দ্বিদশ গণনা উপেক্ষা করিয়া পাঁচ পাঁচটী অঙ্গুলি গণনা সঞ্জাত দশমিক নিয়ম অনুসরণ করিতেছে।

অস্ফুটবুদ্ধি লোকেরা কি ভাষার অভাবে, কি স্মৃতি শক্তির দুর্ব্বলতা হেতু, কোথাও বা বুদ্ধি-হীনতার জন্য পাঁচটি, দশটি, এইরূপ কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা গণিত হইলে, একস্থানে তাহার এক একটি কাঁড়ি বা পুঁজি করে। একশত দ্বিশত, এককুড়ি দুকুড়ি, One Score, Two Score, Four Score Three, একদশ, ত্রিদশ ইত্যাদি গণনা সভ্য জাতি সম্মানিত ঐ প্রাচীন প্রথার সম্মা-সংজ্ঞাপক তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। আবার এক কুড়ি বা এক শত ইত্যাদি সংখ্যা গণিত হইলে সকল গুলি একত্র না রাখিয়া তাহাদিগের পরিবর্ত্তে এক একটি চিহ্ন রাখিলেও শেষে সেই কয়েকটি চিহ্ন হইতে সমস্ত সংখ্যা-সংজ্ঞাপক এক একটি চিহ্ন রাখিবার প্রথা হইতে, জপমালা প্রভৃতির সাহায্যে গণনা ক্রমে উদ্ভাবিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সভ্য জাতির ভাষার মধ্যে সংখ্যাবাচক শব্দ যথেষ্ট থাকিলেও সংখ্যা গণনা করিতে স্মৃতি-শক্তির সাহায্যের জন্য নানা কৌশল ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও চন্দ্র বলিলে এক, পক্ষ বলিলে দুই, কোথাও পৃথিবী বলিলে এক, বাহু বলিলে দুই, রাম বলিলে তিন, যুগ বলিলে চারি, ঈশ্বর বলিলে সাত, রাশি বলিলে দ্বাদশ, নখ বলিলে কুড়ি ইত্যাদি বুঝায়। এক, দুই, তিন প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দ গুলি নানা ভাষায় এইরূপে উদ্ভাবিত হইয়াছে। শব্দের ধাত্বর্থের সহিত সংখ্যার কোন যোগ নাই। কবিতা বা কল্পনা সাধারণতঃ সংখ্যাবাচক শব্দের প্রসূতি। শব্দ পর্য্যায়ে সংখ্যাবাচক শব্দের অর্থবোধক অপর শব্দ প্রায় মিলে না। মিলিলে গোলমাল হইবার সম্ভাবনা ছিল। বস্তুতঃ

সাধ করিয়া মানব জাতি সংখ্যাবাচক শব্দের ধাত্বর্থ বিস্মৃত হইয়াছে। সুতরাং তিন বলিলে কেন তিন বুঝাইবে, এখন আর জানিবার উপায় নাই। রাম বা চন্দ্র বলিলে তিন বা এক কেন বুঝায়, তাহা আমরা এখনও বিস্মৃত হই নাই। যদি তিন বা এক শব্দ ভাষা মধ্যে প্রচলিত না থাকিত, পূর্ব্ব হইতেই রাম বা চন্দ্র শব্দ প্রচলিত হইত, তবে উহাদিগের ধাত্বর্থ এত দিনে বিস্মৃত হইতাম। অস্ট্রেলিয়া ও মলক্কস দ্বীপবাসিদিগের মধ্যে সংখ্যাবাচক অধিক শব্দ না থাকিলেও এক জনের নয়টি পুত্র হইলে তাহার একটি স্বতন্ত্র নাম হয়। প্রতিবেশিদিগের বয়স অনুসারেও তাহাদের বিভিন্ন নাম দিয়া থাকে। পরে উহাদিগের নাম দ্বারা পাঁচ সাত আট নয় ইত্যাদি সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, টাহিটি দ্বীপে সর্দ্দারের নাম সাধারণ লোকে উচ্চারণ করে না, সুতরাং সর্দ্দারের নামে সংখ্যাবাচক কোন শব্দ থাকিলে সংখ্যাবাচক শব্দান্তর গ্রহণ করিতে হয়। পোলিনেশিয়া দ্বীপেও সংখ্যাবাচক শব্দ পরিবর্ত্তনের উদাহরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। পূর্ব্বে টাহিটি দ্বীপে বৌ বা মান বলিলে শত বা সহস্র বুঝাইত। এক্ষণে দ্বিশত বা দ্বিসহস্র বুঝায়। টঙ্গান ও মেওরি জাতি দশ দশটা করিয়া গণিত। এবং এক এক রাশিকে টেকু বলিত। এক্ষণে টেকু অর্থে দশ হইয়াছে। ঐরূপ দশটি রাশিকে তাহারা ফুকি বলিত। এক্ষণে টেকুহি অর্থে এক শত। যরুবা জাতির ভাষায় সূতা অর্থে চল্লিশ, কারণ এক একটি সূতায় চল্লিশটি কড়ি গাঁথিয়া রাখিত। এক একজন মাথায় ঐরূপ পঞ্চাশছড়া মালা পরিত বলিয়া দাহোমি জাতি মাথা বলিলে দুই সহস্র বুঝে। দাহোমির রাজা একবার যুদ্ধে দুইটী মাথা, কুড়ি গাছা সূতা ও কুড়ি কড়া কড়ি হারাইয়াছিলেন। ইহার অর্থ ৪৮২০টী মনুষ্য মারা গিয়াছিল। লাটিন ভাষায় পার অর্থে সমান, কপিউলা অর্থে বন্ধন, উহা হইতে ইংরাজী পেয়ার ও কপল শব্দের অর্থ দুইটী এবং এইরূপেই ইংরাজি স্কোর ও নচ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

যেরূপ সংখ্যা গণনা করিতে স্মৃতিশক্তির সাহায্যের জন্য বিভিন্ন শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ অন্যান্য বিষয় স্মরণ রাখিবার জন্য আঁচলে, রুমালে বা চাদরে গাঁট বাঁধিয়া রাখিবার প্রথা নানা দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলাণ্ডের কৃষক কন্যাগণ হাটে যাইবার সময় কেহ কিছু আনিতে বলিয়া দিলে, মনে পড়িবার জন্য রুমালে গিরা দিয়া লয়। দরায়ুস একটা দড়িতে ষাটটা গাঁট বাঁধিয়া আইওনিয় সর্দ্দারদিগকে বলিয়াছিলেন, প্রতিদিন এক একটা খুলিয়া সর্ব্বশেষটা খুলিবার দিন পর্য্যন্ত যদি তিনি প্রত্যাগত না হন, তবে তাহারা দেশে ফিরিয়া যাইতে

পারিবে। পেরুদ্বীপবাসী একজন সর্দ্দার জলপথে ভ্রমণ করিবার সময় যত গুলি জাহাজ দেখিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা ও নাম মনে রাখিবার জন্য এক গাছা দড়িতে গাঁট বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। লিখিতে শিখিবার পূর্ব্বে এইরূপ কোন কৌশলে ঘটনাবলি লিখিয়া রাখিবার প্রথা নানা দেশে প্রচলিত ছিল। পেরু দ্বীপবাসী আর একজন সর্দ্দার একটা দড়িতে প্রথম ত্রিশটা তাহার পর আর ছয়টা গাঁট বাঁধিয়াছিল। তাহার অর্থ এই যে, কাপ্তেন উইলসন ত্রিশ দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন, না হয় আরো ছয় দিন লাগিবে। এইরূপ প্রথা আসিয়া, আফ্রিকা, মেক্সিকো ও দক্ষিণ-আমেরিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকায় ইহার কিছু অধিক উন্নতি হইয়াছিল।

পেরুভাষায় ইহার নাম "কিপু"। একটা দড়িতে আর গোটাকতক দড়ি বাঁধিয়া সে গুলা বিভিন্ন বর্ণে চিত্রিত করিয়া এক একটাতে গাঁট দিয়া তাহারা বিস্তর হিসাব রাখিয়া থাকে। আবার এক একটা দড়ির শাখা প্রশাখা বাহির হয়। এমন একটা কিপু ওজনে চারি পাঁচ সের হয় এবং একটা কিপুর সমস্ত হিসাব রীতিমত লেখা হইলে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক হইতে পারে। লাল রঙ্গের দড়ির অর্থ সৈন্য, হরিত বর্ণের অর্থ স্বর্ণ, শ্বেত বর্ণের রৌপ্য, পীত বর্ণের শস্য, ইত্যাদি। টাকা কড়ির ও দ্রব্যাদির গণনা কিপু দ্বারা কিছু সহজ হইত। বাঙ্গালা দেশে দুধ দিয়া যাইবার সময় গোয়ালিনীরা দেয়ালে গোবরের দাগ দিয়া যায়। ইহারা এক তাড়া মাপ কাটিতে অনেক হিসাব রাখিতে পারে। চীন দেশেও কিপুর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মহাজনেরা দড়িতে গাঁট বাঁধিয়া আসল ও সুদের হিসাব রাখিত। একটা গিরার অর্থ দশ, উপরি উপরি দুইটার অর্থ শত, তিনটার অর্থ সহস্র ইত্যাদি। কিন্তু পাশাপাশি দুইটা গিরা হইলে তাহার অর্থ কুড়ি, দুইটা যুক্তগিরা পাশাপাশি থাকিলে দুই শত বুঝিতে হইবে। পেরু দেশের অন্তর্গত পুনা উপত্যকার কৃষকেরা অদ্যাপি কিপু ব্যবহার করে। তাহারা প্রথম ডাল দড়িতে বলদের, দ্বিতীয়তে গাভীর, তৃতীয়তে বাছুরের, চতুর্থতে কত শৃগাল মারা হইল, পঞ্চমে কত লবণ খরচ হইল, ষষ্ঠে কত গরু মরিয়া গেল, ইত্যাদি হিসাব রাখে। দ্বিতীয় ডালে আবার দুইটী শাখা থাকে, একটিতে দুধল গাভীর, অন্যটিতে যাহারা দুধ দেয় না তাহাদের হিসাব থাকে। এইরূপে ভেড়ার ডালে মেষ ছাগল ইত্যাদির হিসাব রাখা হয়। স্বতন্ত্র আর একটা কিপুতে কত দুধ, দধি, পনির বা পশম হইল তাহার হিসাব লিখা হয়। পূর্ব্বে সৈন্য সামন্তের হিসাব এইরূপ রাখা হইত। এক সারিতে গুলতিদার, এক

সারিতে তীরন্দার, এক সারিতে লাঠিয়াল আর এক শাখায় বর্শাওয়ালা, কত গুলি সেনাপতি, কতগুলি সামান্য সৈন্য ; কতগুলি যুদ্ধ হইল, কোন্ যুদ্ধে কত সৈন্য মরিল, কিপু দেখিলে সমস্ত বুঝা যাইত। রাজা মধ্যে অন্যান্য কর্ম্মচারীর ন্যায় কিপু লিখিবার স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী থাকিত। পেরু দেশে ইন্‌কা বংশের রাজত্ব কালে কিপু পড়িবার অধ্যাপক থাকিত ; তথাপি একজন লোককে বলিয়া দিতে হইত কোন্‌টা কিসের কিপু, নতুবা খাজনার কিপুর সহিত সৈন্যের কিপুর গোলমাল হইয়া যাইত। কিপু লিখিতে তাৎকালিক পেরুভিয়দের এমন ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে, আইন কানুন ও রাজ্যের প্রধান ঘটনা সকল কিপু দ্বারা গ্রন্থিত হইত। আমরা দেখিলে কিছুই বুঝিতে পারি না, কিন্তু অদ্যাপি পেরু দেশে লোক আছে যাহারা সহজে কিপুর অর্থ করিতে পারে। কিন্তু বিদেশীয়দিগকে তাহারা সে বিদ্যা শিখায় না। চীন, পূর্ব্বোপদ্বীপ, পলিনেশিয়া এবং হেয়াই দ্বীপে এক সময় কিপুর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বোধ হয় মেক্‌সিকো দেশেও এক সময় কিপুর ব্যবহার হইত।

লিখন-প্রথা প্রচলিত হইয়া কিপুর ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে। যখন ছন্দোবন্ধে ঘটনা সকল মুখস্থ করিয়া রাখিবার রীতি ছিল, তখন কিপু মানব-সমাজের সামান্য উপকার করে নাই। কেবল ভাষা সাহায্যে, জপমালায়, বা গিরা দিয়া গণনা করিতে হইলে অধিক সংখ্যা গণনা করা যায় না। লিখিবার প্রথা উদ্ভাবিত হইয়া অন্যান্য বিষয়ে যেমন উন্নতি হইয়াছে, সংখ্যা-সংজ্ঞাপক চিহ্নের উৎপত্তি হইয়া গণনার তেমনি সাহায্য হইয়াছে। আমাদের গোয়ালিনীরা এক সের দুধ দিলে একটা রেখা টানিয়া যায়, তাহার পর দিন দুইসের দিলে সেই রেখাটির পার্শ্বে আর দুইটি রেখা চিহ্ন করে। এইখানে সংখ্যাবাচক চিহ্নের আরম্ভ। সভ্য রোমবাসিগণ এইরূপে এক দুই তিন চারি লিখিয়া পাঁচ লিখিবার সময় একটি স্বতন্ত্র চিহ্ন দিত এবং পূর্ব্বকথিত কারণ বশতঃ পুনরায় পাঁচের পৃষ্ঠে একটি দুইটি রেখা টানিয়া ছয় সাত ইত্যাদি লিখিত। দশের জন্য আর একটি স্বতন্ত্র চিহ্ন উদ্ভাবন করিয়া উনপঞ্চাশ পর্য্যন্ত লিখিতে পারিত। পঞ্চাশ, শত ও সহস্রের জন্যও এক একটি স্বতন্ত্র চিহ্ন ছিল। এই অমার্জ্জিত উপায়ে তাহারা সভ্য সমাজের প্রয়োজনীয় সকল সংখ্যা লিখিতে পারিত। ইংরাজদিগের মধ্যে সেই সকল চিহ্ন অদ্যাপি কখন কখন ব্যবহৃত হয়। ঘটিকাযন্ত্রে সেই সকল চিহ্ন-ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। কিন্তু সভ্যতার যত বৃদ্ধি হইয়াছে, লোকে সংখ্যাবাচক চিহ্ন সকলের তত উন্নতি করিয়া তুলিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশে ব্যবহৃত সংখ্যাবাচক চিহ্ন সকল অনেকে সংস্কৃতভাষাপ্রচলিত চিহ্ন সকলের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করেন। অনেক সময় এক একটী শব্দের সংক্ষেপে যেমন উপসর্গ ও প্রত্যয়াদির উদ্ভব হয়, গণিতশাস্ত্রে প্রচলিত কোন কোন চিহ্নেরও যে এইরূপে উৎপত্তি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কোন সংখ্যার বর্গ বুঝাইতে হইলে ইংরাজি ভাষায় সেই সংখ্যার উপর একটী দুইয়ের চিহ্ন দিতে হয়। পূর্ব্বে সেই স্থলে বর্গবাচক Square শব্দ লিখা থাকিত। ক্রমে অন্যান্য অক্ষর ছাড়িয়া শব্দটীর কেবল প্রথম অক্ষরটী লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হয়। অনেকে অনুমান করেন এই প্রথম অক্ষরের অপভ্রংশ হইয়া বর্ত্তমান চিহ্নটী জন্মিয়াছে। কোন সংখ্যার বর্গমূল বুঝাইতে হইলে এখন ইংরাজিতে যে চিহ্ন ব্যবহার হয়, পূর্ব্বে তাহার পরিবর্ত্তে বর্গমূলবাচক Root শব্দ ব্যবহৃত হইত। এই শব্দটির প্রথম অক্ষরটি যে, বর্গমূল-বাচক বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। এই সকল কারণ হইতে অনুমান হয়, চিহ্নের অপভ্রংশ হইয়া নূতন চিহ্নসৃষ্টি সাধারণ হইলেও শব্দের সংক্ষেপে চিহ্নের উৎপত্তি অসাধারণ নহে। এক শব্দের এ হইতে ১, দুইয়ের দ হইতে ২, তিনের ত হইতে ৩, চারির চ হইতে ৪, পাঁচের প হইতে ৫, ষষ্ঠের ষ হইতে ৬, সাতের স হইতে ৭, আটের ট হইতে ৮, নয়ের ন হইতে ৯, হওয়া বিচিত্র নহে। কেবল রেখা হইতে সংখ্যাবাচক চিহ্নের অপভ্রংশ হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া বিধেয় নহে। এইরূপে সংখ্যাবাচক শব্দ সংক্ষিপ্ত হইয়া কোন কোন চিহ্ন উৎপন্ন হইয়াছে কি না অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। আরবী ভাষায় সংখ্যাবাচক কোন কোন শব্দ সংখ্যাবাচক চিহ্নরূপে পরিণত হইয়াছে দেখিলেই বুঝা যায়।

সংখ্যা গণনার ন্যায় পরিমাণকার্য্য প্রথমতঃ অঙ্গুলি, হস্ত ও পদের সাহায্যে সম্পন্ন হইত। অদ্যাপি সেই প্রাচীন প্রথা অধিকাংশ দেশে প্রচলিত। সভ্যতর জাতি সকল পরিমাণ করিবার জন্য নূতন নূতন মানদণ্ডের উদ্ভাবন করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু ঐ দণ্ড সকলেরও হস্ত পদ অঙ্গুলিবাচক শব্দের পর্য্যায়ে নামকরণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ কি সংখ্যাগণনা, কি পরিমাণক্রিয়া, মনুষ্য আপন অঙ্গসংখ্যা ও অঙ্গপরিমাণে প্রথমতঃ ঐ সকল কার্য্য সমাধা করিত, ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও সমাজতত্ত্ববিদ্গণের সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রস্তরব্যবহারযুগে লিখন প্রথা প্রচলিত থাকিবার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বোধ হয়, পিত্তলব্যবহার যুগেও অক্ষরের উদ্ভাবন না হইয়া থাকিবে। অদ্যাপি বন্য সমাজে লিখিবার রীতি নাই। অক্ষর-

দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিবার কৌশল কিরূপে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, জানিতে স্বভাবতঃই ঔৎসুক্য জন্মে।

তাম্রপাত্রে রক্তচন্দন দিয়া তাহার উপর জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া পুষ্পজলে পূজা করিতে অনেকে দেখিয়াছেন—সে চিত্রটী কি? অভীষ্টদেবতার ইঙ্গিতমাত্র—দেবতার মূর্ত্তি নহে। কিপুর গাঁট যেমন ঘটনাবিশেষের ইসারামাত্র, জ্যামিতিক চিত্রও তেমনই দেবতাবিশেষের ইসারামাত্র। সেই চিহ্নটি দেখিলেই সেই দেবতাটি বুঝা গেল। রাম তিনের জ্ঞাপক, লিঙ্গ পুরুষের জ্ঞাপক, যোনি প্রকৃতির জ্ঞাপক, বস্ত্রাঞ্চলে বন্ধনী কর্ত্তব্যবিশেষের জ্ঞাপক, অক্ষর শব্দবিশেষের জ্ঞাপক। যেমন একের অর্থ এক সাধারণ অভিমতিসম্মত, তেমনি বর্ণবিশেষ যে স্বরবিশেষের জ্ঞাপক, সেও সাধারণ অভিমতিসম্মত। বর্ণবিশেষের সহিত স্বরবিশেষের কোন সংস্রব নাই—কিন্তু স্বরবিশেষ বুঝাইবার জন্য ইসারার মত বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ইঙ্গিতে সংক্ষেপে একটী বিষয় জ্ঞাপন করিতে কিয়ৎপরিমাণে মানসিক বিকাশের প্রয়োজন করে। সে পরিমাণে মানসিক বিকাশের পূর্ব্বে, অপকৃষ্টতর কোন কৌশলে, দূরস্থ লোককে মনোভাব বা ঘটনা-বিশেষ জ্ঞাপন করিবার বিধি ছিল। "বর্ণের" অর্থ রঙ্গ। রঙ্গদিয়া চিত্র করিয়া পূর্ব্বে মনোগত প্রকাশিত হইত। সেই চিত্রের সূক্ষ্মতর, উন্নততর সন্তান বর্ণ, এখনও পূর্ব্বপুরুষের যশ ঘোষণা করিতেছে। যাহারা চর্ম্ম, বা অস্ত্র, বা দেহের উপর জ্যামিতিক রেখা, বা বৃত্ত বা পশুপক্ষীর মূর্ত্তি সুন্দর অঙ্কিত করিতে পারে, তাহারা ঘটনাবিশেষ যে চিত্র করিতে সক্ষম হইবে, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। একটী মস্তকশূন্য মনুষ্য আঁকিলে একটী মনুষ্য হত হইয়াছে, ইহা বালকেও বুঝিতে পারে। শিকার বা যুদ্ধবিশেষ চিত্র করিয়া জ্ঞাপন করিতে অনেক অসভ্য জাতি জানে। যখন কলম্বস তিন খানি জাহাজ লইয়া আমেরিকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন,—জাহাজ অদৃষ্টপূর্ব্ব পদার্থ, সহজেই অসভ্যদিগকে চমকিত করিল। তাহারা মুণ্ডিত মস্তকে জাহাজ আঁকিয়া, সমুদ্রের নীল জল আঁকিয়া, দূরস্থ সর্দ্দারকে জ্ঞাত করিল, এইরূপ পদার্থে আরোহণ করিয়া সমুদ্রের অপর দিক হইতে নূতন লোক আসিয়াছে। আমাদিগের পূজার সময় বীজ চিত্র করিবার ন্যায় চিত্রাঙ্কন প্রথা নানাদেশীয় ওঝা ও যাদুকরের মধ্যে প্রচলিত আছে। যাদুকরদিগের মন্ত্র শিখিতে হইলে, প্রায় মুখে মুখে শিখিতে হয়; ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিলে, কিপুর বন্ধনীর ন্যায় চিত্রবিশেষের সাহায্যে, স্মরণ করিতে হয়। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যাদুকরেরা

মন্ত্রের ছন্দ মনে পড়িবার জন্য ভুজপত্রে বা লাঠির গায়ে, চিত্রবিশেষ অঙ্কিত করিয়া রাখে। সে চিত্র তাহারই স্মৃতির সাহায্যকারী, অন্যে তাহার কিছুই বুঝে না। একটী মনুষ্যের বুকের উপর দুইটী চিহ্ন এবং পায়ের উপর চারিটী চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে,

নিরম্বু দিবস দুই উপবাস দিও,
চারি দিন বসে বসে ঘরেতে রহিও।

চিত্র করিয়া পত্র লেখা, সকল দেশীয় অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। কি উত্তর, কি দক্ষিণ আমেরিকা, কি সাইবেরিয়া, কি অস্ট্রেলিয়া, সর্ব্বত্র একই রূপ। যে জাতির পত্র, :সেই জাতি বুঝে; আমরা তাহা পড়িয়া কিছুমাত্র বুঝিতে পারি না। কোথাও কোথাও বা গিরিগাত্রে একটি ঈগল্ বা শশক অঙ্কিত দেখা যায়। বোধ হয় উহারা যাহাদের সন্তক, অর্থাৎ ঈগল বা শশক-বংশীয় কোন লোক সেখানে আসিয়া থাকিবে। আমরা যেরূপ স্থলে আপন নাম খোদিত করিয়া আসিতাম, তাহারা সেই স্থলে আপন সন্তক খোদিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। মেক্সিকোদেশে এইরূপ সন্তক চিত্র অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এস্কিমো ও রেড্‌স্কিনজাতি চিত্র লেখায় বেশ সুপটু। কারবার সাহেব চীপেবাজাতির এক ব্যক্তিকে পথপ্রদর্শক করিয়া বনমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সময় নৌদোবেশী নামে আর এক জাতির সহিত চীপেবাদিগের মনান্তর ছিল। সহসা শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে আক্রমণ না করে, এই জন্য পথ-দর্শক, নিকটস্থ একটি বৃক্ষের ছাল লইয়া, ভল্লুকের চর্ব্বি ও কয়লা দিয়া তাহার উপর বিপক্ষ দেশের একটি চিত্র আঁকিয়া, তাহার বামপার্শ্বে চর্ম্মবস্ত্রে আবৃত একটি নৌদোবেশী লোকের মূর্ত্তি বসাইল। তাহার সম্মুখে একটি হরিণ আঁকিয়া হরিণের মুখ হইতে সেই লোকটির মুখ পর্য্যন্ত, একটি রেখা টানিল। হরিণমূর্ত্তি চীপেবা জাতির সন্তক। সেই মূর্ত্তিদ্বয়ের আরো বামদিকে, একটি নদীর উপর একখানি নৌকা বসাইয়া তাহাতে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি, এবং শান্তিসংজ্ঞাপক হুকা প্রভৃতি চিত্র করিল। মনুষ্যদ্বয়ের একজনের মাথায় টুপী ও একজনের মাথায় রুমাল বাঁধিয়া দিল। কারবার সাহেবের সঙ্গে একজন ফরাসীদেশীয় লোক ছিল। চিত্রখানির অর্থ এই,—বিপক্ষদেশীয় কতকগুলি লোকের অনুরোধ অনুসারে, চীপেবাজাতির একজন লোক, একজন ইংরাজ ও একজন ফরাসীর সঙ্গে নৌদোবেশীদেশে নৌকা করিয়া যাইতেছে। চীপেবাজাতি শত্রু হইলেও

নৌকারোহীগণ বন্ধুভাবে যাইতেছে। সুতরাং তাহাদিগকে আক্রমণ করা উচিত নহে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্সের প্রেসিডেণ্টের নিকট, অসভ্য ইণ্ডিয়ানেরা একখানি দরখাস্ত দিয়াছিল। তাহাতে প্রথমে একটি সারসপক্ষীর চিত্র ছিল; তাহার পশ্চাতে ইন্দুর, বিড়াল, মৎস্য প্রভৃতি আর ছয় খানি চিত্র ছিল। সর্ব্বশেষে কয়েকটি জলাশয় অঙ্কিত হইয়াছিল। জন্তুগুলির চক্ষু ও হৃদয়, রেখাদ্বারা সারসের চক্ষু ও হৃদয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। সারসের চক্ষু হইতে আর একটি রেখা জলাশয় পর্য্যন্ত টানা হইয়াছিল। এবং আর একটি রেখা প্রেসিডেণ্টের দিকে লম্বিত ছিল। সেই সময় কয়েকটি হ্রদ লইয়া য়ুনাইটেড ষ্টেট্সের সহিত ইণ্ডিয়ানদিগের বিবাদ চলিতেছিল। তখন ইণ্ডিয়ান-দিগের যে সর্দ্দার ছিল, সে সারসগোত্র সম্ভূত অর্থাৎ তাহার সম্তক সারস। সেই জাতীয় অন্যান্য সর্দ্দারদিগের সম্তক ইন্দুর, বিড়াল, মৎস্য ইত্যাদি ছিল। আবেদনপত্রের মর্ম্ম এই যে, প্রধান সর্দ্দারের সহিত একদৃষ্টি ও একহৃদয় হইয়া বিভিন্নবংশীয় লোকেরা প্রেসিডেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছে যে, প্রেসিডেণ্ট হ্রদ কয়েকটির অধিকার সর্দ্দারকে ছাড়িয়া দেন, উহা তাঁহারই সম্পত্তি। য়ুরোপেও গিরিগাত্রে খোদিত নানা প্রকার প্রাচীন চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অক্ষর সংযোজন করিয়া, মনোভাব প্রকাশ করিবার কৌশল উদ্ভাবিত হইবার পূর্ব্বে, চিত্রদ্বারা মনোভাব এক সময়ে যে সকল দেশে প্রকাশ করিবার রীতি ছিল, সে বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

চিত্রদ্বারা মনোগত অভিপ্রায় কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে পারা যাইলেও, সকল কথা সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ করা যায় না। বর্ণমালার বর্ণ সকল এখন এক একটী শব্দসংজ্ঞাপক, চিত্রগুলি এক একটী পদার্থ সংজ্ঞাপক। সুতরাং এখন যে কোন কথা বলিতে হইলে, অর্থযুক্ত বা নিরর্থক, স্বদেশীয় ভাষাগত বা বিদেশীয় প্রাচীন-ব্যবহৃত বা সম্পূর্ণ নূতন বর্ণমালার কয়েকটী বর্ণ একত্র সমাবেশ করিলেই প্রকাশ করা যাইতে পারে। মনে কর বাঙ্গালা ভাষায় ফুচুফু বলিয়া কোন শব্দ নাই, শব্দটীর অর্থ কি তাহাও আমরা জানি না। কিন্তু কোন কারণবশতঃ শব্দ লিখিবার আবশ্যক হইল। প্রাচীন চিত্রপ্রথা অদ্যাপি বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকিলে, আমরা কোন চিত্র দ্বারা উহা প্রকাশ করিতে পারিতাম না; কিন্তু শব্দসংজ্ঞাপক বর্ণমালার উদ্ভাবন হওয়াতে, অনায়াসে এখন লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি। সুতরাং চিত্রাঙ্কনে লিখন অপেক্ষা, বর্ণমালার সাহায্যে

মনোভাব প্রকাশ করিবার উপায় হওয়াতে, মানব সমাজের যে বিস্তর উন্নতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

চিত্রদ্বারা পদার্থ সকল সহজেই জ্ঞাপন করা যাইতে পারে; অথচ শব্দপ্রকাশ একবারে যে হয় না, তাহাও নহে। পূর্ব্বে সমেত প্রদেশের সভাপতির নিকট প্রদত্ত যে আবেদনপত্রের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাতেই ইহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। সারস একটি পক্ষী, হরিণ একটি জন্তু। সারস বা পক্ষী চিত্র করিয়া আবেদনকারীগণ যদি একটি পক্ষী বা একটি জন্তুর কথা বলিত, তাহা হইলে চিত্রদ্বয় কেবল পদার্থসংজ্ঞাপক হইত। কিন্তু একটি পক্ষী বা জন্তু চিত্র করিয়া তাহারা তত্তৎ নামধেয় মনুষ্য বিশেষ বুঝাইয়াছে। সারস পক্ষী বা হরিণ, পশু না বুঝিয়া সভাসদেরা মনুষ্যদ্বয়ের নামের শব্দ দুইটি বুঝিয়াছে। সুতরাং চিত্রদ্বয়ে শব্দদ্বয় প্রকাশ করিয়াছে। মনে কর কাক উড়িতেছে, মনুষ্য চলিতেছে, গোপাল হরিণ শিকার করিতেছে, ইত্যাদি বুঝাইতে হইলে, ক্রিয়া-বাচক শব্দগুলি প্রকাশ করিবার জন্য কয়েকটি চিত্রের আবশ্যক হয়। কাক অঙ্কিত করিয়া তাহার পাখাদ্বয় বিস্তারিত করিয়া দিলে, মনুষ্য অঙ্কিত করিয়া তাহার চরণে একটি চিহ্ন দিলে, বা সম্মুখে পদচিহ্ন অঙ্কিত করিলে, গোপালের চিত্র করিয়া হস্তে ধনুর্ব্বাণ দিয়া সম্মুখে হরিণ আঁকিয়া দিলে, কয়েকটি ভাব সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন মিসরবাসিগণ এইরূপ চিত্রদ্বারা পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, মনের কথা লিখিয়া জানাইত;—চীনবাসিগণ অদ্যাপি এইরূপ লিখন ব্যবহার করিতেছে। এই প্রকার চিত্রলিপির একাংশ পদার্থসংজ্ঞাপক, অপরাংশ শব্দসংজ্ঞাপক। প্রথমোক্ত অংশ দ্বারা শেষোক্ত শব্দের অর্থবোধ জন্মে। এইরূপ লিখাকে হায়রোগ্লিফিক্ (Hieroglyphic) বলে। 'সূর্য্যদেবতা শত্রুগণের বিরুদ্ধে আসিতেছেন', এই কথাটি প্রাচীন মিসরবাসীগণ এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছিল। প্রথমে একটি সকেন্দ্রবৃত্ত—তাহার অর্থ সূর্য্য; তাহার পর একখানি কুঠার;—দেবত্বসংজ্ঞাপক, তাহার ইংরাজি A অক্ষরের কর্ণশূন্য চিহ্নের মত একটি চিহ্ন; দেখিলেই দুইটি পা বলিয়া বোধ হয়।—অর্থ আসিতেছে বা যাইতেছে। তাহার পর একটি উপবৃত্ত—অর্থ বিরুদ্ধে, তাহার পর ধনুর্ব্বাণ হস্তে একটি মনুষ্য-চিত্র। মনুষ্যটি তীর মারিবার উপক্রম করিতেছে, সুতরাং সে যে শত্রু সহজেই বুঝা যায়। তাহার পৃষ্ঠভাগে তিনটি লম্ব রেখা,—বহু বচন সংজ্ঞাপক চিহ্ন। চীনদেশপ্রচলিত অক্ষরসকলও কিয়ৎ অংশে শব্দ-সংজ্ঞাপক, কিয়ৎ অংশে অর্থদ্যোতক। মনে কর "চাউ" এই শব্দসংজ্ঞাপক

একটি বর্ণ চীন বর্ণমালায় পাওয়া যায়। "চাউ" এই শব্দের একটি অর্থ জাহাজ। এতদ্ভিন্ন চঞ্চল প্রভা, জলপাত্র, বচনবাগীশতা প্রভৃতি আরো কয়েকটি অর্থ আছে। সুতরাং "চাউ" বর্ণ প্রয়োগে কোন্ অর্থটি বুঝিতে হইবে জানিবার জন্য উপায়ন্তর অবলম্বন করিতে হয়। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক, আমাদের ভাষায় দু তিনটি বর্ণ একত্র করিয়া যেমন একটি শব্দ প্রকাশ করিতে হয়, চীন ভাষায় সেরূপ নহে; সেখানে একটি বর্ণে একটি পূর্ণ শব্দ প্রকাশিত হয়। যাহা হউক, অর্থবোধের জন্য মিসরদেশের ন্যায় এখানেও চিহ্নান্তর প্রয়োগ হয়। যে বর্ণে জাহাজ বুঝায়, তাহার অব্যবহিত বাম পার্শ্বে দীপশিখার ন্যায় কয়েকটি রেখা যোগ করিলে, "চাউ" শব্দে, দীপশিখার ন্যায় অস্থির প্রভা বুঝা যায়; কিন্তু ঐ কয়েকটি রেখার পরিবর্ত্তে, জল বিন্দুর ন্যায় কয়েকটি বিন্দু বসাইলে জলস্থালী অর্থ হয়; এবং একটি জিহ্বা অঙ্কিত করিলে বচনবহুলতা বুঝা যায়। নিরবচ্ছিন্ন চিত্রমালা একমাত্র পদার্থসংজ্ঞাপক। মিসরদেশীয় হায়রোগ্লিফিক্ এবং চীনদেশীয় বর্ণমালা, পদার্থ ও শব্দ উভয় সংজ্ঞাপক।

মিসরদেশীয় চিত্র লিখন-প্রথা ফিনিসীয় বণিকগণের হস্তে রূপান্তর লাভ করে। মিসরবাসিগণ আপনাদিগের ব্যবহৃত প্রথার অসম্পূর্ণতা ও অমার্জ্জিতাবস্থা বুঝিতে পারিয়াও পিতৃ পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাচীন প্রথা, ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত পুরাতন রীতির, বিপর্য্যয় করিতে সাহস করে নাই। সময়-ধবলিত প্রাচীন রীতিনীতি অনেকের নিকট কথঞ্চিৎ দেবত্বপ্রাপ্তরূপে প্রতীয়মান হয়,—সুতরাং মিসরবাসিদিগের কেহ কেহ লিখনপ্রথার উন্নতি করিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও, কার্য্যতঃ তাহা সিদ্ধ করিতে কেহই সাহস করে নাই। ফিনিসীয় বণিকগণ ব্যবসায় লোভে, মিসরদেশে আসিয়া তাহাদিগের লিখন-প্রথা শিক্ষা করিয়াছিল। বর্ণ কেবল শব্দদ্যোতক হইলেই লিখনকার্য্য সুসিদ্ধ হইবে, তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল,—পরিবর্ত্তন করিতে তাহাদের কোন সংকোচেরও কারণ ছিল না—সুতরাং যে অংশ পদার্থসংজ্ঞাপক ছিল, অনায়াসে তাহারা সে অংশ উঠাইয়া দিল। এক আঘাতে অমার্জ্জিত প্রাচীন হায়রোগ্লিফিক্ বর্ণমালা শব্দদ্যোতক বর্ণমালায় পরিণত হইয়া সভ্য জগতের সকল প্রকার মনোভাব, শব্দরূপে লিখিয়া জানাইবার উপায় করিয়া দিল। ফিনিসিয় বর্ণমালা হইতে য়ুরোপ এবং আসিয়ার অধিকাংশ দেশে প্রচলিত বর্ণমালা গঠিত হইয়াছে। আবার ফিনিসীয়েরা যে কৌশলে মিসর চিত্রমালার উন্নতি সাধন করিয়াছিল, ঠিক সেই উপায়ে জাপানবাসিগণ চীনদেশীয় বর্ণমালার উন্নতি করিয়াছে। জাপান

ও চীন বর্ণমালার এই মাত্র প্রভেদ যে, জাপান বর্ণ সকলে অর্থদ্যোতক কোন নূতন চিহ্ন সংযোজিত হয় না। খ্রীষ্ট জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, মিসরদেশে হায়রোগ্লিফিক্ লিখন-প্রথা প্রচলিত ছিল। বোধ হয়, খৃষ্ট জন্মের দশ শত বৎসর পূর্ব্বে, শব্দদ্যোতক বর্ণমালার উদ্ভাবন হইয়া থাকিবে।

সভ্য ও অসভ্য নির্ণয় করিবার মানদণ্ড লিখনপ্রথা। বনবাসী বর্ব্বরেরা যাহা শিখে, ভাবী বংশাবলীর উপকারার্থ তাহা লিপিবদ্ধ করিতে জানে না। সময়ান্তরে আপনা আপনি স্মরণ করিবার জন্য স্মৃতি-শক্তির প্রখরতার উপর তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। যেখানে অসভ্য বাস, সেখানেই লিখন-প্রথার অভাব; সভ্য সমাজমাত্রেই বর্ণমালা প্রচারিত আছে। কি আশ্চর্য্য! যে অক্ষরে ব্রাহ্মণের বেদ, মুসলমানের কোরাণ, যিহুদী ও খৃষ্টানদিগের বাইবেল লিখিত হইতেছে, সে অক্ষর সকলের সাধারণ জন্মভূমি, নীলনদ-প্রবাহিত প্রাচীন মিসরদেশ।

আবার মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভব হইয়া লিখিবার কত সাহায্য হইয়াছে, এখানে তাহা বিশেষরূপে বলিবার আবশ্যক নাই। সংক্ষেপে এই বলিলেই হইবে, অঙ্গুরীয়কে বা মোহরে কালী মাখাইয়া ছাপ তুলিবার প্রথা, অতি প্রাচীন কাল হইতে নানাদেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পুস্তকাদি মুদ্রিত করিবার জন্য মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি চীনদেশে প্রথম হয়। চীনবাসিগণ কাষ্ঠফলকে অক্ষর খোদিত করিয়া ছাপ তুলিত। য়ুরোপীয়েরা স্বতন্ত্র অক্ষর সংযোজিত করিয়া পুস্তকাদি মুদ্রিত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। কোথায় বৃক্ষ বল্কল বা তরুপত্রে চিত্রাঙ্কন, আর কোথায় একদিনে সহস্র সহস্র পুস্তকের কোটী কোটী অক্ষরে মুদ্রাঙ্কন!

# নবম পল্লব।

মনুষ্য যখন একাকী বাস করিত, তখন ভাষার আবশ্যকতা হয় নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি, বন্য পশুর ন্যায় স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মানবসন্তান, অন্যের সহিত প্রথমাবস্থায় কোন সংস্রব রাখিত না,—প্রত্যেকে একাকী ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিত। তখন ভাষার সৃষ্টি হয় নাই। দুইজন একত্র হইলে, পরস্পরের সহানুভূতি বা সাহায্য পাইবার আশায়, পরস্পরের নিকট মনোভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়, আবশ্যকতা বোধ হয়। একাকী বাস করিবার অবস্থায় সে আবশ্যকতা থাকে না। মনোভাব প্রকাশ করিবার যন্ত্রকে ভাষা বলে। সুতরাং ভাষা সমাজের সামগ্রী। কারু কার্য্য, চিত্রবিদ্যা ও লিখনের ন্যায়, ভাষাও সমাজের উন্নতির সহিত উন্নত হয়। ভাষা সমাজের সৃষ্ট, ভাষা চিন্তা-প্রকাশক, ভাষা আবার চিন্তার জন্মদাতা।

ভাষা মনের ভাব প্রকাশ করে, সুতরাং অর্থশূন্য ভাষা হইতে পারে না। পাখীর সঙ্গীতের অর্থ নাই, সুতরাং উহা ভাষা নহে। তাই বলিয়া এ কথা বলিতেছি না, মনুষ্য ভিন্ন আর কাহারও মনোভাব প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। পশুপক্ষীগণের কাকু অনেক সময় মনোভাবব্যঞ্জক। স্বজাতীয় অন্য জীবেরা সে শব্দ শুনিয়া তাহার অথ বুঝিতে পারে। তখন, কখন বা প্রাণভয়ে পলায়ন করে। কুকুরের স্বর শুনিয়া গৃহস্থ বুঝিতে পারে, অন্য কোন জন্তু আসিয়াছে বা অপরিচিত মনুষ্য আসিয়াছে। কুকুর যখন প্রভুকে দেখিয়া লেজ নাড়িতে থাকে, দেখিয়াই তাহার কৃতজ্ঞতা ও স্নেহ কে না বুঝিতে পারে?

কোন কোন জাতীয় বানরদিগের মধ্যে এক প্রকার অনুন্নত ভাষা প্রচলিত আছে। এক জন শব্দ বিশেষ উচ্চারণ করিলে, অন্যেরা তাহার অর্থ বুঝে, এবং তদনুরূপ কার্য্য করে। মনুষ্যভাষাও প্রথমাবস্থায় বড় অস্ফুট। বুসমান দিগের মনোভাবপ্রকাশক টিক টিক শব্দ, ও ঐ পূর্ব্বোক্ত বানরীয় ভাষার মধ্যে প্রভেদ অল্প।

এক সময়ে মনুষ্য সর্ব্ব বিষয়ে বিভিন্ন, স্বতন্ত্র জীব বলিয়া পরিগণিত হইত। কি আকার, কি বুদ্ধি, কোন বিষয়ে মনুষ্যের সহিত অন্য জীবের একতন্ত্রতা স্বীকৃত হইত না। ক্রমে বিজ্ঞানশাস্ত্রের যত উন্নতি হইতে লাগিল, পশুআঁকার ও পশুবুদ্ধির সহিত মানবাকার ও মানববুদ্ধির যত তুলনা হইতে লাগিল, ততই

উভয় আকার উভয় বুদ্ধির একজাতীয়ত্তা প্রতিপন্ন হইতে লাগিল। অবশেষে পণ্ডিতগণ স্থির করিলেন, উভয় আকার ও উভয় বুদ্ধির স্বতন্ত্রতা নাই,—উভয়ে এক জাতীয়। কেবল মনুষ্য-আকার ও মনুষ্য-বুদ্ধি, পশু-আকার ও পশুবুদ্ধি অপেক্ষা উন্নততর, স্ফুটতর; উভয়ের প্রকারে বিভিন্নতা নাই, কেবল পরিমাণে বিভিন্নতা আছে। *

এই মত যখন সাধারণে প্রচারিত হয়, তখনও ভাষা সম্বন্ধে মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করিতে কেহ সাহস করে নাই। ভাষা ঈশ্বরদত্ত শক্তি, একমাত্র মনুষ্য ঐ শক্তির অধিকারী। পশুপক্ষীর মনোভাব নাই, মনোভাব থাকিলেও প্রকাশ করিবার শক্তি নাই, শক্তি থাকিলেও তাহা মনুষ্য-শক্তির অনুরূপ নহে, ইহাই সকলের মত ছিল। তুলনায় ভাষা-শক্তির আলোচনা ইদানী য়ুরোপে আরম্ভ হইয়াছে। শব্দশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ অদ্যাপি একমত হইতে পারেন নাই —সুতরাং অধিকাংশ লোকের মধ্যে ঐ মত অদ্যাপি প্রচলিত দেখিলে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। যাহা হউক, আমাদের বুদ্ধিতে যে মত যুক্তিযুক্ত বোধ হইয়াছে, আমরা তাহাই বিবৃত করিতেছি।

মনোভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ঈশ্বরদত্ত হইলেও হস্তপদ চালন, গৃহ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি ক্ষমতার মত ঐ ক্ষমতাও স্ফুট হইতে সময় ও চালনার আবশ্যক। আজিও শিশুগণ জন্মগ্রহণ করিয়াই কথা কহে না—প্রথম মনুষ্যেরাও কথা কহিতে জানিত না। শিশু কিছুদিন দর্শন ও শ্রবণ-শক্তি পরিচালন করিয়া অন্যে কিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে, তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকে; ক্রমে যেরূপ শিক্ষা করে সেইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। হস্তপদ নাড়িবার মত জন্মিয়া অবধি শিশু বাক্‌যন্ত্রেরও চালনা করে—ক্রমে বাক্‌যন্ত্র তাহার আয়ত্ত হইলে বাক্য দ্বারা মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। যুবকেরা বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে যেরূপ কষ্ট, যেরূপ অধ্যবসায় স্বীকার করে, বালকেরা সেইরূপ করিয়া থাকে। প্রথম মনুষ্যেরাও সেইরূপ করিত। ইতর বিশেষ এই, প্রথম মনুষ্যদিগকে সকলই আপনা আপনি প্রস্তুত করিয়া লইতে হইয়াছিল। এখন শিশু জন্মকালে কিয়ৎ পরিমাণে পিতৃশক্তিও লাভ করিয়া থাকে এবং যাহা শিখিতে হয়, তাহা প্রস্তুত পাইয়া থাকে। যে মাধ্যাকর্ষণ প্রমাণ করিতে নিউটনকে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, কত পরীক্ষা, কত চর্চ্চা

* মানব প্রকৃতির প্রথম খণ্ডে এই সকল বৈজ্ঞানিক কথার বিচার করা হইয়াছে।

করিতে হইয়াছিল, এখন শিশুগণ দশম বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তাহার জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া থাকে।

পিপীলিকাগণ কিয়ৎ পরিমাণে সামাজিক জীব। একটী পিপীলিকা কোথায়ও কোন খাদ্য দ্রব্যের সন্ধান পাইলে, সে দ্রব্যের ভার বা পরিমাণ যদি অধিক হয়, অর্থাৎ ভাণ্ডারে লইয়া যাইতে যদি অনেকের সাহায্য আবশ্যক হয়, সে গৃহে গিয়া অন্যদিগকে সংবাদ দেয়। সে কিরূপে আপন মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, অদ্যাপি নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় নাই। বোধ হয়, পিপীলিকাগণের শ্রবণ শক্তি নাই—অন্ততঃ মনুষ্য বাক্‌যন্ত্রে বা অন্য পদার্থ আঘাতে যে শব্দ (অতি গুরু বা অতি লঘু) উৎপাদন করিতে পারে, সে শব্দ যে তাহারা শুনিতে পায় না, স্যার জন লবক সহস্র প্রকারে তাহার পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন, উহারা অঙ্গবিশেষ সঞ্চালন করিয়া মনের কথা প্রকাশ করিয়া থাকে। কুকুর ও বিড়ালেরা শব্দবিশেষ দ্বারা মনোভাব কথঞ্চিত প্রকাশ করিতে পারে—পক্ষি-দিগের মধ্যেও একটীর ক্রন্দনে অন্যদিগকে আতঙ্কিত হইতে দেখা যায়। পারা-গোয়ের একজাতীয় বানর (Cebus azaroe) ছয় প্রকার শব্দ করিতে পারে; সেই ছয় প্রকার শব্দের ছয়টী অর্থ, সেই জাতীয় অন্যেরা তাহা বুঝিয়া লয়। সুতরাং মনুষ্য ভিন্ন আর কাহারও মনোভাব প্রকাশ করিবার শক্তি নাই, একথা বলা সঙ্গত নহে।

মনুষ্য ও অন্যান্য জীবের ভাষা-শক্তির প্রকারে পার্থক্য নাই—পরিমাণে পার্থক্য আছে। পরিমাণ পার্থক্য হেতু প্রকার পার্থক্য জন্মিয়া থাকে, এ কথাও স্বীকার করি। মনুষ্য-শিশু নিজের ভাষা ভিন্ন, বিজাতীয় ভাষা শিখিতে পারে; বিড়াল কুকুর বা বানর-শিশুকে অন্য ভাষা শিখান যায় না। পক্ষী অন্যের ভাষা অনু-করণ করিতে পারে বটে, কিন্তু সে ভাষায় আপন মনোভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। ইতর জন্তুদিগের অস্ফুটতা সীমাবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে—মনুষ্যের স্ফুটতার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। বানর-শিশু ও মনুষ্য-শিশু শৈশবাবস্থায় একরূপ হইলেও বৃদ্ধ বয়সে বানর বানরই থাকিবে, কিন্তু মনুষ্য-শিশু সিজর বা নিউটনের সমকক্ষ হইতে পারে।

সাধারণতঃ বাক্যকথন ভাষাকেই ভাষা বলে। আমরা মনোভাবপ্রকাশ করি-বার যন্ত্রকে ভাষা বলিয়াছি। মনোভাব কথা কহিয়া, লিখিয়া, ও ইঙ্গিত দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। সুতরাং এ সকল প্রকার উপায়কেই ভাষা বলা যাইতে পারে। মনোভাব প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ভাষার জননী। মনোভাব প্রকাশে

করা হইল কি না, ভাষা নির্ণয়ে কেবল ইহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কিরূপে মনোভাব প্রকাশিত হইল, স্বর-পরিবর্ত্তনে, বর্ণ-যোজনায় বা অঙ্গ সঙ্কেতে দেখিবার তত আবশ্যক নাই। এই ত্রিবিধ উপায়ই ইঙ্গিত মাত্র। অক্ষর কয়েকটির সমাবেশে, শব্দবিশেষের উচ্চারণে বা হস্ত সঞ্চালনে মনোগত ভাব-বিশেষ নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইবে, এমন কোন কথা নাই; উহাদিগের সহিত অর্থের কোন স্বাভাবিক সংস্রব নাই। আমি "জগর" বলিলাম বা লিখিলাম বা তর্জ্জনী দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিলাম, বল দেখি কি অর্থ প্রকাশ করিলাম? বলিতে পারিবে না। সাধারণ সম্মতিতে শব্দবিশেষ বা ইঙ্গিতবিশেষের অর্থবিশেষ নিরূপিত হয়। ভাষা সম্পূর্ণ সামাজিক যন্ত্র। সিজর বা পোপের সাধ্য নাই, সাধারণের অজ্ঞাতে নূতন শব্দের সৃষ্টি করেন বা পুরাতন শব্দের অর্থান্তর ঘটাইয়া দেন।

তাই বলিতেছিলাম, ঐ ত্রিবিধ উপায়ই সাধারণ অনুমোদিত সঙ্কেত মাত্র। একটী অপেক্ষা অন্যটি উন্নততর, কিন্তু তিনটীকেই "ভাষা" সংজ্ঞা দিতে হইবে।

শিশু জন্মগ্রহণের পর কয়েক মাস কথা কহিতে পারে না। কিছু দিন দেখিয়া শুনিয়া চেষ্টা করিয়া ক্রমে কথা কহিতে শিখে। কিছু কিছু কথা কহিতে পারিলেও ভাষা অপেক্ষা ইসারায় মনোভাব প্রকাশ করা তাহার নিকট সহজ বোধ হয় এবং যে সকল শব্দের তাহার অভাব থাকে, তাহা পরিজনদিগকে জ্ঞাপন করিতে ইঙ্গিত ভিন্ন তাহার উপায়ান্তর থাকে না। ক্রমে ভাষা পরিস্ফুট হয়। কিন্তু বাক্‌পটু যুবাদিগের মধ্যেও ইঙ্গিতশূন্যতা কখনই দেখা যায় না। ভাষা পরিস্ফুট জাতিদিগের মধ্যেও এইরূপ। সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত, ভাষার স্ফুটতা অধিক হইবার সহিত, ইঙ্গিত ব্যবহার অল্প হইবে বলিয়া আশা করা যায়, কিন্তু সর্ব্বত্র সে ফল লক্ষিত হয় না। এক দিকে ইংরাজদিগকে দেখিলে, তাহাদিগের আকৃতিতে মনোগত ভাব কচিৎ উপলব্ধ হইবে; অন্যদিকে ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলবাসী জাতিদিগের ভাষা অপেক্ষা হস্ত ও মুখভঙ্গী দ্বারা চতুর্গুণ মনোভাব বুঝা যাইবে।

মূকেরা ইঙ্গিত দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করে। পদার্থের আকৃতি বা গুণ বিশেষ তাহাদের সঙ্কেতের উপলক্ষ্য হয়। বৃত্তাকার পদার্থ বুঝাইতে হইলে একটি বৃত্ত করিয়া দেখায়, বয়সের ন্যূনাধিক্য হস্ত দ্বারা উচ্চতা দেখাইয়া প্রকাশ করে, চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ বহির্দ্দিকে হেলাইয়া দৃষ্টি করা বুঝায়, এই রূপে নাসিকা ও জিহ্বাতে অঙ্গুলি দিয়া ঘ্রাণ ও স্বাদ অনুভাব প্রকাশ করে। বালকেরা মুখের ভিতর প্রায়ই অঙ্গুলি রাখে, এজন্য মুখে অঙ্গুলি দিলে বালক

বুঝায় অথচ মুখ বন্ধ করিয়া তাহার উপর লম্বভাবে অঙ্গুলি নিবেশ করিলে চুপ করিতে বলা হয়। কুমারসম্ভবে নন্দী এইরূপেই প্রমথগণকে নিবৃত্ত হইতে বলিয়াছিলেন। আপন দিকে মস্তক বা হস্ত সঞ্চালনে আসিতে বলে, বহির্দ্দিকে করিলেই যাইতে বলা হয়। দক্ষিণ ও বামে হস্ত বা মস্তক সঞ্চালন করিলে "না" বলা হয়, কেবল দক্ষিণদিকে মস্তক হেলাইলে "হাঁ" বুঝায়। আপন উদরে হস্তদিলে আমি, তোমার দিকে দেখাইলে তুমি, স্কন্ধের উপর দিয়া পৃষ্ঠের দিকে হেলাইলে তিনি বলা হয়। নাভির সমোচ্চ স্থানে বড়, যত নিম্নে রাখা যায় তত ছোট বুঝায়। ঠোঁট নাড়িবার সময় মুখ হইতে বহির্ভাগে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিলে নাম জিজ্ঞাসা করা হয়। হাতের দ্বারা ছাত ও প্রাচীর দেখাইয়া গৃহ নির্দ্দেশ করে। ভাষা অপেক্ষা ইসারায় কথা অপরিস্ফুট হইলেও, য়ুরোপীয় বধির ও মূক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যখন পরস্পরের সহিত কথা কয়, দেখিলে বোধ হইবে তাহাদিগের ভাষায় কোন কথারই অভাব নাই। কথা কহিয়া একটী মনোভাব প্রকাশ করিতে যত সময় লাগে, ইঙ্গিত দ্বারা প্রকাশ করিতে তাহা অপেক্ষা অধিকক্ষণ লাগে না। বৃক্ষ বল্কলে, তরুপত্রে বা গিরিগাত্রে চিত্র অঙ্কনের অনুরূপই, আকাশে বা দেহের উপর অঙ্গুলি দ্বারা চিত্র করিয়া মনোভাব প্রকাশ করা, শব্দ বা চিত্র বিন্যাসের ন্যায় চিহ্ন ব্যবহার মাত্র; কেবল উহাদিগের অপেক্ষা অনুন্নত উপায়। অপিচ কথা শুনিয়া যাহার মনোগত কিছুমাত্র বুঝিতে না পারি, ইঙ্গিত দ্বারা নির্দ্দেশ করিলে, বিনা আয়াসে তাহা বুঝিতে সক্ষম হই। রঙ্গক্ষেত্রে মূক নট বাক্য ব্যয় না করিয়া কেবল অঙ্গুলি সঙ্কেত বা মুখভঙ্গি দ্বারা যে মনোভাব প্রকাশ করে, তাহা বুঝিতে কাহারই কষ্ট হয় না। আহ্লাদে সকলেই অট্ট হাস্য করিতে থাকে। আমেরিকায় নানাজাতি অসভ্য বাস করে। ইহারা কেহ কাহার কথা বুঝে না, অথচ ইঙ্গিত সাহায্যে বিভিন্নজাতীয় লোককে একত্র বসিয়া সমস্ত দিন গল্প করিতে দেখা গিয়াছে। বুসমান ও অরপাহ জাতি কথা কহিবার সময় এত সঙ্কেত ব্যবহার করে যে রাত্রিকালে তাহাদের কথা বুঝা যায় না। ব্লাকফুট জাতীয় একটি দম্পতি তিন বৎসর বিবাহের পর কেহ কাহার কথা বুঝিতে পারিতনা। অথচ ইঙ্গিত সাহায্যে পরস্পরের মনোভাব বুঝিতে এক দিনের জন্যও তাহাদের কষ্ট হয় নাই। অধিকন্তু কথাদ্বারা বুঝান অপেক্ষা, ইঙ্গিত সাহায্যে বুঝিতে অসভ্যেরা অধিক ভালবাসে। দোভাষী অপেক্ষা ইঙ্গিতপটু লোকদিগকে রাজ-সরকারে নিযুক্ত করিতে অসভ্য রাজ্যে অধিক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই, য়ুরোপীয়

মূক বিদ্যালয়ের সভ্য জাতির সন্তানেরা মনোভাব প্রকাশ করিতে যে সকল ইঙ্গিত ব্যবহার করিয়া থাকে, আমেরিকার বনবাসী অসভ্যেরা সেই ভাব প্রকাশ করিতে সেই ইঙ্গিতের সাহায্য লয়। বস্তুতঃ মূক বিদ্যালয়ে নূতন ইঙ্গিতের সৃষ্টি করিতে হয় না। মূকদিগের সরল, সহজ স্বাভাবিক ইঙ্গিত সকল শিক্ষকেরা শিক্ষা করিয়া তাহাদিগের সাহায্যে ছাত্রদিগকে জ্ঞান উপদেশ দিয়া থাকেন। যে শিক্ষক জাতীয় অভ্যস্ত কৃত্রিম ভাষা ভুলিতে যত সক্ষম, ইঙ্গিত শিক্ষা তাঁহার পক্ষে তত সহজ। চীনেরা বিউনি রাখে, সুতরাং বিউনি দেখাইলে চীনদেশীয় লোক, টুপি দেখাইলে সাহেব, শৃঙ্গ দেখাইলে শৃঙ্গী, শুণ্ড দেখাইলে হস্তী বুঝিতে হইবে। কপালে উল্কি দেখাইলে পূর্ব্বদেশীয় বুঝি। কোন্‌টি প্রশ্ন করা হইল, কোন্‌টি বলা হইল, সাধারণ লোকে কাকুদ্বারা কেহ বা শব্দপর্য্যায় পরিবর্ত্তন করিয়া বুঝায়—মূকদিগের মুখভঙ্গী দ্বারা তাহা বুঝিতে হইবে। আমাদিগের বন্দনা বা অভিবাদন, নমস্কার, করস্পর্শ, চুম্বন, মস্তক ঘ্রাণ, টুপি তুলা, রুমাল নাড়া—ইঙ্গিতে মনোভাব প্রকাশমাত্র—স্বতন্ত্র কথা বলিবার আবশ্যক থাকে না। আইস, যাও, সামান্য সামান্য কথা সকল স্বজাতির নিকটেও বাক্য অপেক্ষা ইঙ্গিতে বলা অনেক সময় সহজ হয়। আবার যখন বিদেশে বিজাতির মধ্যে পতিত হই, যাহার ভাষার বিন্দু বিসর্গ বুঝি না, তুহিনসমাকীর্ণ উত্তরসাগর তটবর্ত্তী এস্কিমো জাতি হইতে সিংহও ব্যাঘ্রের প্রতিবাসী প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডতপ্ত নিরক্ষরেখা সমীপবাসী জুলু ও নিগ্রোজাতি পর্য্যন্ত সকলেরই নিকট উদরে হস্ত দিয়া ক্ষুধা, মুখের নিকট অঙ্গুলি বাঁধিয়া তৃষ্ণা জানাইতে পারি। বাক্যকথন ভাষা জাতি অনুসারে বিভিন্ন। সহস্র সহস্র ভাষা পৃথিবীতে মানব সন্তানকে বিচ্ছিন্ন ও শত্রু করিয়াছে। কিন্তু ইঙ্গিত ভাষা প্রাঞ্জল ও সর্ব্বত্র এক। অস্ট্রেলিয়ান ও সাইবেরিয়ান, ইংরাজ ও ইণ্ডিয়ান সকলেই পরস্পরকে বুঝিতে পারে।

আমাদিগের যতি, বৌদ্ধ লামা বা সিষ্টার্সিয়ান পুরোহিতেরা মধ্যে মধ্যে মৌনব্রত অবলম্বন করেন। কিন্তু দুরন্ত সংসারের এমনি অত্যাচার, তথনও কথা কহিবার আবশ্যক হয়। ব্রতভঙ্গ না করিয়া ইঙ্গিতে মনোভাব প্রকাশ করিতে তাঁহারা কিছুমাত্র কষ্টবোধ করেন না। হাত খুলিলে তাঁহাদের ভাষায় দেওয়া বুঝায়, হাত মুঠা করিলে লওয়া বুঝায়। একটি তর্জ্জনীর উপর আর একটি তর্জ্জনী রাখিবার অর্থ ভ্রাতা, হস্তদ্বারা চক্ষু বদ্ধ করিবার অর্থ অন্ধতা, বক্রভাবে চক্ষের উপর হস্ত রাখিবার অর্থ লজ্জা, বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী বৃত্তাকারে মুখের সম্মুখে রাখিলে 'দিবা' বুঝায়।

দেখা গেল সকল দেশীয় সকল জাতীয় সকল অবস্থার লোকে মনোভাব প্রকাশ করিতে অল্প বা বহু পরিমাণে ইঙ্গিতের সাহায্য লয়। ইতর জন্তুদিগের মধ্যে যাহারা কথা দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিতে না পারে, তাহারা ইঙ্গিতে মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। শিশুরা কথা কহিবার পূর্ব্বে ইঙ্গিতে মনোভাব প্রকাশ করে। ভাবে স্নায়ুর উত্তেজনা হয়, স্নায়ুর উত্তেজনায় মুখভঙ্গি বা হস্তপদ সঞ্চালন স্বাভাবিক ঘটিয়া থাকে। আমার মনোভাবের উদয় হইলে আমি যেরূপ মুখভঙ্গি করি বা হস্ত সঞ্চালন করি, অন্যের মনে সেই ভাব উদিত হইলে সেও স্বাভাবিক সেইরূপ করিয়া থাকে। সুতরাং ইঙ্গিত বুঝিতে কষ্ট হয় না। আবার, একবার বুঝা গেলে বারান্তরে বুঝাইবার জন্য সেই রীতির অনুসরণ করা সঙ্গত। এইরূপে ইঙ্গিতের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। এবং বোধ হয় (Homo alalus) বাকশক্তিহীন যে প্রথম মনুষ্যগণ অতি প্রাচীনকালে আফ্রিকার মধ্য ভাগে বা ভারত মহাসাগরের জলমগ্ন প্রাচীন পৃথিবীতে বাস করিত, তাহারা এইরূপেই মনোভাব প্রকাশ করিত। বস্তুতঃ বাক্যকথন ভাষা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে মনুষ্য যে ইঙ্গিত দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ডারবিণ ও হেকেল বলেন, সেই বাকশক্তিহীন মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহারা ক্রমশঃ উন্নতি করিতে পারিয়াছিল, তাহারাই বর্ত্তমান মানবজাতির (Homo Primigenius) পূর্ব্ব পুরুষ। যাহারা অবস্থা দোষে অবনত হইয়াছিল, তাহাদিগের সন্তান সন্ততি নানা জাতীয় বনমানুষ ও কয়েক প্রকার বানর Gorilla, Chimpanzee and the Ourangotang। প্রথম ও দ্বিতীয় কল্পের ভূস্তর পরীক্ষা না করিয়া এ কথা কতদূর সত্য বলা যায় না।

অসভ্যদিগের মনোভাব অতি অল্প—ইঙ্গিত দ্বারা সে সমুদয় গুলি প্রকাশ করা যায়। কিন্তু চিরদিন যদি ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত, মানব সমাজ এতদূর উন্নতি করিতে পারিত না। আমরা দশটী সামগ্রী তুলনা করিয়া তাহাদিগের একটী সাধারণ ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে পারি। একটী শব্দে সেই ধর্ম্মটী সীমাবদ্ধ করিয়া আবার নূতন তুলনায় প্রবৃত্ত হই। ইঙ্গিতে সেরূপ হইবার নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভাষা চিন্তার প্রকাশিকা, আবার নূতন চিন্তার জননী।

বাক্যকথন ভাষার উৎপত্তি কিরূপে হয়, একটী শিশুকে প্রথম কথা কহিবার সময় পরীক্ষা করিলে বুঝা যাইতে পারে। যে অবস্থার মধ্য দিয়া শিশু যৌবনে পদার্পণ করে, সেই সকল অবস্থার মধ্য দিয়া বন্য মানবসমাজ সভ্য-

সমাজে পরিণত হয়। শিশু কয়েক বৎসরে যে সকল পরিবর্ত্তন অতিক্রম করে, সহস্র সহস্র বৎসরে, মানব-সমাজ সেই সকল পরিবর্ত্তন অতিক্রম করিয়া থাকে, ইহার বিশেষ এইমাত্র। শিশুর অজ্ঞানতা, দুর্ব্বলত্ব, বাক্যহীনতা, অসভ্যদিগের অনুরূপ। জৈবিক স্বাস্থ্যরক্ষা হেতু শিশু স্বতঃই যেরূপ হস্তপদ সঞ্চালন করিয়া থাকে, বাক্‌যন্ত্রেরও সেইরূপ সঞ্চালন করে। তিন মাসের শিশু কত শব্দই উচ্চারণ করে। জননী স্নেহশীলতায় মনে করেন, সে তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে। তিনি আনন্দে কতই সোহাগ করিতে থাকেন। ফলতঃ শিশু কেবল বীণার অসম্বদ্ধ তার টানিয়া সুর বাঁধিতেছে। অসভ্যের ন্যায় শিশুরও মনে ইচ্ছা হয়, মনোগত ভাব কিরূপে অন্যকে বুঝাইবে। সে অবিরত লক্ষ্য করে, কিরূপে অন্যেরা আপন আপন মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। যদি অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কেহ কোন বস্তু নির্দ্দেশ করে, সেও তাহার অনুকরণ করিতে থাকে। অঙ্গুলি একবার এদিক, একবার সেদিক, এইরূপ নানাদিকে ঘুরিয়া ক্রমে আয়ত্ত হইয়া অভিপ্রেত দিকে চালিত হয়। শিশুর ইঙ্গিত-শিক্ষা এইরূপ। শব্দ-শিক্ষাও এইরূপেই হইয়া থাকে। শিশু ও অসভ্য বানরের মত অনুকরণপ্রিয়—যাহা দেখে তাহাই করিতে ইচ্ছা করে। বস্তুতঃ অন্যকে আপন মনোভাব প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ও অনুকরণকুশলতা বিদ্যমান না থাকিলে আবশ্যকীয় ইন্দ্রিয়াদি সত্বেও মনুষ্য কখন ভাষা শিক্ষা করিতে সমর্থ হইত না। আমি একটী জন্তুকে গরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, শিশু সে কথাটী মনোযোগের সহিত শুনিল, জন্তুটীকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল। তাহার পর নামটী উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। 'গউ গউ', এইরূপ কয়েকদিন করিয়া শেষে 'গলু' বলিতে আরম্ভ করিল; আবার কয়েক দিন চেষ্টা করিয়া শেষে গরু বলিল। এইরূপে কতকগুলি শব্দ আয়ত্ত করিয়া শিশু আপন মনোভাব প্রকাশ করে। তখনও তাহার সকল কথা আয়ত্ত হয় নাই; সুতরাং কতক বা শব্দ-সাহায্যে, কতক বা ইঙ্গিত-সাহায্যে তাহার কথাবার্ত্তা চালাইতে হয়। অসভ্যেরাও ঠিক এইরূপ করে।

আর একটী কথা। শিশুর বুদ্ধি পরিস্ফুট নহে। সে দুইটী পদার্থের কতটুকু ঐক্য, কতটুকু অনৈক্য কতকটা নির্ণয় করিতে পারে। যদি পরিমাণে একতা অধিক হয়, তবেই দুইটি পদার্থকে একজাতীয় বলিয়া নির্ণয় করে এবং দুইটীকে এক নামে অভিহিত করে। ক্রমে উভয়ের পার্থক্য যখন অনুভব করে, তখন নামান্তরের আশ্রয় লয়। পুনশ্চ পার্থক্য অনুভব করিতে

পারিলেও শব্দের অভাবে অভ্যস্ত নাম বিশেষ দ্বারা বা সেই নামের কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন পদার্থের নামকরণ করিতে দেখা যায়। শিশুকে কেহ শিখাইয়া দিল পুরুষবিশেষ তাহার 'বাবা'; সে তাহাকে বাবা বলিয়া ডাকিতে লাগিল। তাহার পর সে আর একটী পুরুষ দেখিলে তাহাকেও বাবা বলিয়া সম্বোধন করে। আমার শিশুকে একদিন বলিয়া দিয়াছিলাম যে, ঘোড়া কামড়াইবে; সে আর একদিন একটি গরু দেখিয়া দার্শনিকের মত গম্ভীরভাবে আমাকে বলিয়াছিল, "গরু কামলাবে"। বিড়ালের "মেও" শব্দ শুনিয়া শিশুরা বিড়ালকে "মেও" বলে; তাহার পর কুকুরকেও "মেও" বলিয়া অভিহিত করে। ক্রমে যখন দেখে কুকুর "মেও" করে না, "ভেক্" করে তখন কুকুরের নাম ভেক্ রাখে। আমেরিকার কোন কোন প্রদেশে পূর্ব্বে কুকুর ছিল না, শূকর ছিল, সে দেশের লোকেরা কুকুর দেখিয়া তাহাকে শূকর বলিত। আমাদের দেশে পূর্ব্বে জেব্রা ছিল না; জেব্রা ঘোড়ার মত, এজন্য সাধারণ লোকে জেব্রাকে ঘোড়া বলিয়া থাকে। পশুবাটিকায় যে সকল নূতন জন্তু আনা হইতেছে, সাধারণ লোকে কত সহজে তাহাদের নামকরণ করে, শুনিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। কুকুরকে বাঘ, বাঘকে বিড়াল, বিষাণকে মহিষ, হরিণকে গাভী,ইত্যাদি বলিবার সহস্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

শিশুরা স্থূল পদার্থ বুঝিতে পারে; তাহাদিগের সমস্ত শব্দ বস্তুবিশেষনির্ব্বাচক। সূক্ষ্ম নিরপেক্ষভাব তাহারা বুঝে না, এইজন্য শিশুর শব্দশাস্ত্রে নিরপেক্ষ (Abstract) শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা জ্ঞানীলোক বুঝে, কিন্তু জ্ঞান বুঝে না, সুন্দর পদার্থ বুঝে, কিন্তু সৌন্দর্য্য বুঝে না। এজন্য জ্ঞান, সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য, সত্য প্রভৃতি নিরপেক্ষ শব্দ তাহাদিগের ভাষায় নাই। এইরূপে শিশুর শব্দশাস্ত্রে সকল নামই বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষের নাম; বস্তু সকলের বা ব্যক্তি সকলের একটি সাধারণ নাম তাহাদের ভাষায় নাই। তাহারা রাম, শ্যাম, যদু বুঝে, কিন্তু মনুষ্য বুঝে না। তাল গাছ, শালগাছ বুঝে, কিন্তু গাছ বুঝে না। অসভ্য ভাষায়ও ঠিক এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকার অসভ্যদিগের মধ্যে বিভিন্ন কার্য্য-বাচক আট সহস্র শব্দ আছে, কিন্তু নিরপেক্ষ ক্রিয়াবাচক একটি শব্দও নাই। চিরুকিজাতির ভাষায় হাত ধুইবার, মুখ ধুইবার, পা ধুইবার, কাপড় ধুইবার, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তেরটি শব্দ আছে। কিন্তু অঙ্গ বা পদার্থ বিশেষ ছাড়িয়া নিরপেক্ষ ভাবে "ধোয়া" বলিবার একটিও কথা নাই। কুর্দ ভাষায় আমার হাত, তোমার হাত, রামের হাত বলিবার বিভিন্ন শব্দ আছে,

কিন্তু হস্ত বা মস্তকবাচক এক একটি স্বতন্ত্র শব্দ নাই। হুপা ও নবহ জাতিও ঐরূপ কোন অঙ্গ বা কোন পদার্থ উল্লেখ করিতে হইলে,সে পদার্থের অধিকারী-বাচক শব্দ সংযোগ না করিয়া বলিতে পারে না।

অসভ্যদিগের সংখ্যাগণনা শক্তি ও প্রণয়বোধ অতি অল্প; এজন্য অসভ্য ভাষায় সংখ্যা ও প্রীতিবাচক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। হোস, আলগণকিনও টিনে ইণ্ডিয়ানদিগের ভাষায় প্রণয়সূচক কোন শব্দ নাই। কালমক ও দক্ষিণ-দ্বীপবাসী কোন কোন জাতির ভাষায় কৃতজ্ঞতাসূচক কোন শব্দ নাই। বুসমানদিগের মধ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম নাই। প্লিনির মতে উত্তর আফ্রিকার কোন কোন জাতির মধ্যেও ঐরূপ দেখা গিয়াছিল। অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসিরা স্ত্রীলোকদিগের নাম রাখে না। সন্তান হইবার পরে "অমুকের মা" বলিয়া তাহার নামকরণ হয়। ব্রাজিলবাসিদিগের মধ্যে অনেক প্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু স্বর, লিঙ্গ জাতি, বর্ণ বা ভাববাচক কোন কথা তাহাদের ভাষায় নাই। সিংহলের ব্যাধদিগের ভাষা অতি অস্ফুট, কেবল নিত্য কার্যের জন্য যে কয়েকটি কথার প্রয়োজন অথবা কোন আশ্চর্য্য পদার্থের নাম, ইহা ভিন্ন আর কোন কথা তাহাদের ভাষায় নাই। অতি সামান্য একটি কথা বলিতে হইলে, দশটি শব্দ যোগ করিয়া তাহাদিগকে বলিতে হয়। কোঁচ, বোদো ও ধীমল জাতির ভাষায় জড়, মুক্ত, স্থান, পশুবৃত্তি, বিবেচনাশক্তি, সংজ্ঞা, পরিমাণ প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিতে হইলে, যথাযথ শব্দ দুর্ল্লভ হইয়া উঠে। মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো জাতিরা অশরীরী, আত্মা, আশা বা আশঙ্কা নির্দ্দেশ করিবার কোন কথা জানে না। অনেক নিগ্রো জাতিরও এইরূপ দুর্দ্দশা। ফুয়েজি ও তাসমেনিয়-দিগের ভাষায় নিরপেক্ষ গুণবাচক কোন শব্দ নাই। কঠিন শব্দ নাই। কঠিন বা কোমল, দীর্ঘ বা হ্রস্ব, উত্তপ্ত বা শীতল, ত্রিভুজ বা বৃত্ত, তাহারা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না। বৃক্ষবাচক বা জন্তুবাচক, লিঙ্গ, বর্ণ বা স্বরবাচক কোন শব্দ কোরোডো জাতির ভাষায় নাই। সাধারণতঃ সকল অসভ্য জাতির মধ্যে বর্ণবাচক শব্দের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। "দীর্ঘকায়" বলিতে হইলে তাসমেনীয় ভাষায় "লম্বা পা" বলিতে হয় এবং গোলাকার বলিতে হইলে চন্দ্র বলিতে হয়। নব কালিডোনিয়ার লোকেরা "গত কল্য" বা "আগামীকল্য" বলিতে পারে না। সিংহলের ব্যাধেরা স্ত্রীদিগকে যে নাম দেয়, স্ত্রীদিগকে সম্মুখে দেখিতে না পাইলে, সে নামগুলি স্মরণ রাখিতে পারে না। দামারা জাতিদিগের মত ইহাদিগের ভাষায়ও কোন সংখ্যাবাচক শব্দ নাই।

পলিনেসিয়ার অনেক জাতির ভাষায় ক্রিয়াবাচক কোন শব্দ নাই। শিশু যখন "উপ" বলে তখন উপরে যাইব, বা উপরে ছিলাম, উপরে চল, বা উপরে আছে, কি অর্থ করে তাহা তোমাকে কষ্ট করিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। দায়াকেরা "তোমার নৌকাখানি বড় সুন্দর" বলিতে হইলে, বলে "খুব ইহার সৌন্দর্য্য তোমার নৌকা"; "আমি তোমার ভাইকে মারিব" বলিতে হইলে, বলে "তোমার ভাই আমার লাঠির জিনিষ" "সে সাদা জামা পরিয়াছে"বলিতে হইলে বলে "সে সহিত জামা সহিত সাদা"। চীনভাষায় একই শব্দ বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়ার বিশেষণ ও কারক বুঝাইবার প্রত্যয় রূপে ব্যবহৃত হয়। অনেক ভাষায় দুইটা টাকা বলিতে হইলে, টাকা-টাকা দুইবার বলিতে হয়; "খুব বড়" বলিতে হইলে, বড়-বড় দুইবার বলিতে হয়। কারক-বাচক প্রত্যয় কেবল উন্নত ভাষা সকলে দেখিতে পাওয়া যায়। চাকর বাড়ী বলিলে, অনেক ভাষায় চাকরের বাড়ী বা বাড়ীর চাকর, কি বলিল বুঝা দুষ্কর হয়। স্ফুটতর ভাষায় প্রথমে শব্দবিশেষ সাহায্যে সম্বন্ধ সূচনা করা হইত। সেই সকল শব্দ অপভ্রংশ হইয়া এখন প্রত্যয় রূপে পরিণত হইয়াছে। আর্য্যভাষায় দ্বিত্ব করিয়া অতীত কাল বুঝান হইত। "দাদা" বলিলে "দিয়াছে" বুঝাইত; সেই দাদা শব্দ এখন "দদৌ" আকার ধারণ করিয়াছে। বুশমান ভাষায় "টু" অর্থে মুখ, কিন্তু "টুটু" বলিলে অনেকগুলি মুখ বুঝায়। এইরূপ সোনোরীয় ভাষায় "কুই-কুই" অর্থে বাড়ী সকল এবং মলক্কস উপদ্বীপে "রাজ রাজ" অর্থে রাজা সকল। এইরূপ দ্বিত্ব করিয়া বহুবচন বুঝাইবার প্রথা হইতে আমাদের দেশে ভাতটাত, মাছটাছ ও ইংরাজী ভাষায় হরলি-বরলি, হজ-পজ প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। মাণ্ডিঙ্গো ভাষায় ডিং-ডিং অর্থে খুব ছোট এবং আকেডিয় ভাষায় গালগাল অর্থে খুব বড়। অসভ্য ভাষার আর একটী দোষ, উহাতে শব্দ সকল রীতিমত সাজান হয় না। শিশুর কথা শোন, সে কোন প্রকারে মনোভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, কোন্ শব্দের পর কোন্ শব্দ বসাইতে হইবে, সে দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই—কোন প্রকারে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই হইল। ক্রমে ভাষা যত পরিস্ফুট হয়, কথা সাজাইবার দিকে তত লক্ষ্য পড়ে। অসভ্য ভাষাতেও ঠিক এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—কোথায় কর্ত্তা, কোথায় ক্রিয়া, কোথায় বিশেষ্য, কোথায় বিশেষণ—যে বলে তাহার কিছুই স্থির থাকে না, যে শুনে সেই অসম্বদ্ধ প্রলাপবৎ বাক্য হইতে তাহাকে অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়।

শব্দ সকলের ধাতু আছে। এখন যাহাদিগের ধাতু নির্ণয় করিবার সাধ্য নাই, তাহারাও যে ধাতুবিশেষ হইতে জন্মিয়াছিল, কোন সন্দেহ নাই। এখন সকল ধাতুর অর্থ নির্ণয় করা যায় না—কিন্তু এক সময় সকল ধাতুরই অর্থ ছিল। সংস্কৃত ভাষায় সহস্র সহস্র শব্দ আছে। সেই সকল শব্দের সাহায্যে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, বেদ প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অথচ এই সহস্র সহস্র শব্দ কেবল ১৭০৬টি ধাতু হইতে জন্মিয়াছে। চীনভাষায় প্রায় চল্লিশ সহস্র ও ইংরাজি ভাষায় প্রায় এক লক্ষ শব্দ—তথাপি চীন ও ইংরাজি ভাষায় পাঁচ শতের অধিক ধাতু নাই। প্রাচীন মিসরভাষায় কেবল ৬৫৮টী ধাতু ছিল। এই ধাতু সকল এক সময়ে সজীব ছিল—তাহারাই শব্দরূপে ব্যবহৃত হইত—এখন তাহারা ভূস্তরে কঙ্কালের ন্যায় শব্দ-শরীরে নিহিত থাকিয়া অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতেছে। এইরূপ বিচার করিয়া হুইটনি প্রভৃতি কোন কোন শব্দশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত অনুমান করেন, আদিম জাতিসকল এই ধাতুশব্দে বাক্যালাপ নির্ব্বাহ করিত। কয়েকটী হ্রিং ও ক্লিং মিলাইয়া আলাপ করা কতদূর সম্ভব, পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। সেইস্ সাহেব বলেন আদিম মনুষ্যগণ এক একটি বাক্য উচ্চারণ করিত। শিশুর "উপ" বলিবার মত সেই একটি বাক্যে তাহার সমস্ত অর্থ প্রকাশিত হইত। সেই বাক্যের বিভাগ করিয়া শব্দের রচনা হইয়াছে এবং কতকগুলি শব্দের তুলনা করিয়া তাহাদিগের ধাতু নির্ণয় করা গিয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা ধাতু সকল বিশেষ্য বা ক্রিয়াবাচক এই আন্দোলনে বহুকাল অতীত করিয়াছিলেন। সেইস্ সাহেবের কথা প্রকৃত হইলে একটি বাক্যে সকল অর্থ প্রকাশিত হওয়াতে সেই একটি শব্দ মধ্যে কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া সকলই নিহিত রহিল। বস্তুতঃ বুশমানদিগের টিকটিক শব্দ শুনিলে ও শিশুর কথা কহিবার উদ্যম পরীক্ষা করিলে, সেইস্ সাহেবের মতই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়।

অসভ্যদিগের ভাষা অতি অস্ফুট, কতক বা শব্দ সাহায্যে, কতক বা ইঙ্গিত সাহায্যে, কোন প্রকারে তাহারা আপনাদিগের অনুন্নত অমিশ্র সাধারণ ভাব সকল প্রকাশ করিয়া থাকে, এ কথা বুঝা গেল। অতঃপর কিরূপে বাক্যকথন ভাষার সৃষ্টি হয়, তাহারই আলোচনা করা যাইবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক জন ইঙ্গিতে কি বলে, অন্যে বুঝিতে পারিলে সেও সেইরূপ ইঙ্গিত দ্বারা আপন মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। বাক্যকথন ভাষারও সৃষ্টি এইরূপে। বেদনায় অস্থির হইয়া যখন আমি উহুঃ করি, পার্শ্ব-

বর্ত্তী পরিজনেরা তখনই আমার মনের কথা বুঝিয়া লয়। আমি যে শব্দ দ্বারা আমার কাতরতা তাহাকে বিদিত করিলাম, সেও সেই শব্দ দ্বারা অতঃপর তাহার কাতরতা আমাকে বিদিত করিবে। ক্রমে অনুপস্থিত কাহারও কাতরতা জন্মিয়াছে, আমাকে বুঝাইবার জন্য কোন প্রকারে তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া উহুঃ বলিবে—তখন আমি বুঝিব তাহার কাতরতা জন্মিয়াছে। ক্রমে উহুঃ শব্দ কাতরতাসূচক হইয়া পড়িবে। পূর্ব্বে একবার বলা গিয়াছে, আবারও বলা আবশ্যক, যতক্ষণ আমার শব্দ দ্বারা শ্রোতৃগণ আমার মনোগত উপলব্ধি করিতে না পারিবে, ততক্ষণ সে শব্দ শৃগালের চীৎকার মাত্র—বাক্যকথন ভাষা নহে। যখন একজনের কৃত শব্দে অন্যেরা তাহার মনোগত বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগের মনোগত বুঝাইবার জন্য সেইরূপ শব্দ করে, তখনই বাক্যকথন ভাষার উদয় হয়। সুতরাং একটি শব্দ সৃষ্টি করিতে হইলে সাধারণের সম্মতি আবশ্যক।

শোক, দুঃখ, বিস্ময় প্রভৃতি সহসা হৃদয়ে উদিত হইলে, যে শব্দ সকল আপন হইতে কণ্ঠ দিয়া নির্গত হয়, প্রথম মানবীয় ভাষার তাহারা একটি প্রধান অঙ্গ। শিশুগণ অর্থসংযুক্ত কথা কহিবার পূর্ব্বে যে শব্দ সকল উচ্চারণ করিয়া থাকে, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে তাহারা স্বরবর্ণ-প্রধান; হলবর্ণের ক্বচিৎ আভাস পাওয়া যায়। বিস্ময়াদিসূচক শব্দ সকলও স্বরবর্ণ-প্রধান। ফু, ছি, থু, ও, এ প্রভৃতি শব্দ সকল দেখিতে অকিঞ্চিৎকর হইলেও উহারা বাক্যকথন ভাষার সূচনা করিয়াছিল।

পশুপক্ষীর শব্দের অনুকরণে অনেকগুলি কথার সৃষ্টি হইয়াছিল। বিড়াল মেও মেও শব্দ করে, এজন্য শিশু ও অসভ্যেরা বিড়ালকে "মেও" বলে, কুকুরকে "ভেক্" বলে, বায়সকে "কাক" বলে, মুরগীকে কুক্কুট বলে। এইরূপে বউ কথা কও, ফটিকজল, টাকাচোরা, বুলবুল, ঘুঘু, চিল, চড়াই, ছাতারে এবং ভ্রমর প্রভৃতির নামকরণ করা হইয়াছে। প্রত্যেক ভাষায় এইরূপে শব্দ অনুসারে জন্তুদিগের নামকরণ করিবার রীতি দেখা যায়। গাড়ী গড় গড় করে বলিয়া শিশুরা গাড়ী "গগ গগ" বলে। এইরূপে বোম, করাত, ঝরণা, বজ্র, কাস্তে, কাঁচি, হাঁচি, কাশি নক্কার, প্রভৃতি নামের সৃষ্টি হইয়াছে। মর্ম্মর, গর্জ্জন, কল্লোল, শোঁ শোঁ, টং টং, থুথু প্রভৃতি শব্দের যে এইরূপ উৎপত্তি বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। মূকেরা শৃঙ্গী বলিতে হইলে শৃঙ্গের ইঙ্গিত করে, বেণী দেখাইয়া চীনদেশীয় লোক বুঝায়। গুণবিশেষ লক্ষ্য করিয়া বাক্য-

কথন ভাষারও অনেক গুলি শব্দের সৃষ্টি হয়। দ্রুতগতি বলিয়া ঘোড়াকে অশ্ব নাম দেওয়া হইয়াছে; শিখা বা পুচ্ছ আছে বলিয়া ময়ূরকে শিখী বলে; শৃঙ্গ হেতু পশুকে শৃঙ্গী এবং সর্ব্বধারণ ক্ষমতাশালিনী বলিয়া পৃথিবীকে ধরিত্রী নামে অভিহিত করা হয়। গাছ বাড়ে বলিয়া তাহাকে দ্রুম, নদী চলে বলিয়া তাহাকে সরিৎ এবং যব সাদা বলিয়া তাহাকে শ্বেত কহা হয়। যখন লৌহের আবিষ্কার হয় নাই, তখন স্বর্ণ রৌপ্য সকল ধাতুকে অয়স্ বলিত। লৌহ সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক উপকারী বলিয়া এখন লৌহকেই কেবল অয়স্ বলে। সকলে এক গুণে মোহিত হয় না। যাহার নিকট যে গুণ ভাল লাগে সে তদনুসারে নামকরণ করে, এজন্য চন্দ্রমা কোন দেশে পুরুষ, কোন দেশে স্ত্রীরূপে আখ্যাত হয়। কেহ বা ময়ূরকে শিখী বলিল, কেহ কলকণ্ঠ আখ্যা দিল। কেহ ধরিত্রী বলিয়া পৃথিবীকে সম্মান করিল, কেহ সর্ব্বংসহা বলিয়া গৌরব বাড়াইল। ফলতঃ লক্ষণানুসারে নামকরণ ভাষা-রচনার যে তৃতীয় উপায়—ইঙ্গিতের রূপান্তর মাত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভাষার সৃষ্টি এইরূপে। মনোভাব বিদিত করিবার ইচ্ছা ও অনুকরণ-প্রবৃত্তি ভাষার জনয়িত্রী। বুদ্ধি যতদিন অস্ফুট থাকে, ভাষাও ততদিন অস্ফুট থাকে, বুদ্ধির বিকাশের সহিত ভাষার বিকাশ হয়। ভূ-স্তর নিহিত কঙ্কালের ন্যায় ভাষার ভাণ্ডারে যে সকল শব্দ জীবনশূন্য বা পরিবর্ত্তিত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে, তাহাদিগের ললাটে মানব-সমাজের অতীত ইতিবৃত্ত খোদিত আছে। আমাদিগের গ্রন্থে সে সকল আলোচ্য নহে—অনুসন্ধিৎসুগণ গ্রন্থান্তরে তাহাদিগের তত্ত্ব লইলে পরিতৃপ্ত হইবেন।

---

# দশম পল্লব।

বলবানের মিত্রতা উপকার জনক; বলবানের শত্রুতায় বিপদের আশঙ্কা। পশুগণও বলবানের অধীনতা স্বীকার করে। অধীনতা প্রকাশের নানা চিহ্ন—ক্রমে সমাজ যত উন্নত হইয়াছে,চিহ্ন সকল ক্রমে তত উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। চিহ্ন বিশেষ দেখিলে এক সময় তাহারা কিসের সংজ্ঞাপক ছিল, এখন সহজে বুঝা যায় না—অথচ মূলে তাহারা অবস্থা বিশেষ হইতে যে উদ্ভূত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। একটী বলবান হস্তর কুকুর দেখিলে দুর্ব্বলতর সারমেয়, পলাইবার উপায় নাই, যুদ্ধে প্রাণনাশের সম্ভাবনা বুঝিয়া, চারি পা উর্দ্ধে তুলিয়া, লাঙ্গুল নাড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি দিতে থাকে—দেখিলেই বুঝা যায়, কৃপার পাত্র ক্ষুদ্র জীব বলিতেছে "ত্রাহি ত্রাহি", আমি তোমার একান্ত অধীন—মারিলে মারিতে পার, রাখিলে রাখিতে পার, "ত্রাহি ত্রাহি"। এই অবস্থা এখন সভ্য সমাজে ঈষন্মাত্র মস্তক হেলাইয়া আনুগত্য স্বীকারে পরিণত হইয়াছে সহজে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু অল্পে অল্পে কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অনুসরণ করিতে পারিলে অবিশ্বাসের কারণ থাকিবে না।

বাটোকা জাতি মাটীতে চিৎ হইয়া শুইয়া গড়াইতে থাকে এবং দুই হাতে উরু চাপড়ায়—কৃতজ্ঞতা বা আনন্দ প্রকাশ করিবার ইহাদের মধ্যে এই রীতি। কেহ যখন চিৎ হইয়া পড়ে, শত্রুর দণ্ড নিবারণে আর তাহার কোন সাধ্য থাকে না। দণ্ডনিরোধে অক্ষমতা জানাইবার আরো উপায় আছে। সর্দ্দারকে দেখিলে টঙ্গাটাবুর লোকেরা ভূপৃষ্ঠে সাষ্টাঙ্গ হইয়া গলার উপর সর্দ্দারের চরণ তুলিয়া লয়। ফুণ্ডার লোকেরা ঐরূপে অবনত ভাবে মাথার উপর প্রধানদিগের চরণ উঠাইয়া লয়। আফ্রিকার সর্ব্বত্র অবনতি স্বীকারের এই সঙ্কেত। পূর্ব্বকালে আমেরিকায় চিবচাজাতি মাটীর উপর মুখ দিয়া শুইয়া পড়িত। ভারতবর্ষে খন্দ, পান প্রভৃতি অসভ্য জাতি, এবং বাঙ্গালি ও উড়িয়াদের মধ্যেও এই রীতি দেখা যায়। খোরদা অঞ্চলের ওড়দিগকে সাহেব মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মাটীতে সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িয়া প্রণাম করিতে দেখিয়াছি। শ্যামদেশে সাধারণ লোকে সম্ভ্রান্তগণের সমক্ষে এবং সম্ভ্রান্তগণ রাজদরবারে এইরূপে অভিবাদন করিয়া থাকে। পলিনেশিয়া ও সাণ্ডুইচ দ্বীপে এইরূপ। ভুটিয়াজাতি দেব-

রাজাকে দেখিলে নয়বার সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করে। প্রাচীনকালে রোমদেশে এবং য়িহুদীজাতির মধ্যে সাষ্টাঙ্গ হইয়া অভিবাদন করিবার রীতি ছিল। আফ্রিকার তটবাসী নিগ্রোদিগের মধ্যে জানু পাতিয়া তিনবার ভূমিচুম্বন করিবার রীতি। সাষ্টাঙ্গ হইতে হইলে জানু পাতিয়া উঠিতে হয়। সুতরাং জানু পাতিয়া অভিবাদন করা সাষ্টাঙ্গ হওয়া অপেক্ষা সংক্ষেপ। ব্রাস্ জাতি জানু পাতিয়া মাথা মাটীতে ছোঁয়াইয়া প্রণাম করে। মুসলমানেরা এইরূপে নমাজ পড়ে। কঙ্গোতটে এম্বোমা নগরে জানু পাতিয়া প্রভুর পায়ের অলঙ্কার চুম্বন করিতে হয়। পূর্ব্বকালে রুসিয়াদেশে সম্রাটের অভিষেক দিনে সম্ভ্রান্তগণ চরণে মস্তক দিয়া এইরূপে নূতন রাজাকে অভিবাদন করিত। চীনদেশে সম্রাটকে অদ্যাপি জানু পাতিয়া নয় বার নমস্কার করিতে হয়। দাহোমিদেশে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া চারি হাত পায়ে দাঁড়াইয়া রাজাকে প্রণাম করে। নবকালিডোনিয়া, ফিজী ও টাহিটীদ্বীপে এই প্রথা। পূর্ব্বে মেক্সিকোদেশেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। শ্যামদেশে রাজদরবারে হাত ও জানুর উপর ভর দিয়া যাইতে হয়। দাহোমিদেশে রাজসাক্ষাতে যাইবার সময় বুকে হাঁটিয়া যাইতে হয়। জাবা দ্বীপে রাজদরবার ছাড়িবার সময় দুই হাতে পা ধরিয়া যাইতে হয়। জুলুরাজের স্ত্রী ও প্রজাগণ এইরূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে। লোয়াঙ্গোদেশে স্বামীর সহিত দেখা করিবার সময় স্ত্রীদিগকে চারি হাত পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া জানু পাতিয়া কথা কহিতে হয়। দাহোমিদেশে কঞ্চুকিরা চারি হাত পায়ে হাঁটিয়া রাজার নিকট সংবাদ লইয়া যায়। ক্রমে কেবল জানু পাতিয়াই অভিবাদন করিবার নিয়ম হয়। এই রীতি অদ্যাপি সভ্য সমাজে দেবমন্দির ও রাজদরবারে দেখিতে পাওয়া যায়। আসিয়ার চীন ও জাপানদেশেও এই রীতি। দুই হাঁটুর পরিবর্ত্তে ক্রমে এক হাঁটু পাতিয়া সম্মান করিবার প্রথাও অনেক দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এতৎসম্বন্ধে অধিক উদাহরণ দিবার আবশ্যক নাই। জাপানদেশে সাধারণতঃ লোকে হাঁটু বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া ভক্তি প্রকাশ করে। কেবল বিশেষ সম্মান দেখাইবার সময় জানু পাতিয়া বসে। কিন্তু পথিমধ্যে সেইরূপ সম্মান দেখাইবার আবশ্যক হইলে, প্রকৃত পক্ষে জানু পাতে না, কেবল জানু পাতিবার ভাণ করে। সাধারণতঃ অভিবাদন করিবার সময় ইহারা এমন ভাবে দাঁড়ায় যেন, হস্তদ্বারা মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে পারে।. চীনদেশে অভিবাদনের আটটি ধারা। অষ্টম ধারামতে সম্রাটকে অভিবাদন করিবার নিয়ম আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। চতুর্থ ধারা-

মতে জানু পাতিয়া বসিতে হয়। কিন্তু তৃতীয় ধারা মতে কেবল জানু বাঁকাইলেই চলে। সুণ্ডজাতির মধ্যে সম্ভ্রান্তগণের পত্নীরা স্বামীর সহিত কথা কহিবার সময় দুই হাতে হাঁটু ধরিয়া অবনত ভাবে দাঁড়ায়। সামোয়া দেশে দরবারে সোজা হইয়া চলিলে রাজাকে অসম্ভ্রম করা হয়, এইজন্য দেহ অবনত করিয়া চলিতে হয়। পূর্ব্বে মেক্সিকো দেশেও এই রীতি ছিল। যুক্তকরে অবনত ভাবে দাঁড়ান চীনদেশীয় অভিবাদন রীতির দ্বিতীয় ধারা। মস্তক অবনত ও হস্ত উত্তোলন করিয়া সেলাম করিবার রীতি অদ্যাপি ভারতবর্ষে প্রচলিত। ইহার পরেই যে ঈষৎমাত্র মস্তক হেলাইয়া অভিবাদন করিবার রীতি ক্রমোন্নতির সহিত মানব সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, বোধ হয় আর বলিবার আবশ্যক নাই।

লোয়াঙ্গোদেশে রাজাকে দেখিলে লোকেরা হাততালি দেয়; উগাণ্ডা দেশে পা ছোঁড়ে, মুখ ঘসে ও মাটিতে হাত চাপড়ায়। দাহোমিদেশে এবং বালোণ্ডা জাতির মধ্যে যতক্ষণ রাজাকে দেখা যায়, ততক্ষণ কর তালি দিতে হয়। ফুয়েজি জাতি ও লোয়াঙ্গোর অধিবাসীরা প্রভু বা বন্ধু দর্শনে লাফাইতে থাকে। কারাগু জাতি রাজসমক্ষে চীৎকার করে ও লাফাইতে থাকে। এই অবস্থার পরেই ফিজি ও বগোটা দেশে ব্যবহৃত রাজদর্শনে নৃত্য করিবার রীতি যে প্রচলিত হইয়াছিল, অনুমান করা যাইতে পারে। কোন কোন দেশে রাজার সমক্ষে ভূমিচুম্বন করিতে হয়। এবো দেশে রাজা পথে যাইবার সময় লোকেরা জানু পাতিয়া তিনবার ভূমিচুম্বন করে। মেক্সিকো দেশেও এই রীতি প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে কোন কোন জাতির মধ্যে রাজার পদচিহ্ন চুম্বন করিবার প্রথা এক সময় প্রচলিত ছিল। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি যে সকল আচরণের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে, অল্প উন্নত ও সমকক্ষ ব্যক্তিদিগের প্রতি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তভাবে তাহারাই প্রযুক্ত হয়, স্মরণ রাখিতে হইবে। মাদাগাস্কারে পত্নীগণ স্বামীর এবং ভৃত্যেরা প্রভুর পদলেহন করে। পূর্ব্বে পেরু, মিসর ও আসিরীয়া দেশে এবং য়িহুদীজাতির মধ্যে রাজা বা প্রধানগণের পদলেহন বা পদচুম্বন করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। আরাবেরা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের চরণ, হাঁটু বা বস্ত্র চুম্বন করে। পারস্য ও তুরস্ক দেশে শাহ ও সুলতানের চরণ চুম্বন করিতে হয়। টঙ্গাদ্বীপে সাধরণতঃ হস্ত চুম্বন করিলেই চলে; কেবল অতি উচ্চপদস্থগণের চরণচুম্বন করিতে হয়। আরাব রাজমহিষীদিগের সহচরীরা কর্ত্রীর হস্ত চুম্বন করে। অভাব পক্ষে কোন কোন দেশে প্রভুকে

উদ্দেশ করিয়া আপন হস্ত চুম্বন করিবার প্রথা আছে। সমকক্ষ স্থলে বা স্নেহ ও প্রীতিভাজনকে মুখে বা কপোলে চুম্বন করিবার প্রথা সভ্য সমাজমাত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। গাভী বৎসকে লেহন করিয়া আনন্দ অনুভব করে। সেই লেহন কার্য্য উৎকৃষ্টতর হইয়া ক্রমে চুম্বনে পরিণত হইয়াছে। চুম্বনের পরিবর্ত্তে আঘ্রাণ লইয়া আনন্দ উপভোগ করিবার রীতি অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। জীবগণের মধ্যেও কেহ বা লেহন করে, কেহ বা আঘ্রাণ লয়। য়িহুদি ইশাক কেবল ঘ্রাণে যাকুবের পরিচয় পাইয়াছিলেন। মোগলেরা সন্তানের মস্তক আঘ্রাণ করে। ফিলিপাইন দ্বীপে বিচ্ছেদ সময়ে প্রণয়িগণ পরস্পর প্রদত্ত বস্ত্রের ঘ্রাণ লয়। চট্টগ্রামের পাহাড়ীয়া চুম্বনের পরিবর্ত্তে গালের উপর মুখ ও নাক রাখিয়া সজোরে নিশ্বাস টানে। ব্রহ্মদেশেও এইরূপ। সামোয়া জাতি নাকের উপর নাক রাখিয়া ঘ্রাণ লয়; কিন্তু প্রভু-পক্ষে কেবল হস্ত-ঘ্রাণের ব্যবস্থা। নবজিলাণ্ডবাসিদিগের এবং এস্কিমোজাতির মধ্যে নাকের উপর নাক রাখিয়া ঘ্রাণ লইয়া অভিবাদন করিতে হয়। হিন্দুরা মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করে।

সাহেবেরা টুপি খুলিয়া পরস্পরকে সম্ভাষণ করে। অসভ্যদিগের আলিঙ্গন সাহেবদের করস্পর্শনে যেমন পরিণত হইয়াছে, অসভ্যদিগের বস্ত্রত্যাগ তেমনি সাহেবদিগের টুপি খোলার প্রথম স্তর। সুদান দেশের অন্তর্গত মেলি প্রদেশের সুলতানের সহিত সাক্ষাত করিবার সময় স্ত্রীলোকদিগকে উলঙ্গ হইয়া যাইতে হয়; রাজকন্যাদিগের প্রতিও এই নিয়ম। উগাণ্ডাদেশে রাজার দাসীদিগকে উলঙ্গ থাকিতে হয়। আবিসিনিয়ায় উচ্চশ্রেণীর লোক দেখিলে কোমর পর্য্যন্ত কাপড় খুলিতে হয়। পলিনেসিয়াতেও এই রীতি লক্ষিত হয়। টাহিটী দ্বীপে রাজসমক্ষে এবং মিত্রদ্বীপসমূহে সর্দ্দার সমক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা। গোলড্‌কোষ্টে দক্ষিণ স্কন্ধের কাপড় খুলিতে হয়; কিন্তু বিশেষ সম্মান দেখাইবার সময় উভয় স্কন্ধের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া থাকে। যরুবা দেশেও এই রীতি।

সামোয়া জাতির পুরুষেরা দীর্ঘ কেশ ধারণ করে, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে দীর্ঘ কেশ নিষিদ্ধ। টানা, লিফু, ভেট ও তাসমেনিয়াতেও এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বিধবাদিগের দীর্ঘ কেশ নিন্দাজনক। টাহিটী ও নবজিলাণ্ডে সামোয়াদিগের মত পুরুষেরা দীর্ঘ এবং রমণীগণ ক্ষুদ্র কেশ ধারণ করে। আমাদের দেশে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে মস্তক মুণ্ডিত করিতে হয়। ডাকোটা জাতিরও এই রীতি। কারিব জাতির পরিবারে কাহারও মৃত্যু হইলে

তাহারা চুল ছাঁটিয়া ফেলে। গ্রীক ও রোমানেরাও এইরূপ করিত; কিন্তু য়িহুদী জাতি আমাদের মত মুণ্ডিত-মস্তক হয়। য়িহুদি ও রোমানেরা আমাদের মত মাথার চুল দিয়া দেবতার পূজা করিত। পেরুদেশেও এই রীতি প্রচলিত ছিল। আরাবেরা অদ্যাপি এই রীতির অনুসরণ করিয়া থাকে। কোন কোন জাতির মধ্যে মৃত্যু উপলক্ষে ভ্রূ ও চক্ষুর পাতা ফেলিয়া দিতে হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফ্রান্সদেশে শ্মশ্রুর দুচারি গাছি কেশ উৎপাটন করিয়া সম্ভ্রান্তদিগের সম্মান করিতে হইত। প্রাচীন কালে ইংলাণ্ডের সামন্তগণ রাজাকে আপন আপন শ্মশ্রু উপহার দিত। হিন্দুগণ দেবতার উদ্দেশে প্রয়াগে মস্তক মুণ্ডন করে। নবকালিডোনিয়া ও তুরস্ক দেশে শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। টঙ্গা ও জাপানদ্বীপে দীর্ঘ কেশ সম্ভ্রমসূচক। প্রাচীন রোম ও গ্রীস দেশে ক্ষুদ্রকেশ গোলামের লক্ষণ ছিল। সুটকাদ্বীপে ও কারিব জাতির মধ্যে অদ্যাপি গোলামদিগের ক্ষুদ্র কেশ ধারণের রীতি দেখিতে পাওয়া যায়।

বীরত্বের চিহ্ন গৌরব বৃদ্ধি করে এবং শত্রুকে তটস্থ করিয়া ফেলে। বংশগৌরব বৃদ্ধি হেতু বংশানুক্রমে পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি-চিহ্ন রক্ষা করা সভ্য সমাজেও দেখিতে পাওয়া যায়। এটী মানবপ্রকৃতির সহজ বাসনা। অসভ্য সমাজে ইহার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি। অসভ্যদিগের অলঙ্কারপ্রিয়তা এবং উল্কি পরিবার কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সে ইচ্ছাও বিজয়চিহ্ন পরিধান করিয়া গৌরবলাভ লোভে অনেক স্থলে জন্মিয়া থাকে।

ভেটদেশে যাহার ঘরে যত জন্তুর অস্থি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তত সম্মান। সোশোন জাতির মধ্যে বড় একটী ভালুক মারিয়া তাহার নখ পরিতে পাইবার মত গৌরব আর নাই। মিসমি জাতির যাহার ঘরে জীবজন্তুর যত মস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তত সম্মান ও তত সম্পদ লাভ হয়। সাঁওতাল ও খসিয়াদের ঘরে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতির চর্ম্ম সর্ব্বদা লম্বমান দেখা যায়। সাঁওতালেরা পুরুষানুক্রমে উহা যত্নের সহিত রক্ষা করে। আবার জীবজন্তু অপেক্ষা মনুষ্য-শত্রুর বিজয়-চিহ্ন অধিকতর সম্মানজনক এবং সেরূপ চিহ্ন ভিন্ন কে কত শত্রু মারিল, জানিবার অন্য উপায় নাই। আসান্টিবাসীরা শত্রুর দন্ত ও অন্যান্য অস্থি অলঙ্কাররূপে পরিধান করে। উত্তর আমেরিকার সিরি এবং ওপাটা জাতি শত্রুর মাংস ভক্ষণ করিয়া অস্থিগুলি রক্ষা করে। মেক্সিকোর চিচিমেক জাতির প্রত্যেকের নিকট এক এক খানি হাড় থাকে, যে যত শত্রু

মারে, তাহাতে ততগুলি দাগ দেওয়া থাকে। ইহারা শত্রুর মস্তক একটা খোঁটায় বসাইয়া সকলে চারিদিকে নৃত্য করে। আবিপোন জাতি যুদ্ধ হইতে ঘরে ফিরিবার সময় শত্রুর মস্তকগুলি ঘোড়ার জিনে বাঁধিয়া আনে। শত্রুর মস্তকে ঘর সাজাইবার প্রথা মুণ্ডুরুকু জাতি, নবজিলাণ্ড, আসান্টি ও কঙ্গোতট-বাসিদিগের এবং ভারতবর্ষীয় কুকিদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। দাহোমি রাজার শয়নকক্ষে বিস্তর নরমুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। রাজার ঘর ছাইবার প্রয়োজন হইলে শত্রুর মস্তক দিয়া ছাইয়া দিতে হয়। নৃমুণ্ডমালিনী হিন্দুদিগের দেবতা। অনেক মস্তক একত্র রক্ষা করা কঠিন বলিয়া শত্রুদেহের অন্যান্য অংশ রক্ষা করিবার প্রথা ক্রমে প্রচলিত হয়। আসান্টি, টাহিটী ও ভেটংশ এবং নবগিনের পাপুয়ানদের মধ্যে শত্রুর চিবুকের অস্থি রক্ষা করিবার রীতি আছে। চিবুকের অস্থি টুপি জাতি বালার মত হাতে পরে। শত্রুর দন্তে মালা গাঁথিয়া কারিব জাতি হাতে ও পায়ে পরে। টুপি জাতি বন্দীর মাংস ভক্ষণ করিয়া তাহার দাঁতের মালা গলায় পরে। স্বামী কর্তৃক যুদ্ধে হত শত্রুর দাঁতের মালা [illegible] অলঙ্কাররূপে ব্যবহার করে। স্পানিয়ার্ড দিগের দাঁত লইয়া মধ্য আমেরিকার [illegible] ঠাকুরের দাঁত গড়িয়াছিল। তাতারেরা শত্রুর দক্ষিণ কর্ণ এবং মন্টিনিগ্রো দেশে নাক কাটিয়া লয়। য়ুকেতনে গায়ের চর্ম্ম উঠাইয়া লয়। পূর্ব্বে মেক্সিকো দেশে এই নিয়ম ছিল। আবিপোন জাতি মস্তকের চর্ম্ম উঠাইয়া লয়। সোশোন জাতি মাথার খুলি উঠাইয়া লয়। আমাদের নাগা জাতি এইরূপ করে। পূর্ব্বে সিথিয়ানেরা এইরূপ করিত। মাণ্ডান ও কোচিমি জাতি মাথার চুল কাটিয়া লয়। কালিফর্ণিয়ার ইণ্ডিয়ান সিরি ও ওপাটা জাতি হাত পা কাটিয়া লয়। পূর্ব্বকালে মিসর ও থিব্‌স্ দেশে এবং বোধ হয় ভারতবর্ষেও এই রীতি প্রচলিত ছিল।

ফিজি দ্বীপে রাজার সহিত দেখা করিতে প্রজারা মাথার বিউনি কাটিয়া যায়; এবং রাজার ক্রোধ হইলে হাতের অঙ্গুলি কাটিয়া তাহাকে উপহার দিয়া ক্রোধ শান্তি করে। চারুবা জাতির পরিবার মধ্যে কর্ত্তার মৃত্যু হইলে স্ত্রী কন্যা ও সধবা ভগ্নিগণ আঙ্গুলের এক একটী পর্ব্ব কাটিয়া ফেলে। মাণ্ডান, দাকোটা প্রভৃতি আমেরিকার অনেক জাতির মধ্যে এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। পীড়া শান্তির জন্য টঙ্গা জাতি অনামিকার কিয়দংশ কাটিয়া দেবতার পূজা দেয়। অষ্ট্রেলিয়ানেরা স্ত্রীলোকদিগের অনামিকার একটী পর্ব্ব কাটিয়া দেয়। হটেণ্টট দেশে বিধবা স্ত্রী যত বার বিবাহ করে, ততগুলি আঙ্গু

লের উপরের পর্দ্দা কাটিয়া ফেলিতে হয়। পূর্ব্বে মেক্সিকো দেশে মিথ্যাবাদীর ঠোঁট বা কাণ কাটিয়া দিত। য়িহুদী জাতির মধ্যে, জাপান দেশে এবং পূর্ব্বে য়ুরোপে গুরুতর অপরাধে হাত কাটিয়া দিত। হণ্ডুরাস দ্বীপে চোরের হাত ও কাণ কাটিয়া দেয়। মিজটেক জাতি ব্যভিচারীর নাক, কাণ ও ঠোঁট কাটিয়া দেয়। বোধ হয় পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে চোরের নাক কাণ কাটিয়া দেওয়া হইত। অনেক জাতির মধ্যে ক্রীতদাসদিগের নাক কাণ কাটিয়া দিবার প্রথা আছে। ক্রমে তাহারও উন্নতি হইয়া নাক বা কাণ ফুঁড়িয়া দিবার রীতি হই-য়াছে। ব্রহ্মদেশে ও ভারতবর্ষে শিশুর নাক কাণ ফুঁড়িয়া দেবতাবিশেষের ভৃত্যরূপে নির্দ্দেশ করা হয়। গোন্দ জাতি দুই হাতে কাণ ধরিয়া অধীনতা প্রকাশ করে। পূর্ব্বে আসিরিয়া দেশে নাক ফুঁড়িয়া মানুষের বা দেবতা বিশেষের ক্রীতদাস করিয়া দেওয়া হইত। অদ্যাপি আস্থাকানে এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। সাণ্ডুইচ দ্বীপে সর্দ্দারের মৃত্যু হইলে প্রজারা কাণ কাটিয়া ফেলে বা একটি দাঁত ফেলিয়া দেয়। নব দক্ষিণওয়েল্‌স্ দেশে পুরোহিতেরা এক একটি দাঁত ফেলে এবং অষ্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্তবয়স্ক হইলে সকলকে এক একটি দাঁত ফেলিতে হয়। আফ্রিকায় বাটোকা ও ডোর জাতির মধ্যে এই রীতি। প্রাচীন পেরু দেশে রাজাজ্ঞা অনুসারে প্রজাদিগকে প্রত্যেক পাটির তিন তিনটি দাঁত ফেলিয়া দিতে হইত। কেশ ত্যাগ করিয়া সম্রাটদিগের বা দেবগণের সম্ভ্রম রক্ষা করার রীতি প্রাচীন পারস্য, ফ্রিজিয়া, ফিনিসিয়া এবং মেক্সিকো দেশে দেখা যায় এবং অদ্যাপি হটেণ্টট্ ও অষ্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানদের ত্বকচ্ছেদ করিবার নিয়ম সকলে অবগত আছেন। এই প্রথা পৃথিবীর নানা স্থানে, টঙ্গা, টাহিটি ও মাদাগাস্কর দ্বীপে, নবকাল্‌ডোনিয়া ও ফিজিবাসী নিগ্রিটো জাতির মধ্যে, আবিসিনিয়ার উত্তরাংশ হইতে কাফির দেশের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত আফ্রিকার সর্ব্বত্র, আমেরিকার মেক্সিকো ও যুকে-তনবাসী কোন কোন জাতির মধ্যে এবং সান সাল্‌ভেডর ও অষ্ট্রেলিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। আবিসিনিয়ায় মৃতশত্রুর ত্বকচ্ছেদন করিয়া রাজাকে উপহার দেয়। পূর্ব্বে য়িহুদা ও ফিনিসিয়া দেশে ত্বকচ্ছেদন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

ফিজিয়ানেরা শত্রুর রক্ত পান করে। আমাপোণ্ডা কাফিরদিগের মধ্যে ভ্রাতা বা অন্য কোন নিকট আত্মীয়ের রক্তে রাজাকে অভিষেক করিতে হয়। ভারতবর্ষে অনেক দেবতাকে ছাগ-রক্ত খাইতে দেয়। কখন কখন সন্তানের মঙ্গল কামনায় মাতৃগণ আপন বক্ষ চিরিয়া রক্ত দানে দেবতাদিগকে তুষ্ট

করেন। প্রাচীন য়িহুদা, গ্রীক, হূন ও তুর্কি জাতির মধ্যে অন্ত্যেষ্টিসময়ে আত্মীয় স্বজনেরা আপন আপন রক্তপাত করিত। গ্রীক ও য়িহুদা জাতির কোন কোন দেবতাকে নরশোণিতে তুষিত করিতে হইত। সামোয়া জাতির বিবাহ সময় কন্যাযাত্রেরা প্রস্তরাঘাতে আপন আপন দেহ হইতে রক্তপাত করে। মধ্য-আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা বন্ধু দেখিলে মস্তক হস্ত বা জিহ্বা হইতে শোণিতপাত করিয়া বন্ধুর অভ্যর্থনা করে। অস্ট্রেলিয়ায় কয়েক মাস বিচ্ছেদের পর, পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ কালে জননীরা আপন মুখে এমন আঘাত করে যে, দরদর করিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। এইরূপ ক্ষত করিয়া রক্তপাত করা হইতে আণ্ডামান প্রভৃতি দ্বীপে পিতৃভক্তি, দেবভক্তি বা সর্দারভক্তি দেখাইবার জন্য পূর্ব্বে উল্লিখিত উল্কি পরিবার প্রথা অনেক পরিমাণে উদ্ভূত হইয়াছে। যুদ্ধে যে যত শত্রু মারিতে পারে, বেকুয়ানা পুরোহিতেরা তাহার উরুদেশে ততগুলি ক্ষত করিয়া দেয়। বাচাপিন কাফিরদিগের মধ্যেও এই রীতি আছে। দামারা জাতির বালকেরা এক একটী বন্য জন্তু বধ করিলে তাহাদের পিতা, দেহের সম্মুখভাগে চার চারিটি দাগ করিয়া দেয়। ক্রমে ক্ষত বা উল্কি সাহসের চিহ্ন রূপে গণ্য হয়। তখন কাপুরুষেরাও সম্মান লাভের আশায় দেহ ক্ষত করে।

---

# একাদশ পল্লব।

এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা বলেন, কর্ত্তব্য-জ্ঞান স্বাভাবিক। হিতাহিত ন্যায় অন্যায় কেহ বুঝাইয়া না দিলেও মনুষ্য আপনি বুঝিতে পারে। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক ও সদা পূর্ণ না হইলে পুণ্যের গৌরব থাকে না, পাপে ভয় জন্মে না, স্বর্গ নরকের আবশ্যকতা থাকে না, দণ্ড পুরস্কারের অর্থ থাকে না ; সুতরাং দায়ে পড়িয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহজতা স্বীকার করিতে হয়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অবস্থাসাপেক্ষ হইলে যাহা আমার নিকট পুণ্য তাহা তোমার নিকট পাপ বলিয়া বোধ হইতে পারে। যদি আমার ধর্ম্মদৃষ্টি অপ্রখর হয়, যদি তাহার প্রখরতা কালসাপেক্ষ হয় তাহা হইলে দুষ্ক্রিয়ার জন্য আমি দণ্ডনীয় হইতে পারি না। অপর শ্রেণীর দার্শনিকেরা বলেন, আদৌ মনুষ্যের হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। প্রথমাবস্থায় বন্য জীবের ন্যায় যাহা ইচ্ছা হইয়াছে, তাহাই করিয়াছে—ক্রমে কোন কর্ম্মে

সুবিধা, কোন কর্ম্মে অসুবিধা, কোনটিতে লাভ, কোনটিতে লোক্‌সান, কাজ করিতে করিতে মনুষ্য বুঝিতে পারে—যতই দূরদর্শিতা বৃদ্ধি হয়, ততই লাভ জনক ও ক্ষতিকারক কার্য্য মনুষ্য চিনিতে পারে। লাভজনক কার্য্য কর্ত্তব্য এবং ক্ষতিকারক কার্য্যই অকর্ত্তব্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পড়ে। লাভ জ্ঞান হইতে কর্ত্তব্য জ্ঞানের উদয়। প্রত্যেকে আপন লাভ বুঝিতে পারে না। যাহাতে সাধারণ সমাজের লাভ হয়, তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হয়। চুরি, ব্যভিচার পরনিন্দা, অসত্যকথন যতদিন সামাজিকতার ক্ষতিকারক বলিয়া লোকে বুঝিতে পারে নাই, তত দিন এতৎসম্বন্ধে লোকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছে; বুদ্ধির উন্নতি ও দূরদর্শিতার শ্রীবৃদ্ধির সহিত সেগুলি যতই ক্ষতিকারক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, ততই তাহাদিগকে নিন্দনীয় বলিয়াছে, নিবারণ করিয়াছে। রাজা ক্ষতিকারক কার্য্য হইতে লোকদিগকে নিবারণ করেন। সাধারণে যাহা ক্ষতি-কারক বা অন্যায় বলিয়া বুঝে, রাজা দণ্ড দ্বারা তাহা হইতে প্রজাদিগকে নিবৃত্ত রাখেন। ভিন্ন সময়ে ভিন্ন দেশে ভিন্ন অবস্থায় লোকে ক্ষতি ও লাভের নিরা-করণ বিভিন্নরূপে করিয়া থাকে। সুতরাং চীনদেশে যাহা পাপ, ফরাসী দেশে তাহা পুণ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ক্রমে বিভিন্ন সমাজ যত একাকার প্রাপ্ত হয়, পাপপুণ্য ততই এক প্রকার মানদণ্ডে পরিমিত হইতে থাকে। আবার প্রথমে যাহা দূরদর্শিতায় পূর্ব্বপুরুষেরা শিখিয়াছিলেন, সেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুমণ্ডলি বিভিন্ন রূপে পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, তাঁহাদের বংশধরেরা জন্ম হইতে তাঁহাদের দেহগত ব্যাধির ন্যায় মনোগত জ্ঞানও কিয়ৎ পরিমাণে অধিকার করেন। এতদিনে সহস্র সহস্র পুরুষ অতীত হইয়াছে, প্রথম পুরুষদিগের নিকট যাহার জ্ঞান আদৌ লেশ মাত্র ছিল না, দূরদর্শিতায় যাহা কিছু লাভ হইয়াছিল, তাঁহাদের পরবর্ত্তী পুরুষদিগের আপন আপন দূরদর্শিতায় ও রাজা-জ্ঞায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইত। কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মাধিকারেও লাভ হইয়াছিল। উত্তরোত্তর এইরূপে শ্রীবৃদ্ধি হইয়া এখন সভ্য সমাজে কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মগত, সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়ি-য়াছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি, সতীত্বের আদর সকল বন্য সমাজে নাই। চরিত্রের সততা রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া অনেক জাতি বুঝে না। অন্যান্য বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তি, ভাষা, আচার ও ব্যবহারে যেমন আমরা অসভ্যদিগের একটী সাধারণ অবস্থা নির্ণয় করিতে পারি নাই, সচ্চরিত্রতা ও সুনীতি সম্বন্ধে তেমনি একটী

রেখা টানিয়া বলিতে পারিব না, ইহাই অসভ্যদিগের সাধারণ চরিত্র। বিভিন্ন সমাজ অসভ্যদিগের মধ্যেও বিভিন্ন; সুতরাং এক সমাজে সুনীতি বা সচ্চরিত্রতার যেমন অপলাপ, অন্য অসভ্যদিগের মধ্যে সেরূপ না থাকিতে পারে। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন পরিমাণে উন্নত। কেবল ইহা দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে, সভ্য সমাজে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, চরিত্রের সততা, সুনীতিপ্রিয়তা যত উন্নতি লাভ করিয়াছে, কোনও অসভ্য জাতি সেরূপ করে নাই। বস্তুতঃ ক্রমোন্নতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া যাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট একথা উল্লেখ করিবার সার্থকতা নাই।

টঙ্গা জাতির ভাষায় সুবিচার অবিচার সদয়তা বা নিষ্ঠুরতা বাচক কোন শব্দ নাই। তাহারা চুরি, হত্যা, বলাৎকার বা মিথ্যা সাক্ষে দোষ বলিয়া মনে করে না। বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক জাহাজ লুটিয়া মাল্লাদিগকে হত্যা করা অন্যায় কার্য্য নহে। কুমারীদিগের পক্ষে ব্যভিচার পাপ নয়। তবে বারম্বার প্রণয়ী পরিবর্ত্তন করা ভাল দেখায় না। স্বামীর ইচ্ছা হইলে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে। পাপ করিলে পরকালে দণ্ড হয়, ইহা তাহারা জানে না। উত্তর আমেরিকার শিউকস জাতি চুরি, হত্যা, গৃহদাহ ও বলাৎকার করা গৌরব লাভের উপায় বলিয়া বিবেচনা করে। নরহত্যা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া অভিভাবকেরা শিশুদিগকে শিক্ষা দেয়। নাচিবার বা আমোদ করিবার সময় কে কত চুরি করিয়াছে, লুণ্ঠন করিয়াছে, তাহার পরিচয় দেয়। নরনারী বা শিশু একটী মনুষ্য বধ করিতে পারিলে ইহারা মাথায় একটী পালক পরিতে অধিকার দেয়। যে যতগুলি হত্যা করিয়াছে, তাহার মাথায় ততগুলি পালক। টাহিটী দ্বীপে যতগুলি সন্তান জন্মে, তাহার অন্ততঃ দশ আনা রকম পিতা মাতা হত্যা করে। এমন জননী নাই, যাহার হস্ত আপন সন্তানের রক্তে কলঙ্কিত নহে। যুদ্ধ করিতে বা মাছ মারিতে বালিকাগণ বালকের মত সক্ষম নহে। এজন্য বালিকা হত্যার পরিমাণ কিছু অধিক। বৃদ্ধ পিতা মাতাকে বধ করিয়া জীবন্মুক্তি দিবার রীতি নানা অসভ্য সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। তাসমেনিয়ার অধিবাসিদিগের কিছুমাত্র বিবেক বুদ্ধি নাই। যাহার উপর অত্যাচার করা যায়, সে যে প্রতিশোধ দিবে, তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকিলে কোন কর্ম্মই দুষ্কর্ম্ম বলিয়া অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা মনে করে না। প্রতিশোধ সহ্য করিবার ক্ষমতা অনুসারে ইহারা কার্য্য বিশেষের ন্যায় অন্যায় নির্দ্দেশ করে। পাপ কাহাকে বলে তাহারা বুঝে না। পূর্ব্ব আফ্রিকার লোকদিগের বিবেক বুদ্ধি আদৌ নাই।

সেখানে অনুতাপের অর্থ—দুষ্ক্রিয়া করিবার সুবিধার অভাব হেতু দুঃখ। সেখানে দস্যুগণের বিশেষ সম্মান। এবং নরহত্যা করিতে পারিলে বীরপুরুষের আখ্যা পাওয়া যায়। আফ্রিকার পশ্চিমতটবর্ত্তী যকবা নিগ্রোজাতি লোভী, নির্দ্দয় ও বিবেকবুদ্ধিশূন্য। টেক্সাসের কোমাঞ্চি জাতি যত ক্ষণ সর্দ্দার নিষেধ না করে, ততক্ষণ কোন কার্য্য অপকর্ম্ম বলিয়া মনে করে না। যাহার যাহা রুচি হয়, সে তাহাই করে। আমাদের দেশে কাছাড়ী জাতির ভাষায় প্রার্থনা, ভক্তি, অনুতাপ বা পাপ সংজ্ঞাপক কোন শব্দ নাই কাফির জাতি দেশ অরাজক হইলে যথেচ্ছ ব্যবহার অন্যায় মনে করে না। মধ্য আফ্রিকায় ও জাম্বেশী নদীর তটবাসী বনায়ে জাতির মধ্যে এবং সাণ্ডুইচ দ্বীপসমূহে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্য ভারতবর্ষের শবরজাতির বিবেক বুদ্ধি নাই।

দক্ষিণ আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে পারে না। এবং কার্গোর ফসাক ন দণ্ড পুরস্কারের আশা বা আশঙ্কা করে না।

জাতীয় দেবতাদিগের চরিত্র আলোচনা করিলে জাতীয় চরিত্রের কিয়ৎ পরিমাণে আভাস পাওয়া যায়। ফিজিদিগের একটী দেবতা রাত্রিযোগে সুন্দরী বা সম্ভ্রান্ত রমণীদিগকে অপহরণ করিয়া থাকে। নরহত্যা প্রভৃতি বিভিন্ন পাপাচারের এক একটী দেবতা আছে। পেরুদেশের দেবচরিত্রও এইরূপ। সাধারণতঃ গ্রীক দেবতাগণ বড় অসচ্চরিত্র। যাহাদিগের আপন চরিত্র এরূপ কলঙ্কিত, তাহারা পাপপুণ্যের কিরূপ বিচার করিবে, অনুমান করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষীয় কোন কোন দেবতার চরিত্র বড় অপবিত্র, এবং অহল্যা প্রভৃতি সতীগণের আদর্শস্থানীয়া। গিনী নিগ্রোদিগের ভবিষ্যৎ দণ্ডপুরস্কারে কোন বিশ্বাস নাই। টাহিটীর লোকেরা স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাস করে। সম্ভ্রান্ত উচ্চ পদস্থ লোকেরা স্বর্গে বাস করে। নরক অপর সাধারণের আবাসস্থল। টঙ্গা ও হুকাহীবা দেশের লোকেরা মনে করে সর্দ্দারদিগের আত্মা অমর। কিন্তু সাধারণ লোকের আত্মা সেরূপ নহে। ফিজিদ্বীপের লোকেরা দোষীর পদের উচ্চতা অনুসারে, দোষের গুরুত্ব লঘুত্বের পরিমাণ করে। সর্দ্দার কর্ত্তৃক নরহত্যা অপেক্ষা সাধারণ লোক কর্ত্তৃক সামান্য দোষ গুরুতর বলিয়া গণ্য হয়। মানব ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিলেই যে দোষের যথেষ্ট দণ্ড হইত, সেই দোষে শূদ্রের পক্ষে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। সুমাত্রাবাসিদিগের মতে স্বর্গ কেবল ধনবানের জন্য নির্দ্দিষ্ট। দরিদ্রের সেখানে প্রবেশ করিতে অধিকার নাই। কুকীরা স্বর্গ বা নরকের সত্ত্বায় বিশ্বাস করে না। অন্যায়

কার্য্য করিলে পরকালে দণ্ড পাইতে হয়, ইহা তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। গোণ্ড ও সিংহলের ব্যাধ জাতির বিশ্বাস এইরূপ। মধ্য ভারতবর্ষের হোস জাতিদিগের মতে সকলেই মরিয়া ভূত হয়, সাধু অসাধুর দণ্ড পুরস্কার তাহারা বুঝে না। দাক্ষিণ আফ্রিকার হটে-টটদেরও দণ্ডপুরস্কারে বিশ্বাস নাই। কাফির-দিগেরও এই মত। দাহোমির অধিবাসীরা বলে, যে অন্যায় করিয়া রাজার নিকট অব্যাহতি পায়, পরকালেও তাহাকে কোন দণ্ড সহ্য করিতে হয় না। মেক্সিকো ও পেরু দেশের লোকদিগের মতে ধর্ম্মের সহিত ন্যায় অন্যায়ের কোন সংস্রব নাই। সাইবিরীয়ার লোকদিগেরও এই মত। আফ্‌গান ও আরা-বেরা বলে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হইলে যেখানে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, কেবল সেই স্থানেই দুর্দ্দৈব ঘটে। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরাও পরকালে পাপের দণ্ডে বিশ্বাস করে না।

এক্ষণে অসভ্য সমাজের পরিচালন জন্য কিরূপ বিধিব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। যতদিন মনুষ্য স্বতন্ত্রভাবে বাস করে, ততদিন সমাজবন্ধন হয় না। আপন আপন স্বাতন্ত্র্য খর্ব্ব করিয়া বিভিন্ন পরিবার যত ঘনিষ্ঠ হয়, তত সমাজবন্ধন দৃঢ় হয়। সমাজবন্ধন না হইলে বিধি ব্যবস্থার আবশ্যক হয় না। সমাজ যত দৃঢ় বদ্ধ হইতে থাকে, বিধি-ব্যবস্থার অনুল্লঙ্ঘনীয়তা তত অধিক হয়। উল্লঙ্ঘনের দণ্ড তত গুরুতর হয়।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বন্যগণ আর সকল বিষয়ে স্বতন্ত্র হইলেও বেশভূষা সম্বন্ধে স্ব স্ব ভাব অনুবর্ত্তন করে না। সকলে জাতীয় প্রথা মত উল্কি পরে, অলঙ্কার ও বস্ত্র ব্যবহার করে। বেশভূষাজনিত গৌরবপ্রিয়তা স্বস্বভাবানুবর্ত্তী বন্যদিগকে একত্র করে। ক্রমে অন্যান্য রীতিনীতিও বেশভূষা মত দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া উঠে। সেই সকল রীতিনীতি উন্নত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া ভবিষ্যতে বিধি ব্যবস্থা, আইন, কানুন বা রাজাজ্ঞার আকার ধারণ করে। অন্যান্য সকল বিষয়ে অসভ্যদিগের হীনতা স্বীকার করিলেও সাধারণ লোকে অসভ্যদিগের স্বাধীন জীবনের বড় গৌরব করিয়া থাকেন। এটী তাঁহাদের ভ্রম। অসভ্যগণ সহস্র প্রথার দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সে প্রথা বা রীতি নীতিগুলি অবশ্য পালনীয়; নতুবা স্বজাতিগণের উৎপীড়নে জীবন রক্ষা করা ভার হয়। দক্ষিণ আমে-রিকার অম্বরজাতি সধবা স্ত্রীলোকদিগকে গরু বা বানর মাংস খাইতে দেয় না এবং এক ফুটের অধিক লম্বা মৎস্য বা মাংস ভক্ষণ কুমারীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ।

টাহিটী দ্বীপে পুরুষেরা শূকর, কুক্কুট, মৎস্য, নারিকেল, কদলী যাহা কিছু দেব-তাকে উৎসর্গ করা যায়, সকলই খাইতে পারে। কিন্তু রমণীগণ ইহার কোনটী স্পর্শ করিলে তাহাদের প্রাণদণ্ড হয়। যে আগুনে পুরুষদিগের খাদ্য সিদ্ধ হয়, সে আগুনে স্ত্রীলোকেরা আপনাদিগের খাদ্য রন্ধন করিতে পারে না। যথা-কথঞ্চিৎ অতি গোপন নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া তাহাদিগকে খাইতে হয়। রুসি-য়ান আমেরিকার অধিবাসীরা অস্থিসকল আগুনে নিক্ষেপ করে না বা কুক্কুরকে খাইতে দেয় না। অস্থি যত্নে [illegible] শিকারে আর কখন সফল হইতে পারিবে [illegible] নিকট-বর্ত্তী [illegible] স্পর্শ করা, শিশুপক্ষী বধ করা, বা মৃত্তিকায় মদ্যপাত করা, লাগাম দিয়া ঘোড়াকে মারা, বা হাড় দিয়া হাড় ভাঙ্গা দোষজনক মনে করে। পূর্ব্বে রোমান যাজকেরা কুক্কুর, ছাগল, কাঁচা মাংস বা কলাই স্পর্শ করিতে বা তাহাদের নামও মুখে আনিতে পারিত না। কাপড়ে গ্রন্থি দেওয়া তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। ক্ষৌর কার্য্যের পর তাহাদের নখ ও কেশ বৃক্ষ বিশেষের মূলে কবর দিতে হইত। আলগনকিন ইণ্ডিয়ানেরা যুদ্ধে যাইবার সময় মাটির উপর বসে না। অন্ততঃ কয়েকটী তৃণ বিছাইয়া লয়। যুদ্ধপথে পা ভিজাইতে নাই। যদি নিতান্তই জলা প্রভৃতি পার হইতে হয়, পা না ভিজাইলে চলে না, অন্ততঃ পরিধেয় শুষ্ক রাখিতে হয়। এবং জল পার হইলে ঘাস বা লতা দিয়া পায়ে প্রহার করিতে হয়। পথে জলপানের জন্য যাইবার সময় পাত্রের যে দিক ব্যব-হার করা হয়, আসিবার সময় তাহার বিপরীত দিক ব্যবহার করিতে হয়। এবং বাটীতে প্রত্যাগত হইলে, হয় পাত্রটী ফেলিয়া দিতে হয়, না হয় গাছে তুলিয়া রাখিতে হয়। অসভ্যদিগের মধ্যে শিকারের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে। গ্রীণলাণ্ডে একজনের হস্তে আহত হইয়া, একটী সীল মৎস্য যদি আর জনের হস্তে হত হয়, তথাপি সে প্রথম ব্যক্তির। কিন্তু অস্ত্রখানি মৎস্যের গাত্রে বিঁধিয়া থাকিলে, এবং আপনা হইতে মৎস্য মরিয়া যাইলে, সে কুড়াইয়া পায় মৎস্য তাহার; কিন্তু অস্ত্রখানি আহতকারীকে ফিরিয়া দিতে হয়। কয়েক জনে মিলিয়া একটী বল্গা হরিণ হত করিলে, যাহার তীর বক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে, হরিণটী তাহার। খন্দজাতির মধ্যেও শিকারের কতকগুলি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। বন্যজন্তুর পশ্চাতে ধাবমান হইয়া, অন্যের অধিকার মধ্যেও প্রবেশ করিতে বাধা নাই। কিন্তু যাহার ভূমির উপর জন্তুটী বধ করা যায়, তাঁহাকে

কিঞ্চিৎ অংশ দিতে হয়। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সকল অসভ্য সমাজ-প্রচলিত রীতিনীতির উল্লেখ করিয়াছি, জাতি প্রথামত সকলকেই সেইগুলি প্রতিপালন করিতে হয়। রীতিগুলি যেমন হউক না কেন, অসভ্য সমাজে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাই যে, সকলেই ধারাবাহিক প্রথামত তোমাকে বন্দনা বা অভ্যর্থনা করিবে। কেহ স্বাবলম্বনে সমর্থ নয়। টঙ্গানদিগের রাজার ব্যবহারের জন্য কতকগুলি শব্দ নির্দ্দিষ্ট থাকে। কি সাধ্য অন্যে তাহার একটী ব্যবহার করে। ইহারা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। রাজা, সম্ভ্রান্ত, মাতাবুল, মুয়া এবং টুয়া। সম্ভ্রান্তদিগের সন্তানেরা মাতৃসম্পত্তি লাভ করে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ সন্তান মাতাবুলদিগের উত্তরাধিকারী হয়। কেরোলীন দ্বীপের অসভ্যদিগের মধ্যে তিন শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। সমকক্ষ ব্যক্তি ভিন্ন শত্রুদলের অন্যান্যের প্রতি আক্রমণ করা ইহারা অগৌরব মনে করে। আর্য্য জাতির ন্যায় সামোয়ানেরা রাজাকে বহুবচনান্ত করিয়া সম্বোধন করে। ফিজি-দ্বীপে রাজা দৈববশাৎ পড়িয়া গেলে উপস্থিত সকলকেই পড়িয়া যাইতে হয়। পশ্চিম আফ্রিকার একবা নিগ্রোদিগের মধ্যে বিভিন্ন পদের লোককে এবং বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সম্বোধনে অভ্যর্থনা করিতে হয়। বালোণ্ডাজাতি উচ্চ পদস্থ কাহাকে দেখিলে তখনই ভূমিতে জানু পাতিয়া বক্ষে ও বাহুতে ধূলা মাখাইতে থাকে। এবং যতক্ষণ তিনি অন্তর্হিত না হন, ততক্ষণ করতালি দিতে থাকে।

যখন অসভ্যেরা মৃগয়ালব্ধ মাংসে উদরপূর্ণ করে, তখনও বনভূমির বিশেষ বিশেষ অংশ বিশেষ বিশেষ পরিবারের সম্পত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে দেখা যায়। কৃষিজীবী জাতিদিগের মধ্যে এইরূপ সম্পত্তি বিভাগ সকলেই দেখিয়াছেন। সমাজের প্রথমাবস্থায় সম্পত্তি ব্যক্তিগত নহে—জাতিগত। প্রথমে এক এক জাতির এক একটী সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেই জাতীয় সকলেই তাহার উদ্বৃত্ত উপভোগ করে। ক্রমে জাতীয় সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সম্পত্তি পরিবারগত হয়; সমাজের উন্নত অবস্থায় সম্পত্তি ব্যক্তিগত। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে ভূমিতে ব্যক্তিগত অধিকার দেখিতে পাওয়া যায় না। রুসিয়া দেশে স্থাবর সম্পত্তি গ্রামের সকলে মিলিয়া উপভোগ করে। কেবল অস্থাবর সম্পত্তিতে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অধিকার। নবজিলাণ্ডে ভূমিতে পূর্ব্বোল্লিখিত তিন প্রকার অধিকারী দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ইংলণ্ডে কোন কোন ভূমি বৎসরের কয়েক মাস ব্যক্তিবিশেষের অধিকার থাকিয়া, কিছুদিনের জন্য

সাধারণের উপভোগ্য বলিয়া গণ্য করা হইত। অদ্যাপি সারভিয়া, ক্রোয়েসীয়া, সাভোনীয়া প্রভৃতি য়ুরোপীয় প্রদেশসমূহে গ্রামের সমস্ত ভূমি সকলে মিলিয়া কর্ষণ করে। উপস্বত্ব সকলে বণ্টন করিয়া লয়। পেরুদেশে রাজা প্রতি বৎসর প্রজাদিগের মধ্যে ভূমিভাগ করিয়া দেন। বস্তুতঃ অস্থাবর সম্পত্তি অধিকারীর যেমন স্বায়ত্ত, এবং ইহা তিনি যেমন যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন, স্থাবর সম্পত্তিতে তাঁহার অধিকার অদ্যাপি তত অধিক হয় নাই। ভূসম্পত্তি-বিক্রয়-ক্ষমতা পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না। মৃত্যুপরে ভূসম্পত্তির অধিকার নির্দ্দেশ করা বর্ত্তমান অধিকারীর আয়ত্ত, ইহা অদ্যাপি অনেক দেশে স্বীকৃত হয় নাই। ফিজিদ্বীপে জীবনের সহিত সম্পত্তিতে অধিকার লোপ হয়। রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রাসাদে গিয়া যে যাহা পায় সে তাহা অপহরণ করে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, পলিনেসিয়া দ্বীপপুঞ্জে ও আফ্রিকার কোন কোন অংশে এক রাজার মৃত্যুর পরে অন্য রাজা হওয়া পর্য্যন্ত লোকেরা যে যাহা পারে সে তাহা লয়। পূর্ব্বে গ্রীনলাণ্ডে কাহারও মৃত্যুর সময় প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র না থাকিলে বিধবা ও নাবালক সন্তান সত্ত্বেও তাহার সম্পত্তি অধিকারীশূন্য বলিয়া অপর লোকে যথেচ্ছ ভাগ করিয়া লইত। পূর্ব্বে কি রোম কি গ্রীস কি ভারতবর্ষে কোথায়ও উইল করিবার ক্ষমতা ছিল না। অদ্যাপি ভারতবর্ষে অনেকেই এ অধিকার অবগত নহে। উইল অভাবে পূর্ব্বে জন্মমুহূর্ত্ত হইতে পৈতৃক বিষয় সন্তানের অধিকার গণ্য হইত। মিতাক্ষরার ব্যবস্থা এইরূপ। প্রাচীন জার্ম্মান শাস্ত্রেও এইরূপ বিধান ছিল। পলিনেসিয়ায় পিতা অপেক্ষা পুত্রের ক্ষমতা অধিক। মার্কয়েসাস এবং টাহিটী দ্বীপে সন্তান জন্মিলেই রাজা সিংহাসন পরিত্যাগ করিতেন। বোধ হয় এইরূপ কারণেই প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রকে সিংহাসন দিয়া প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয় রাজগণ অবসর লইতেন। বাসুট জাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার জীবন কালেও তাঁহার সম্পত্তি এবং অন্যান্য সন্তানের উপর আপন অধিকার খাটাইতে পারে। হয়ত এইরূপ কারণ হইতে সন্তানের নামানুসারে পিতা মাতাকে সম্বোধন করিবার প্রথা অনেক দেশে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকার কোন কোন অংশ, মাদাগাস্কার, আমেরিকা ও সুমাত্রা দ্বীপে অমুকের বাপ বা অমুকের মা বলিয়া সম্বোধন করিবার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়।

কন্যাগত সম্পত্তির কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্র নানা দেশে পিতার উত্তরাধিকারী হয় অথবা সকল সন্তানের মধ্যে পৈতৃক বিত্ত

বিভক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু কোথায় কোথায় অন্যরূপও দেখিতে পাওয়া যায়। তাতারদিগের কনিষ্ঠ পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী। কাফির আইনে পিতার প্রথম দুই পুত্র সম্পত্তি লাভ করে না, অন্য সন্তানের মধ্য হইতে অধিকারী নির্ব্বাচন করিতে হয়। উত্তর-অষ্ট্রেলিয়ার কনিষ্ঠ সন্তান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পায়। পশ্চিম য়ুনানের সান ও কাথেন জাতির মধ্যে কনিষ্ঠের উত্তরাধিকারী হইবার রীতি। অরবাক পর্ব্বতের মু জাতি এবং ইংলাণ্ডের কোন কোন অংশে এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন হিন্দু জাতির মধ্যে রাজ-দরবারে পদ ও সম্ভ্রম জ্যেষ্ঠ পুত্র লাভ করে, কিন্তু অন্য সন্তানেরা সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লয়। শিংপো জাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র স্থাবর সম্পত্তি এবং কনিষ্ঠ অস্থাবর সম্পত্তি লাভ করে—অন্য সন্তানেরা জ্যেষ্ঠের প্রসাদভাগী হইয়া জীবন কাটায়।

অনুন্নত সমাজে কাহারও কোন ক্ষতি করা হইলে সাধারণতঃ সে বা তাহার আত্মীয়েরা অপরাধীর দণ্ড করে। সাধারণের ক্ষতি না হইলে রাজা সে বিবাদে হস্তক্ষেপ করে না। ক্যারিবিয়ানদের মধ্যে সকলে আপন আপন ইচ্ছামত প্রতিশোধ লয়; রাজা বা সাধারণে দোষীর বিচার করে না। যে প্রতিশোধ লইতে না পারে, সে সাধারণের উপহাস-পাত্র হয়। প্রাচীন কালে গ্রীস দেশে এই প্রথা ছিল। উত্তর আমেরিকার * ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এই প্রথা। এইরূপ বিচার হইবার অবস্থায়ও সাধারণতঃ দণ্ডের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকিতে দেখা যায়। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় দোষী বিবাদ মীমাংসা করিতে স্বীকার করিলে শত্রুপক্ষ তাহার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করে। কি অপরাধে শরীরের কোন অংশে বর্শা নিক্ষেপ করিতে হইবে, তাহা স্থির আছে। যদি স্থানান্তরে বর্শা আঘাত করে, তবে আঘাতকারীকে আবার দণ্ড লইতে হয়। নব দাক্ষিণাত্যের দেশেও এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকারে প্রতিশোধ লইবার প্রথা থাকায় এবং অপরাধ সকলেরই আপন আপন বিচারাধীন হওয়ায় অপরাধী কখন কখন অর্থদণ্ড বা তদনুরূপ কোন ক্ষতি স্বীকার করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সন্তুষ্ট করিবার সুবিধা পাইত। যাহা প্রতিকার স্বরূপে পূর্ব্বে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে দেওয়া হইত, তাহাই কালক্রমে জরিমানা স্বরূপে রাজভাণ্ডারে এখন আদায় হইতেছে; পূর্ব্বে ইংলণ্ডে আপোসে মিটাইতে হইলে কিরূপ অর্থদণ্ড দিতে হইবে, সরকার হইতে তাহার একটা ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া ছিল। শ্মশ্রুর জন্য দশ টাকা, উরু ভাঙ্গিলে ছয় টাকা, সম্মুখের দাঁত ভাঙ্গিলে তিন টাকা; কিন্তু পঞ্জরের একখান

অস্থি ভাঙ্গিলে দেড় টাকা দিলেই যথেষ্ট হইত। এইরূপে নখ কেশ দন্ত অস্থি বাহু পদ নাসিকা জিহ্বা এমন কি জীবনের পর্যান্ত একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্য ছিল। আবার ব্যক্তিবিশেষে মূল্যের তারতম্য হইত। প্রজাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। নিম্ন শ্রেণীর প্রজাদিগের জীবনের মূল্য এক শত টাকা, মধ্য শ্রেণীর তিন শত ও সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছয় শত টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রাচীন কাল হইতে গত শতাব্দী পর্য্যন্ত আয়র্লাণ্ডে নরহত্যা করিয়া কিছু অর্থ দিতে পারিলে জীবনদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইত। সে অর্থ হত ব্যক্তির পরিবার ও জজ সাহেব অংশ করিয়া লইতেন। উত্তর আরাকানের পাহাড়ীয়াদিগের মধ্যেও অর্থদণ্ড দিলে সকল অপরাধের ক্ষমা আছে। কোন্ অপরাধে কত টাকা দিতে হয় তাহা পুরুষানুক্রমে সকলেই জানে। কারগিজদিগের মধ্যে নরহত্যা করিয়া কয়েকটা ঘোড়া দিলে সকল গোল মিটিয়া যায়। পুরুষের জীবনের মূল্য যত, বালক ও স্ত্রীলোকের জীবনের মূল্য তাহার অর্দ্ধেক। প্রাচীন ইংলণ্ডের মত অঙ্গ বিশেষের নির্দ্দিষ্ট মূল্য ইহাদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধাঙ্গুলির মূল্য এক শত মেষ, কনিষ্ঠার মূল্য বিংশতিটী ইত্যাদি। কাফিরেরা বলে, সম্পত্তি সকলের আপন আপন, কিন্তু দেহ সর্দ্দারের। সুতরাং কেহ কোন অপরাধ করিলে কারাবাস নির্ব্বাসন প্রভৃতি কোন প্রকার শারীরিক দণ্ড ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। সকল প্রকার দোষেরই দণ্ড জরিমানা। কিন্তু অন্যান্য স্থানের মত সে অর্থ পীড়িত ব্যক্তি বা তাহার পরিবার লাভ করে না— উহা রাজার প্রাপ্য। "আপন শোণিত কেহ আপনি পান করে না।"

---

# দ্বাদশ পল্লব।

অদ্যাপি কোন বন্য জাতি দেখা যায় নাই, যাহাদিগের কোন ধর্ম্মভাব নাই। যাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই ঘটনা বড় বিশেষ ঘটনা। যাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসের ক্রমোন্নতি প্রমাণ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের এই ঘটনা অপ্রমাণ করিতে বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু বন্য সমাজের মত ও বিশ্বাস কত যুগে গঠিত হইয়াছে, বিবেচনা করিলে বর্ত্তমান বন্য সমাজে ধর্ম্ম বিশ্বাসের সত্বা স্বীকার করিলেও প্রথম মানবজাতির মধ্যে ইহার অভাব না থাকিবার কোন কারণ দেখা যায় না। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি ভূতে বিশ্বাস বন্য জাতি মাত্রেরই আছে। বস্তুতঃ কোন কোন বন্য জাতির মধ্যে অশরীরী পদার্থের সত্বায় বিশ্বাস মাত্র তাহাদের ধর্ম্মমতের চরম সীমা। প্রার্থনা, উপাসনা, ধর্ম্ম-আচার অনেক জাতির মধ্যে কিছু মাত্র নাই। অশরীরীর সত্বায় বিশ্বাস হইতে আরম্ভ করিয়া সভ্য জাতির ধর্ম্মভাব কি প্রকারে ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এই সর্গে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। ধর্ম্মমত সাধারণতঃ আত্মা, পরলোক, অমরত্ব, স্বর্গ ও নরক, দেবতার বিশ্বাস, প্রার্থনা ও উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার, এই কয়েক অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

মৃত্যু কি? প্রাণপুরুষের স্থানান্তর গমন। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়া আসিয়াছি এই বিশ্বাস অসভ্য জাতি মাত্রেরই মধ্যে দেখা যায়। একটী কুকুর বা বানরকে দেখ, তাহার সন্তান মরিয়া গিয়াছে সে বুঝিতে পারে না। মৃত শিশু জীবিতের ন্যায় ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া থাকে, তাহাকে আহার ও পান করাইবার প্রয়াস পায়, জীবন্ত ও মৃতের মধ্যে প্রভেদ করিবার ক্ষমতা তাহার জন্মে নাই। বন্য জাতিদিগের মধ্যেও কিয়ৎ পরিমাণে এইরূপ পশুবুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্চ্ছিত বা অজ্ঞান অবস্থায় কিয়ৎ কাল থাকিয়া জীব আবার জাগিয়া উঠে। সুতরাং মৃত্যু মূর্চ্ছা মাত্র, মৃত্যু পরে মনুষ্য আবার কালান্তরে জাগিয়া উঠিবে, অস্ফুট অসভ্য-বুদ্ধি এরূপ বিবেচনা করিবে, আশ্চর্য্য কি? আমাদিগের মধ্যেও মৃত্যু ও মূর্চ্ছা মধ্যে প্রভেদ করিতে কত সময় বিপত্তি ঘটে। কত লোককে জীবন্ত অবস্থায় কবর বা ভস্মসাৎ হইতে হইয়াছে।

বুসমান ও তাসমেনিয়ানেরা মৃত্যুকে নিদ্রা বলে। বাঙ্গালা ভাষায় মৃত্যুর অপর নাম দীর্ঘ-নিদ্রা। দায়াকেরা মৃত্যু ও নিদ্রার মধ্যে প্রভেদ করিতে পারে না। নীলগিরি-বাসী টোডাদিগের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে যতদিন দেহ পচিয়া না যায়, ততদিন যত্নের সহিত রক্ষা করে, আশা—প্রাণপুরুষ ফিরিয়া আসিতে পারে। দামারা ও টুপি জাতির মধ্যে শবদেহ পুনরায় জাগরিত হইবার আশ দেখা যায়। মৃতদেহকে পুনর্জাগরিত করিবার প্রয়াস সম্বন্ধে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছি। অরবাক জাতি শবদেহ জাগাইবার জন্য মুখ চোখ সর্ব্বশরীর কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ করিয়া থাকে। হটেন্টটেরা মৃতদেহকে প্রহার করে ও গালাগালি দেয়। ফিজিয়ান ও ফানটী জাতি কারিব ও লোয়াঙ্গোবাসিগণ গোলড্‌কোষ্টে বেকুয়ানা ও ইনুইট জাতি এবং চুটিয়া নাগপুরবাসী হোস ও মুণ্ডাজাতির মধ্যে মৃতদেহের সহিত গল্প করিবার প্রথা আছে। কেহ কেহ বা দেহ ভস্মসাৎ বা কবরগ্রস্ত হইবার পরেও প্রাণপুরুষকে ফিরিয়া আসিবার জন্য ডাকিতে থাকে। পলায়িত প্রাণপুরুষ জীবন্তদিগের কথা শুনিয়া থাকে, নানা জাতির মধ্যে এই বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। বাগো, কুকি, মেক্সিকান ও পেরুভিয়ান এবং শত শত সভ্য জাতিও দূরগত প্রাণপুরুষের নিকট কত আবেদন ও নিবেদন করে। মালাগাজীদিগের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে নবগত আত্মাকে আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাহারা পূর্ব্বগত পুরুষদিগকে পরামর্শ দেয়।

প্রাণপুরুষ ফিরিয়া আসিবার প্রত্যাশায় আহার দিয়া দেহ রক্ষা করিতে আবশ্যক বলিয়া নানা জাতি বিশ্বাস করে। দেহ পচিয়া না যায় বা কীট পতঙ্গ কি অন্য কোন জন্তু ভক্ষণ করিয়া না ফেলে, তজ্জন্য নানা কৌশল করিতে হয়। মূর্চ্ছাবস্থায় রোগী কখন কখন আহার গ্রহণ করে। সুতরাং মৃত দেহকে যে আহার দিবে এবং আহার না পাইলে দেহ শুষ্ক হইয়া যাইবে বলিয়া বিশ্বাস করিবে, ইহা বন্য বুদ্ধির সহজ ফল। পাপুয়ানেরা মৃত্যুর পরে কয়েক দিন পর্য্যন্ত মৃতদেহীকে খাওয়াইবার কৃত চেষ্টা করে। তাহারা উহার গাল ভরিয়া মাংস ও মদ ঢালিয়া দেয়। টাহিটীবাসিদিগের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোকের মৃত্যু হইলে দিবসের বিভিন্ন সময়ে আহার দিবার জন্য পুরোহিত বা অন্য কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হয়। বোর্ণিয়োবাসী মালানান্ জাতির সর্দ্দারের মৃত্যু হইলে ক্রীতদাসেরা তাহাকে রীতিমত আহার্য্য ও তাম্বূল দেয় এবং পাখা দিয়া বাতাস করে। মৃত দেহ ভস্মসাৎ করিবার পূর্ব্বে বাদাগাজাতি

[illegible] খাদ্য দ্রব্য দিবার সময় না খাইলে কিংবা [illegible] ক্ষুধা না থাকিলেও ভবিষ্যতের আয়োজন করিয়া দিবার জন্যও আহারাদির আবশ্যক হয়। কাফ্রী জাতি মৃতদেহের পার্শ্বে খাদ্য ও মদ্য রাখিয়া দেয়। [illegible] দেহ সমাধিস্থ করিবার পূর্ব্বে এবং পরেও উহার পার্শ্বে আহার্য্য দিয়া থাকে। টাহিতী, সাণ্ডুইচ, নবজিলাণ্ড, ব্রাজিল এবং পেরু দেশে এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। আফ্রিকা মধ্যদেশে সারবোজাতি, লোয়াঙ্গোবাসিগণ, অস্ত্রভাস নিগ্রোজাতি ও দাহোমিবাসিরা কবর-পার্শ্বে খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া দেয়। ভারতবর্ষে সাওতাল, কুকি, কিরাত ও ভীলজাতিও এইরূপ করিয়া থাকে। হিন্দুরা মৃত পুরুষের ব্যবহারার্থ খাদ্য দ্রব্য দিয়া থাকে। কারিব ও চিবচা জাতি এবং মধ্য আমেরিকার অধিবাসিরা কবর-পার্শ্বে আহার্য্য ও পানীয়ের আয়োজন করিয়া রাখে।

কত দিনে প্রাণপুরুষ দেহ মধ্যে প্রত্যাগত হইবে, মূর্চ্ছিত ব্যক্তির সম্বন্ধে জানা যায় না। দীর্ঘ মূর্চ্ছাগ্রস্ত মৃত দেহের পক্ষেও উহার নির্ণয় করা অসম্ভব। সুতরাং কেবল কয়েক দিন মাত্র আহার দিয়া ক্ষান্ত হইলে বিপদ ঘটিতে পারে। মাঝে মাঝে বোদো ও ধিমলেরা কবরের উপর খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া আসে। কুকি জাতি মাচার উপর শবদেহ রাখিয়া প্রতিদিন আহার যোগায়। ইরকুইস্ জাতি যখনই আত্মীয়ের কবর পার্শ্বে যায় তখনই কিছু খাইতে দেয়। মৃত্যুর পরে এক বৎসর পর্য্যন্ত [illegible] মৃতকে খাইতে দেয়। মেক্সিকানেরা কুড়ি দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ খাওয়াইয়া তাহার পর আট দিন অন্তর খাইতে দেয়। হিন্দুদিগের এক মাস অন্তর খাইতে [illegible]। [illegible]কোয়া জাতি খাদ্য দ্রব্য সিদ্ধ করিবার [illegible] প্রতি রাত্রে আগুন জ্বালিয়া দেয়। সারবো-জাতি [illegible] অধিক হইলে আগুন জ্বালিয়া থাকে। ব্রাজিল ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসিরাও এইরূপ করিয়া থাকে। সম্ভ্রান্ত লোকের মৃত্যু পরে তিন চার বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিদিন আগুন জ্বালিতে শেষোক্ত দেশে দেখা যায়।

দেহরক্ষা করিতে না পারিলে আত্মারও মৃত্যু হয়, এই ভাবিয়া আবিসিনিয়া দেশে ও চিবচা জাতির মধ্যে দুষ্ট লোকের কবর দেওয়া হয় না। নবজিলাণ্ডের লোকেরা বলে, যাহার দেহ খাইয়া ফেলা যায়, তাহার চিরদিনের মত ধ্বংশ হয়। দামারা জাতি মনে করে, বাঘে মৃত দেহ খাইয়া ফেলিলে ভূতে আর বিরক্ত করিতে পারে না। বোধ হয় এইরূপ কারণে অতি প্রাচীন কালে

ভারতবর্ষ, পারস্য ও গ্রীসদেশে কুকুর দিয়া শব-শরীর ভক্ষণ করান হইত। এখনও তিব্বত ও তাতার দেশে এই প্রথা প্রচলিত আছে। য়িহুদিজাতি নানা প্রকার জন্তু দ্বারা মৃত শরীর ভক্ষণ করায়। কামাস্কাট্‌কার লোকেরা কুকুর-দিগকে মৃত দেহ খাইতে দেয়। অন্য দিকে তৈল প্রভৃতি মাখাইয়া মৃত দেহ রক্ষা করিবার প্রথা নানাদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। মেক্সিকোর লোকেরা মৃত ব্যক্তির অস্থি শুখাইয়া বৃক্ষ-শাখায় বাঁধিয়া রাখে। পেরু দেশে মৃত ব্যক্তির নখ চুল রক্ষা করিয়া থাকে। আফ্রিকা দেশে লোয়াঙ্গোবাসীরা ও আমেরিকার চিবচাজাতি অগ্নিতাপে শুখাইয়া মৃত দেহ রক্ষা করে। মেক্সিকো, পেরু ও প্রাচীন মিসর দেশে মসলা মিশ্রিত তৈল মাখাইয়া মৃত দেহ রক্ষা করিবার রীতি ছিল। কিন্তু এই সকল কৌশল সকল অসভ্য জাতি উদ্ভাবন করিতে পারে না। কোন নিভৃত স্থলে মৃত দেহ লুকাইয়া রাখিবার প্রথা সাধারণতঃ তাহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় কবরকে দেহগোপ বলে। ইহারই বিকৃতিতে পালি দাঘোবা শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। চিবচাজাতি কবর পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ করিয়া মৃত দেহ গোপন করিয়া থাকে। কয়েক দিন গৃহে রাখিয়া নবজিলাণ্ডের সর্দ্দারদিগের দেহ পর্ব্বতশিখরে, গিরি-গহ্বরে বা বনমধ্যে লুক্কায়িত করা হয়। বোর্ণিওবাসী মুরুত জাতি সর্দ্দারদিগের অস্থি বাক্সবদ্ধ করিয়া পাহাড়ের উচ্চতম অংশে রাখিয়া আসে। টাহিটীবাসিরাও এইরূপ করিয়া থাকে। কাফির জাতি সাধারণ লোকের দেহ ব্যাঘ্র দ্বারা ভক্ষণ করায়, কিন্তু সর্দ্দারদিগের দেহ গোগৃহে কবর দিয়া থাকে। বেকুয়ানা জাতিও গোগৃহে দেহ গুপ্ত করিয়া তাহার উপর দুই তিন ঘণ্টা এমনই ভাবে গরু চালায়, কেহ দেখিলে বুঝিতে পারে না যে, সেখানে কাহারও কবর হইয়াছে। বাগোটা দেশে রাজার মৃত্যু হইলে বিশ্বাসী প্রহরীগণ অতি গোপনে মৃতদেহ নদীতটে লইয়া যায়, এবং অতি কষ্টে স্রোত অন্য পথে প্রবাহিত করিয়া নদীগর্ভে মৃতদেহ গুপ্ত করে। তদনন্তর পূর্ব্বপথে স্রোত ছাড়িয়া দিয়া গৃহে ফিরিয়া আসে। পলিনেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও আণ্ডামান দ্বীপে মাচার উপর মৃত দেহ রাখিয়া দেয়। জুলুদিগের মধ্যে কেহ মৃত দেহ দগ্ধ করে, কেহ কবর দেয়, অপরেরা গাছের ডালে বাঁধিয়া রাখে। দায়াক ও কারেন জাতিও এইরূপ করিয়া থাকে। আমেরিকায় মাচার উপর মৃত দেহ রাখিবার প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত। দাকোটা জাতিরও এই রীতি। মান্দান ও চিপেবা জাতিও এইরূপ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ইরিকোয়া জাতি এইরূপ করিত। দক্ষিণ আমেরিকার

গর্ত্তমধ্যে লুকাইবার প্রথা। কাবির জাতিও এইরূপ করিত। পর্ব্বত গহ্বরে স্থান না পাইলে গায়েনা ইণ্ডিয়ানেরা ভূগর্ভে দেহ প্রোথিত করে। চিবচা জাতি গর্ত্ত মধ্যে কবর দেয়। পেকদেশীয়েরা গর্ত্তমধ্যে দেহ গুপ্ত করিয়া কপাট দিয়া বন্ধ করিত, অথবা তৈলাক্ত করিয়া মন্দির মধ্যে রক্ষা করিত। মাণ্ডিঙ্গো জাতি কবরে দেহ রাখিয়া কাঁটা দিয়া বন্ধ করে। জোলোক্ নামে নিগ্রোজাতি বাঘে মৃত দেহ না খাইয়া ফেলে, এজন্য কবরের উপর কাঁটা দিয়া রাখে। আবার, এস্কিমো, বোদো, ধীমল এবং দামারা জাতি পাথর দিয়া কবর-মুখ বন্ধ করিয়া বন্য জন্তুর অত্যাচার নিবারণ করে। মধ্য আমেরিকায় মৃত ব্যক্তির সম্ভ্রমের আধিক্য অনুসারে কবর-মুখে প্রস্তর রাশির উচ্চতা বৃদ্ধি হয়। প্রথমে যাহা দেহ রক্ষার জন্য আবশ্যক হইয়াছিল, বন্ধু বান্ধবের স্নেহে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি হইয়া পড়ে; শেষে মধ্য আমেরিকার মত প্রস্তর পরিমাণ সম্ভ্রমসূচক হইয়া উঠে। কবরের উপর মন্দির, চৈত্য বা স্মরণি নির্ম্মাণ করিবার প্রথা এইরূপেই যে উদ্ভূত হইয়াছিল, সহজে অনুমান করা যাইতে পারে।

মৃত্যু দীর্ঘ-মূর্চ্ছা বলিয়া বিশ্বাস নানা জাতির মধ্যে দেখা গেল। মূর্চ্ছাপরে পুনঃসংজ্ঞালাভের মত মৃত্যুপরে পুনর্জীবনের আশা অসভ্য জাতি মাত্রেরই আছে। সভ্যতম য়ুরোপে খৃষ্টানদিগের মধ্যে সেই অসভ্যজনোচিত আশা অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত যীশু কবর হইতে পুনরুত্থান করিবে সহস্র সহস্র শিক্ষিত খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করে।

আমরা দেখাইলাম মৃত ব্যক্তিকে আহার দিবার প্রথা সভ্য অসভ্য নানা জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বন্যদিগের নিকট মনুষ্য ও ভূতে বিশেষ প্রভেদ নাই। অষ্ট্রেলিয়ার একটী স্ত্রীলোক সারজর্জ্জ গ্রে সাহেবকে আপন মৃত পুত্রের প্রেত বিবেচনা করিয়া পুত্রস্নেহে আদর করিত। বিবি টমসন জাহাজ ভগ্ন হওয়াতে একাকিনী এই দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তত্রত্য লোকে তাঁহাকে ভূত বিবেচনা করিত। বালকেরা তাঁহার উপর উৎপাত করিলে সকলে বলিত "অভাগিনী ভূতমাত্র, উহাকে কেহ কষ্ট দিও না।" অথচ এই ভূতকে তাহাদের মধ্যে একজন বিবাহ করিয়াছিল। নবকালি-ডোনিয়া, ডার্নলি, প্রিন্সঅবওয়েলস্, কেপ ইয়র্ক, ক্যালেবার প্রভৃতি দ্বীপের অধিবাসীরা এবং ক্রুমেন জাতি শ্বেতকায় য়ুরোপীয়দিগকে কৃষ্ণকায়দিগের প্রেত বলিয়া বিবেচনা করে। কৃষ্ণ ত্বক্ দগ্ধ হইলে বা কোন রূপে উঠিয়া যাইলে তাহার নিম্নে শ্বেত বর্ণ দৃষ্ট হয়; সুতরাং শ্বেতবর্ণ মনুষ্যকে কৃষ্ণবর্ণদিগের প্রেত

পুরুষ বলিয়া বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিরাত জাতি বলে মনুষ্য ও ভূতে কোন প্রভেদ নাই। আরকানিয়ানদিগের মতে প্রেতপুরুষ জীবন্ত মনুষ্যের মত সকল কার্য্য করিয়া থাকে, কেবল তাহাদিগের পরিশ্রমে ক্লান্তি বা সুখে তৃপ্তি হয় না। বিম্বেয়ার লোকেরা আত্মা ও দেহের মধ্যে কোন প্রভেদ করে না। পেরুভিয়ানদিগের মতে মানবীয় সকল গুণ প্রেতাত্মার আছে। মৃত পুরুষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম সকলই বোধ করে। ভূত আসিয়াছে কি না পদ-চিহ্ন দেখিয়া জানিবার জন্য পেরুবাসিরা বাটীর চতুর্দ্দিকে ময়দা এবং য়িহুদি জাতি ভস্ম ছড়াইয়া রাখে। নিগ্রো জাতি ভূতের আগমন নিবারণের জন্য পথে কাঁটা পুতিয়া রাখে। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের মতে ভুতেরা তামাক পান করে। ফিজিদিগের দেবতারা মাংস সিদ্ধ করিয়া খায়। প্রাচীন হিন্দু ও ইউরোপীয়গণ এবং তাতারবাসিরা ভূতের মানবীয় গুণে বিশ্বাস করে। গ্রীক ভূতেরা মৃত্যু পরে বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি পুনরুদ্দীপিত করিবার কিছু অবসর পাইলেই আপন আত্মীয় স্বজনকে চিনিতে পারিত এবং তাহাদিগের দুঃখ ও বিপদে শোক ও চিন্তা করিত। কবর হইতে যিশু পুনরুত্থান করিলে য়িহুদাজাতি তাঁহার দেহের ক্ষত সকল দেখিয়া তাঁহাকে চিনিয়া লইবে। আমাজুলুদিগের মতে ভূত ঠিক মানুষের মত কেবল তাহার দেহের ছায়া পড়ে না, হিন্দুদিগেরও এই বিশ্বাস।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি মনুষ্যের ন্যায় জীব জন্তু ও উদ্ভিদের আত্মা আছে বলিয়া নানা জাতি বিশ্বাস করে। অসভ্যেরা পশু পক্ষী ও মনুষ্যে প্রভেদ করিতে পারে না। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা মানুষের মত পশু পক্ষীর সহিত কথা কয়। শিকার করিবার সময় জন্তুদিগকে বন্দনা করিবার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। মৃত্যু পরে পরকালে জীবের আত্মা বাঁচিয়া থাকে, এ বিশ্বাস এই ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে দেখা যায়। গ্রীনলাণ্ডে কাহার পীড়া হইলে যাদুকরেরা খরগস বা বল্গা হরিণের আত্মা রোগীর দেহে স্থাপন করিয়া তাহাকে আরাম করে। মেওরিজাতি; মাদাগাস্কারের হোভাজাতি ও কামস্কাট্‌কার অধিবাসীরা জীব জন্তুর পরকালের কথা বলে। কুকিরা শিকারে যে সকল জন্তু বধ করে, পরলোকে তাহাদের আত্মা তাহাদের সেবা করে। জুলুদিগের মধ্যেও এইরূপ বিশ্বাস। বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বত সকলেরই আত্মা আছে। মনুষ্য যে সকল বস্তু আপন হস্তে নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, অস্ত্র, শস্ত্র, মৃৎ বা প্রস্তর পাত্রেরও আত্মায় নানা জাতির বিশ্বাস। তুঙ্গুসি জাতি পরলোকে

শিকার ও যুদ্ধ করিবার জন্য মৃত দেহের সহিত অস্ত্রশস্ত্রাদি কবরে দিয়া থাকে। কালমক, এস্কিমো, ইরিকোয়া, অরকানিয়, অন্তর্ব্বাসী নিগ্রো, নাগা প্রভৃতি শত শত জাতির মধ্যে এই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগের মৃতদেহের সহিত গৃহকার্য্যের দ্রব্যাদি ও বালকদিগের সহিত খেলিবার খেলনা প্রভৃতি দেওয়া হইয়া থাকে। প্রাণ পুরুষের বস্ত্রের অভাব না হয়, এজন্য আবিপোন জাতি কবর-পার্শ্বে বৃক্ষ শাখায় এক খণ্ড বস্ত্র ঝুলাইয়া দেয়। এবং দাহোমিবাসিগণ মৃতদেহের সহিত কবরে বস্ত্র দিয়া দেয়। পাটাগোনিয়ার লোকেরা মৃত দেহের উপর বৎসরে এক একবার কয়েক খণ্ড বস্ত্র রাখিয়া আইসে। হিন্দুরা শ্রাদ্ধের সময় অন্যান্য আহার্য্য, পানীয় ও তাম্বুলের সহিত বস্ত্র উপহার দেয়। মৃতদেহ দাহ করিবার সময়েও ইহাদের মধ্যে নূতন বস্ত্র দিবার পদ্ধতি আছে। সামোয়া, দামারা, অন্তর্ব্বাসী নিগ্রো, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া ও নবজিলাণ্ডের অধিবাসীরা দেহের সহিত মৃত ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তিরও কবর দেয়। পাটাগোনিয়, নাগা, পাপুয়ান, পেরুভিয়, মেক্সিকান, চিবচা, হোভা ও গায়েনার লোকদিগের মধ্যেও এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহজীবনের ঋণভার পরলোকে পরিশোধ করিবার জন্য কাফির প্রভৃতি নানা জাতি মৃত ব্যক্তির সহিত কিছু টাকা দিয়া থাকে। কবরের উপর একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সংসার করিতে যাহা কিছু আবশ্যক, নিস্‌মি জাতি সেই থানে রাখিয়া দেয়। দায়াক ও পোচান কালাবারের অধিবাসিদিগের মধ্যেও এইরূপ প্রথা দেখা যাইত। ইহজীবনে দাস দাসী, গৃহপালিত পশু পক্ষী, অস্ত্র শস্ত্র না হইলে সংসারকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না। পরকাল যাহাদিগের ইহকালের অনুরূপ মাত্র, পরকালেও তাহাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য ঐ সকল পদার্থের আবশ্যক হয়। ভোজ্য পদার্থ অনেক সময় কবর-পার্শ্বে দিতে দেখা গিয়াছে, প্রেত পুরুষেরা তাহাদিগকে স্থূলতঃ ভক্ষণ করে নাই। সুতরাং ঐ সকল পদার্থের প্রাণ সকল ব্যবহার করিয়া বোধ হয় তাহারা আত্মজীবন রক্ষা করিয়া থাকিবে। মনুষ্যের ন্যায় অন্যান্য পদার্থেরও যখন আত্মা আছে, ইহজীবনে মনুষ্য যেমন উহাদিগের শরীর ভক্ষণ করিয়া আত্মদেহ রক্ষা করে, অশরীরী আত্মা সেইরূপ উহাদিগের আত্মা দ্বারা আত্মপুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রেত পুরুষের শারীরিক অনুরূপে বিশ্বাস হ্রাস হইয়া শরীর-শূন্য অথচ শারীরিক গুণবিশিষ্ট প্রেত পুরুষের সত্তায় বিশ্বাস বর্দ্ধিত হয়। বোধ হয়, মৃত শরীর ভূগর্ভে বা অগ্নিদাহে ধ্বংস হইতে দেখিয়া অশরীরী আত্মার

বিশ্বাস মানব সমাজে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া থাকিবে। যে সকল দেশে মৃত শরীর দাহ করিবার প্রথা আছে, প্রেতাত্মার পরলোকে ব্যবহারের জন্য যে সকল দ্রব্য দেওয়া হয়, সে সকল দেশে তাহা ভস্ম করিয়া দিবার রীতি দেখা যায়। কুশা, বাগো প্রভৃতি আফ্রিকার নানা অসভ্য জাতি প্রেতদিগকে খাদ্য সামগ্রী দগ্ধ করিয়া দেয়। কোমাঞ্চিরা মৃত ব্যক্তির অস্ত্রাদি দাহ করে ও অন্যান্য দ্রব্য ভগ্ন করিয়া ফেলে। কেহ মরিলে চিপেবা জাতি সর্ব্বস্ব নষ্ট করে, শিবির ও বস্ত্র খণ্ড খণ্ড করে, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র চূর্ণ করিয়া দেয়। চীন দেশীয়েরা স্থূল পদার্থ মৃত ব্যক্তির সঙ্গে না দিয়া কাগজে গৃহ নৌকা শকট ও দাস দাসীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করে।

প্রেতবিশ্বাসের ইহা দ্বিতীয় অবস্থা। এই অবস্থায় প্রেত পুরুষের সাহায্য করিবার জন্য মনুষ্য পশু ও অন্যান্য চেতন ও অচেতন পদার্থ প্রেত পুরুষের উদ্দেশে বলিদান করিবার প্রথা দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় অবস্থা প্রথমাবস্থা অপেক্ষা অনেক উন্নত। এবং এই অবস্থা অধিকার করিতে সামান্য সময় অতিবাহিত হয় নাই। কারণিজ সর্দ্দারের মৃত্যু হইলে তাহার অশ্ব সকল বধ করা হয়। য়াকুত, কোমাঞ্চি ও পাটাগোনিয়াদের মধ্যেও এই রীতি। বহুজাতি কুকুর ও অশ্ব বধ করিয়া থাকে। বেদুইনেরা উষ্ট্র এবং দামারা, ও টোডা জাতি গাভী সকল বধ করে। মৃত পুরুষের কোমরের সহিত শূকর সকল রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া ভাটিয়ান জাতি হত্যা করে। পরকালে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য মৃত পুরুষের সহিত নানা প্রকার শস্য দেওয়া হইত। পলিনেশিয়া, নবকালিডোনিয়া, ফিজী ও টঙ্গা দ্বীপে এবং চীনুক, কারিব, দাকোটা, নিগ্রো ও দাহোমি জাতির মধ্যে কেহ মরিলে তাহার স্ত্রীদিগকেও হত্যা করিয়া সঙ্গে পাঠান হয়। কাফির, দাকোটা, চীনুক, কীয়ান, মিলানা, জুলু ও নিগ্রো প্রভৃতি নানা অসভ্য জাতির মধ্যে দাস দাসীকে এইরূপে সঙ্গে দিবার প্রথা দেখা যায় এবং গ্রীক, ট্রোজান প্রভৃতি কোন কোন সভ্য জাতির মধ্যে এই রীতি এক সময় প্রচলিত ছিল। ফিজীদ্বীপে এবং মধ্য-আফ্রিকায় বন্ধুদিগকে সঙ্গে পাঠান হয়। মেক্সিকোদেশে পুরোহিত ও বিদূষকদিগকে সঙ্গে পাঠান হইত। পেরুদেশে উপপত্নীরাও সহমরণে যাইত। দাহোমিদেশে এক রাজার মৃত্যু হইলে ২৮৫টী নারী সহমরণে গিয়াছিল। পুত্রের মৃত্যু হইলে চিনুকেরা মাতাকে সঙ্গে দেয় এবং আনিটিয়মদেশে মাতা,খুল্ল মাতা ও পিতামহী প্রভৃতিকেও পাঠাইতে দেখা গিয়াছে। আমাদের দেশীয় সহমরণ প্রথা এইরূপ কারণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

পরলোকবাসী আত্মাদিগের মধ্যেও ইহকালের ন্যায় জাতি বা শ্রেণীভেদ আছে। নীচলোকের আত্মা পরকালেও নীচ, শত্রু বা সমাজদ্রোহীর আত্মা স্বপক্ষীয় সম্ভ্রান্তদিগের আত্মার সহিত একত্র বাস করিতে পারে না। স্বপক্ষীয় আত্মা দেবতা, পরাজিত শত্রুপক্ষীয় আত্মা অসুররূপে পরিণত হয়। স্বপক্ষীয় আত্মা স্বর্গে বাস করে, বিপক্ষীয়ের নরকে বাস।

ফিজি, টঙ্গা ও টাহিটী দ্বীপে বিশ্বাস যাহারা ইহলোকে রাজা থাকে, মৃত্যুর পরে পরলোকেও তাহারা রাজত্ব পায়। কিরাতজাতির মতে স্বর্গেও রাজা প্রজা আছে। কুকিরা বলে ইহলোকে যে যত শত্রু হত্যা করে, পরলোকে তাহাদিগকে তাহার দাসত্ব করিতে হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির মধ্যেও এই মত। দাহোমিদিগের বিশ্বাস পৃথিবীতে যেরূপ শ্রেণীবিভাগ স্বর্গেও সেই রূপ। কাফিরদিগেরও এই মত। অক ডানিগ্রোদিগের মতে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল বর্ষাকালে দেবরাজের দরবারে সাক্ষাৎ করিতে যায়। আসিরীয়, গ্রীক, য়িহুদা, হিন্দু এবং খৃষ্টানদিগের মতেও দেবরাজ্যে শ্রেণীবিভাগ আছে।

পৃথিবীতে যেরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবাদ বিসম্বাদ হয় স্বর্গেও তাহার অনুরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। শত্রুদিগের সহিত আমাজুলুগণ যখন যুদ্ধ করে, তখন পিতৃপুরুষের প্রেতাত্মা রণক্ষেত্রে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে। গ্রীক, ট্রোজন ও য়িহুদা জাতি এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও এই বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বৎবাসিদিগের দেবগণ পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। ফিজিয়ান দেবতারা অন্য দেবতাদিগকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করে। ব্যভিচার, নরহত্যা প্রভৃতি কোন অসৎকর্ম্মে ফিজিয়দেবগণ, ফিজিবাসীদিগের অপেক্ষা ন্যূন নহে। গ্রীকদিগের মতে একিলিস ও এজাক্স পরলোকেও ক্রোধ হিংসা ও গর্ব্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। হিন্দুদেবী কালী সমর-প্রিয়া, মহাদেব মাদক ভক্ষণে সুপটু। গ্রীক জুপিটার ও এথিনী প্রতারণা বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। বস্তুতঃ মনুষ্যের মনোবৃত্তি যত উন্নত হয় তাহাদের দেবগণও সেই পরিমাণে উন্নত চরিত্র হইয়া থাকে। য়িহুদা ঈশ্বরের মত নিষ্ঠুর, রক্তপ্রিয়, প্রতারণাকারী ঈশ্বর কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। বুঝা গেল যে মানুষই দেবতার সৃষ্টি করিয়াছে। দেবতায় মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে কিনা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তাহার বিচার করা যাইবে।

---

# ত্রয়োদশ পল্লব।

চতুর্দ্দিকে প্রেতপুরুষগণ বিচরণ করিতেছে। আকাশ, বায়ু, গৃহ, বন সকল স্থানই প্রেতগণে পরিপূর্ণ। উত্তর আমেরিকার চিক্‌শজাতি মনে করে, প্রেতপুরুষগণ দিবানিশি জীবন্তদিগের মধ্যে বিচরণ করিতেছে। যেখানে যখনই যাওয়া যাউক না কেন, আলুটদিগের মতে মৃত আত্মীয়েরা কখনই জীবন্তদিগের সঙ্গ ত্যাগ করে না। আফ্রিকার অধিবাসীরা বলে, মৃতপুরুষেরা তাহাদিগের সহিত একত্র ভোজন শয়ন ও উপবেশন করে। আসিয়া, য়ুরোপ আমেরিকা অসভ্যসমাজে সর্ব্বত্র এই বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। কালক্রমে জীবন্ত ও মৃতের অবস্থা বিভিন্ন বলিয়া যত বুঝিতে পারা যায়, উহাদিগের একত্র সমাবেশ তত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এবং সর্ব্বত্র বিচরণ ক্ষমতা স্বীকৃত হইলেও স্থানবিশেষে প্রেতপুরুষের আবাস গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইতে থাকে। প্রথমাবস্থায় প্রেতদিগের আবাস স্থান দুইটী স্থানে নির্দ্দিষ্ট হওয়া সম্ভব। যেখানে ইহজীবনের সুখ দুঃখ সম্ভোগ করা যায়, আত্মীয় স্বজন বিচরণ করে, আজীবনের স্মৃতি ও প্রীতি জড়িত, সম্ভবতঃ মৃত্যু পরে সে গৃহ প্রেতপুরুষগণ আপনাদিগের বাসস্থানরূপে নির্ব্বাচন করিয়া লয়। অথবা যেখানে মৃতদেহ কবরনিহিত, সেই খানে প্রাণপুরুষ বাস করে, সহজেই বিশ্বাস করা যায়। এইরূপ বিশ্বাস জন্যই কবরপার্শ্বে ভক্ষ্য ও পরিধেয় রাখিয়া আসিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকিবে। বোধ হয় প্রথমাবস্থায় বাসগৃহ মধ্যে কবর দিবার প্রথা প্রচলিত থাকাতেও গৃহ মধ্যেই প্রেতপুরুষদিগের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। যে কারণেই হউক আবাসগৃহ বা কবরস্থান প্রেতদিগের বাসগৃহ বলিয়া বিশ্বাস সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, কবর দিবার নানাস্থান। কেহ বা আবাসগৃহে, কেহ বা বনপ্রান্তে, কেহ বা গিরিগহ্বরে, নদীতটে বা ভূগর্ভে মৃতদেহ সমাহিত করিয়া থাকে। এই কথাটী স্মরণ রাখিলে প্রেতদিগের বাসস্থান সম্বন্ধে অসভ্য সমাজের বিশ্বাস সহজে বুঝিতে পারা যায়। আবার বন্য অবস্থায় অসভ্যেরা সর্ব্বদাই স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সুতরাং প্রেতদিগের বাসগৃহ এই কারণেও ক্রমে দূরতর হইয়া পড়ে। প্রাকৃতিক গহ্বরে স্থান অকুলান হইলে মৃত্তিকার নিম্নে সমাহিত করিবার ব্যবস্থা থাকাতে পাতালপুরী প্রেতগৃহ বলিয়া বিশ্বাস কোন কোন সমাজে উদিত হয়। যখন প্রাচীন

বাসস্থান কোথায় ছিল, পরবংশীয়েরা নির্দ্দেশ করিতে পারে না, তখন সূর্য্য চন্দ্র বা স্থানবিশেষ পূর্ব্বস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। ক্রমে সূর্য্য চন্দ্র প্রেতদিগের বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়ে। এই জন্য স্বর্গনির্দ্দেশ হইতে জাতিবিশেষের আদিম আবাস কখন কখন অবগত হওয়া যায়। যে সকল সমাজে প্রেতদিগের মধ্যে জাতিবিভিন্নতা নাই, তাহাদিগের দেবতা, অসুর, সৎ ও অসৎ প্রকৃতি প্রেত সকলে একত্র পাতালে বাস করিয়া থাকে। কিন্তু প্রেতদিগের মধ্যে জাতিবিভেদ ক্রমে সাধারণ বিশ্বাস হইয়া পড়ে। তখন অসুরদিগের জন্য নিম্ন প্রদেশ ও দেবতাদিগের উচ্চ স্থান নির্দ্দেশ করিবার আবশ্যক হয়। এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, অসভ্য সমাজে আমাদের মত পাপ পুণ্যের প্রভেদ করা হয় না। নীতিমন্দতা প্রযুক্ত কাহারও নরকে বাস, উৎকর্ষতা হেতু স্বর্গ নির্দ্দেশ অসভ্যদিগের রীতি নহে। যে সকল কারণে ইহলোক অসভ্য সমাজে উচ্চপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সকল কারণেই, শারীরিক বল, সম্ভ্রম বা ধনধান্যের আধিক্য, দাসদাসীর প্রাচুর্য্য, বুদ্ধির প্রখরতা, পরলোকেও তাহাদিগের উচ্চ আবাস লাভ ঘটাইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহজীবনে যে যাহাতে সুখ উপলব্ধি করে, বিলাস সম্ভোগ, ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা, জিঘাংসা পূরণ, আত্মীয় স্বজ-নের সঙ্গলাভ বা যোগ সুখ—পরকালেও তাহার স্বর্গ সেইরূপ। ইহ জীবনে যাহাতে কষ্ট হয়, দাসদাসী, পরাপ শত্রু, নিম্নাবস্থজনগণের ইহ জীবনে যাহাতে কষ্ট, নরকে কষ্ট তাহাতেই।

অসভ্যদিগের পরলোক সম্বন্ধে দুইটী বিশ্বাস কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। পরলোকে যাইতে হইলে নদী পার হইতে হয়, এ বিশ্বাস সাধারণ; এবং নানা জাতির মতে পরলোকে নরকবাস-উপযুক্ত আত্মা দিগকে কুকুরে আক্রমণ করিয়া থাকে। হয়ত সারমেয় দ্বারা মৃতদেহ ভক্ষণ করাইবার প্রথা প্রাচীনকালে নানাজাতির মধ্যে প্রচলিত থাকাতে দ্বিতীয় বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। কি সজন নগরে কি বিজন বনে, নদনদী আবাসভূমির প্রাকৃতিক সীমা। এক দেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে যাইতে হইলেই নদী উত্তীর্ণ হইতে হয়। হয়ত এই কারণেই ইহ জীবন ছাড়িয়া পরলোকে যাইবার সময় নদীপার হইবার আবশ্যকতা অনুমিত হইয়া থাকিবে। টাইলর বলেন সূর্য্যকে জলগর্ভে অস্তমিত হইতে দেখিয়া; এবং স্পেনসরের মতে স্থান পরিবর্ত্তনের সময় নদী পার হইতে হয় বলিয়া এই বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে।

সাণ্ডুইচ দ্বীপবাসীরা বলে, যেখানে জীবন কাল অতিবাহিত করিয়াছিল,

মৃত্যু পরে আত্মা সেইখানে বাস করে। মাদাগাস্কারে প্রেত পুরুষ কবর মধ্যে বাস করে। গায়েনার অসভ্যেরা বলে যাহার যেখানে মৃত্যু হয়, তাহার আত্মা সেইখানেই বাস করে। আফ্রিকার সকল জাতির এই বিশ্বাস। গোল্ড-কোষ্টের লোকেরা বলে যেখানে দেহ কবরসাৎ হয়, সেইখানেই প্রেত পুরুষের বাসস্থান। পূর্ব্ব আফ্রিকায়ও এই মত। কুটীরে কাহারও মৃত্যু হইলে কাম্‌স্কাটকার লোকেরা সে কুটীর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। বাড়ীর কাহারও মৃত্যু হইলে লেপ্‌চাগণ বাসগৃহ পরিত্যাগ করে। ক্রিক ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে বিশিষ্ট লোকদিগের গৃহ মধ্যে কবর হয়, তখন আত্মীয় স্বজনেরা নূতন স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে—কারণ যেখানে অস্থি থাকে, আত্মা সেইখানে বাস করে। আফ্রিকার অনেক জাতির মধ্যে এই রীতি। বাগোণ্ডা দেশে যে গৃহ বা উদ্যানে প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যু হয়,স্বামী গৃহোদ্যান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কেবল মাঝে মাঝে প্রেত জনের ভক্ষ্য দ্রব্যের আয়োজন করিয়া দিবার জন্য বা প্রার্থনা করিবার জন্য সেইখানে এক একবার যাইয়া থাকে। হটেণ্টাট-দিগের গ্রাম মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে গ্রাম শুদ্ধ লোক স্থানান্তরে গিয়া বাস করে। ফার্ণাণ্ডোপোবাসী বুবি জাতি ও বেকুয়ানদিগের মধ্যে এই রীতি আছে। প্রাচীন কালাবারে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পুত্রকে স্থানান্তরে বাস করিতে হয়, কিন্তু দুই বৎসর পরে গৃহের পুনঃ সংস্কার করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে; কারণ ততদিনে পিতৃপুরুষ স্থানান্তরে চলিয়া যায়। যে গৃহে কাহারও মৃত্যু হয়, য়াকুতি জাতি সে গৃহে আর বাস করে না। ভূতের সঙ্গে বাস করিতে হইবে না বলিয়া কারেন জাতি সমস্ত গ্রাম ধ্বংস করিয়া ফেলে। পথ চিনিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে না পারে এজন্য গ্রীনলাণ্ডের লোকেরা জানালা দিয়া মৃত দেহ বাহির করিয়া দেয় এবং হটেণ্টটেরা সেই উদ্দেশে কুটীরের কোন স্থান ভাঙ্গিয়া নূতন পথ প্রস্তুত করে। শ্যামদেশে প্রাচীরের এক স্থান ভাঙ্গিয়া সেই পথে মৃত দেহ বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর চারিদিকে তিনবার ঘুরাইয়া দেয়, এত গোলমালের পর পথ চিনিয়া আসা প্রেত পুরুষের পক্ষে বড় দুষ্কর হইয়া পড়ে। সাইবিরিয়াবাসি চুবাস জাতি আগমনপথ বন্ধ করিবার জন্য এক খণ্ড প্রস্তর দগ্ধ করিয়া পথে ফেলিয়া দেয়। ব্রাণ্ডেনবর্গের চাসারা মৃত দেহ বাহির করিয়া লইলেই দ্বারের উপর এক কলসী জল ঢালিয়া দেয়। পোমারাণীয়-দিগের মধ্যেও প্রেত পুরুষের গৃহে আসা বন্ধ করিবার নানা কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়।

পেতপুরুষের ভোজনার্থ ভক্ষ্যদ্রব্য কবর-পার্শ্বে রাখিয়া আসিবার প্রথা কত জাতির মধ্যে প্রচলিত, পূর্ব্বপল্লবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কবরে প্রেতদিগের বাসস্থান বলিয়া বিশ্বাস অনেক লোকের মধ্যে দেখা যায়। সেইজন্য কবর না দিলে প্রেতাত্মা অস্থির হইয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে, এ বিশ্বাস কোন কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় এবং এই জন্য যুদ্ধে হতদিগের সংকার্য্যের জন্য মৃতদেহের অন্বেষণে এত আকিঞ্চন প্রকাশ করা হয়। অস্ট্রেলিয়ায় যাহাদিগের কবর না হয়, তাহারা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদিগের আকার মানুষের মত, কিন্তু দীর্ঘ লাঙ্গুল ও লম্বকর্ণবিশিষ্ট। নবজিলণ্ডেও যাহাদের সংকার করা হয় না তাহারা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। পুরোহিতেরা যাদুবলে তাহাদিগকে স্থির করিতে পারে। উত্তর আমেরিকার ইরিকোয়া জাতির প্রেতগণ মৃতদেহের নিকট কিছুকাল বাস করে এবং দেহ যাহাদিগের কবরসাৎ না হয়, বড় কষ্টে তাহারা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। ব্রাজিলবাসিদিগেরও এই মত। উত্তর-আসিয়ার তুরানীয় জাতিদিগের প্রেত দেহপার্শ্বে বাস করে। শ্যামদেশে ও কিরাত জাতিদিগের মধ্যে কতকগুলি আত্মা স্বর্গে যায়; কিন্তু বালকের আত্মা, দুর্বিপাকে যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, পাপিষ্ঠ ও যাহাদিগের সংকার করা হয় নাই, তাহারা পৃথিবীতেই ঘুরিয়া বেড়ায়। পূর্ব্বে গ্রীস দেশে ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে এই বিশ্বাস ছিল।

পলিনেসিয়া, আমেরিকা, সাইবিরিয়া, সামোয়া, বোর্ণিও, মাদাগাস্কার, পেরু ও রোম দেশে যেখানে মৃতদেহের সংকার হয়, সেইখানেই প্রেতগণ বাস করিয়া থাকে। নবকালিডোনিয়া, সামোয়া ও সমুদ্রতটবাসী আফ্রিকার অসভ্য জাতিরা বলে প্রেতপুরুষ প্রান্তরস্থ জঙ্গলে বাস করে। বুলোম জাতির বিশ্বাস কেবল নিকৃষ্ট প্রেতগণ নগরের অদূরস্থ প্রান্তরে বাস করিয়া থাকে; কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর প্রেতগণের নিবাস আরো দূরে। কারিব, কোমাঞ্চি, পাটাগোনিয়ান, দায়াক ও পশ্চিম-আমেরিকার অধিবাসীরা পর্ব্বত-গহ্বরে মৃতদেহ কবরসাৎ করে। এইজন্য দায়াকেরা বলে পর্ব্বতশৃঙ্গ প্রেতগণে পরিপূর্ণ। টাহিটীবাসিদিগের মতে স্বর্গ পর্ব্বত-পৃষ্ঠে; কৈলাস পর্ব্বত হিন্দুদিগের স্বর্গভূমি বলিয়া বিশ্বাস। হিমালয় দেব-নিকেতন। মালাগাজিদের মতে পর্ব্বতপৃষ্ঠ দেবভূমি। ফিজিদ্বীপে নির্জ্জন গিরিগুহায় প্রেত-নিবাস। দেবদর্শন লালসায় অধিবাসিগণ সেই সকল স্থানে তীর্থ যাত্রা করিয়া থাকে। দক্ষিণ-আফ্রিকার বাপারিঁ জাতি বলে, মনুষ্য গিরিগুহায় সৃষ্ট হইয়াছিল, মৃত্যুর পরে আত্মা সেইখানেই প্রত্যা-

বর্ত্তন করে। মেক্‌সিকো দেশে ও আজটেক জাতির মতে গুহা মধ্য দিয়া স্বর্গে যাইতে হয়। জার্ম্মাণির উত্তরাংশে ও নিম্নশ্রেণীর ইংরাজদিগের মধ্যেও এইরূপ বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকায় রকি পর্ব্বতের উপরে, বোর্ণিও দ্বীপে কিনবালু পর্ব্বতের শৃঙ্গে, এবং জাবা দ্বীপের পশ্চিমাংশে গুনংডঙ্কা পাহাড় দেবনিবাস। হেটী দ্বীপেও এইরূপ বিশ্বাস।

কবর হইতে পাতাল অনেক দূর নহে। খন্দজাতির দেবগণ মাটীর মধ্যে বাস করে, ইচ্ছা হইলে এক একবার বাহিরে আসে। টেরাডেলফিউগো হইতে মেক্সিকো পর্য্যন্ত, আসিয়া ও য়ুরোপের নানা স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে দেববাস। আমেরিকার অর্দ্ধেক লোকের বিশ্বাস ভূগর্ভে মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বাসুট-দেশে ও আফ্রিকার অন্যান্য অংশে লোকেরা এক একটী গর্ত্ত দেখাইয়া দেয়, তাহার মধ্য হইতে প্রথম মনুষ্য দেখা দিয়াছিল। নীলগিরিবাসী টোডাজাতিরও বিশ্বাস মৃত্তিকা ভেদ করিয়া মনুষ্য উদয় হইয়াছিল। কামাস্কাটকাবাসিদিগের স্বর্গ পাতালে। উত্তর-আমেরিকাবাসী তাকুলিজাতির প্রেতগণ পাতালে বাস করে, মধ্যে মধ্যে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে দেখা দেয়। পাটাগোনিয়ান ব্রাজিলবাসী এবং নোদোবেশীজাতিরও স্বর্গ পাতালে। নবজিলাণ্ড ও সামোয়া-বাসী এবং জুলুদিগেরও এইরূপ বিশ্বাস। কিরাত জাতির স্বর্গ পাতালে। মেক্সিকো ও পেরু, রোম ও গ্রীস এবং মিসর দেশেও মৃত্তিকা নিম্নে প্রেতস্থলী। হিন্দু, খৃষ্ট, জরাথুস্থ্রব ধর্ম্মমতে নরক মৃত্তিকার নিম্নে।

কবর হইতে পাতাল যত নিকটে, পর্ব্বতচূড়া হইতে আকাশ, সূর্য্য চন্দ্র সেইরূপ নিকটে। বস্তুতঃ সভ্য সমাজের বিজ্ঞানবিৎ হইতে অসভ্য সমাজের নানা লোকের সূর্য্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্রাদি দেববাস বলিয়া বিশ্বাস। অভাগিনী বক্ষ হইতে মস্তক তুলিয়া আপ্লুত নয়নে ঐ দিকেই চায়, আকাশে প্রিয়জনের মুখ-চ্ছবি যদি দেখিতে পায়। চন্দ্র সূর্য্যে মানবজাতির কত বিশ্বাস, কত অশেঙ্কা, কত আশা, ইয়ত্তা করা যায় না। ভাবী সমাজতত্ত্ববিৎগণ আলোচনা করিয়া অবাক্ হইবেন। দেহ, মন, সমাজ ও ধর্ম্মমতের উন্নতি অবনতিতে গ্রহগণ ভূয়সী ক্ষমতা সঞ্চালন করিয়াছে। মিসিসিপি-নদীতটবাসী নাচেজ জাতি এবং ফ্লরিডাবাসী আপলবে জাতি, মেক্সিকো ও পেরুদেশে সূর্য্যমণ্ডল পরলোকগত আত্মার বাসস্থান বলিয়া সকলে বিশ্বাস করে। দক্ষিণ আমেরিকার মালিব ইণ্ডিয়ানেরা চন্দ্রকে স্বর্গ বলিয়া দেখাইয়া দেয় এবং মনে করে ওখানে মশার যন্ত্রণা কাহাকেও সহ্য করিতে হয় না। গাইকুরু জাতি বলে চন্দ্রমণ্ডলে, সর্দ্দার ও চিকিৎসকদিগের আত্মার বাস এবং পলিনেসিয়ানদিগের মতে রাজা ও সর্দ্দা-

রেরা ঐ খানে বাস করে। প্লুটার্ক, টেলার, ফিগেয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে স্বর্গ আকাশে। জুলুরা বলে নীল আকাশ পর্ব্বতমাত্র, উহার গহ্বরে সূর্য্যচন্দ্রের বাস এবং পরিধিম্ গুলে দেবগণের বাসস্থান। প্রাচীন লিবিয়া জাতির এবং বর্ত্তমান নবজিলাণ্ডবাসিদিগের বিশ্বাস আকাশ কাচের মত, উহার উপরে দেবভূমি। অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন জাতি বলে মৃত্যুর পর আত্মা মেঘের উপর চলিয়া যায় এবং সেখানে আত্মা আহার করে, মাছ ধরে ও শিকার করে। উত্তর আমেরিকার বিনোহ্ জাতির মতে ছায়াপথ ধরিয়া আত্মা আকাশের উপর স্বর্গে চলিয়া যায়। ইরোকোয়া জাতি বলে উর্দ্ধদিকে উঠিয়া পশ্চিম মুখে যাইলে ধন জন নগর-বৃক্ষলতা-সমাকীর্ণ স্বর্গের বিপুল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারা যায়। প্রাচীন গুয়ারাণী ও বর্ত্তমান গুয়ারায়ো জাতির মতে পূর্ব্বদিকে আকাশের উপর স্বর্গ। মেক্সিকোবাসীরা বলিত প্রেতপুরী আলোকিত করিবার জন্য সূর্য্য পশ্চিমদিকে ধাবমান হয়। পেরুভিয়, আজটেক, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, পারসী, য়িহুদা, খৃষ্টান ও মুসলমান, প্রাচীন ও নূতন, সভ্য বা অসভ্য অনেকে হীরকখচিত নীলাকাশে মনোমত পদার্থপূর্ণ স্বর্গের কল্পনা করিয়া থাকে।

হিন্দুরা গঙ্গাজলে প্রেতকৃত্য সমাপন করে, পিতৃগণের পানীয় ও ভক্ষ্য গঙ্গাবাহে প্রেতপুরীতে উপস্থিত হয়। প্রেতপুরী বৈতরণীর অপরদিকে। অতি দূরদেশে কাহারও মৃত্যু হইলেও সাঁওতালেরা তাহার দেহ দগ্ধ করিয়া মস্তকের তিনখানি অস্থি দামোদর-জলে ভাসাইয়া দেয়। নদীস্রোতে আত্মা প্রাচীন পুরুষদিগের পূর্ব্ববাস পূর্ব্বদেশে উপস্থিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার কোনস্ জাতি বলে সাগরের অপরপ্রান্তবাসী পশ্চিমদেশীয় জাতিরা তাহাদিগের আদি পুরুষ। মৃত্যু পরে আত্মা সেই দেশে চলিয়া যায়। অরকানিয়ানদিগেরও এই বিশ্বাস। পেরুভিয়দিগের স্বর্গ পূর্ব্বদিকে, গায়েনাবাসী অটোমাকদিগের পশ্চিমদিকে, মধ্য আমেরিকাবাসিদিগের পূর্ব্বদিকে, উত্তর আমেরিকার চিনুক-জাতি ও চিপেবা জাতির দক্ষিণদিকে, ফালমক ও টোডাদিগের পশ্চিম ও কুকিদিগের উত্তর দিকে। এরোমাঙ্গাজাতির পূর্ব্বদিকে, লিফুবাসিদিগের পশ্চিম দিকে। ইংলাণ্ড প্রেতপুরী বলিয়া প্রাচীনকালে য়ুরোপের সর্ব্বত্র বিশ্বাস ছিল। যেদিকে স্বর্গ, মুমূর্ষুদিগকে সেই মুখে বসাইতে বা শোয়াইতে অনেক দেশে প্রথা আছে। অরকানিয়ানেরা পশ্চিম মুখে, দামারা ও বেকুয়ান জাতি উত্তর দিকে মুমূর্ষুদিগকে বসাইয়া থাকে।

বোর্ণিয়োবাসী কনউইট জাতি মৃত্যু পরে সর্দারদিগের সম্পত্তি একখান ভগ্নতরী পূর্ণ করিয়া নদীস্রোতে ছাড়িয়া দেয়। তরবারি, খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্রাদি ও একটী জীবন্তদাসী শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া সারাবকের মালানাম জাতি নৌকাযোগে সমুদ্রে ভাসাইয়া দেয়। অধুনা নৌকাখানি এইরূপে পূর্ণ করিয়া কবর-পার্শ্বে রাখিবার প্রথা হইয়াছে। চিনুকেরা মৃতদেহ নৌকা করিয়া নদীতটে রাখিয়া আইসে। সামোয়াজাতির প্রেতগণ স্বর্গে যাইবার সময়ে কিছুদূর স্থলপথে, কিয়দ্দূর বা সন্তরণ করিয়া সমুদ্র পার হইয়া যায়। নদী বা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য পাটনীকে দেয় মুদ্রা সঙ্গে দিবার ব্যবস্থা, ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ, মিশর, গ্রীস প্রভৃতি নানা দেশে প্রচলিত। সাণ্ডুইচ দ্বীপে কবরপার্শ্বে নৌকা দেখা গিয়াছে। নবজিলাণ্ডেও এই প্রথা। পশ্চিম পাটাগোনিয়ার কোনস জাতি সমুদ্রতটে নৌকা মধ্যে কবর দিয়া থাকে। নবদক্ষিণওয়েল্‌সেও এই রীতি। পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা নৌকাযোগে মৃতদেহ ভাসাইয়া দিত। অষ্টিয়াক্ জাতির মধ্যে এবং পূর্ব্বকালে স্কাণ্ডিনেভিয়া দেশে নৌকাবদ্ধ করিয়া কবর দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল।

দেশে সংক্রামক রোগ আক্রমণ করিলে একখানি নৌকা লইয়া গ্রামের চারিদিকে বেড়াইতে হয়। অধিবাসিগণ সেই সময়ে নানা প্রকার শব্দ করিয়া গৃহস্থিত প্রেতগণকে দূরীভূত করিয়া দেয়। অন্যত্র আশ্রয় স্থান না পাইয়া অগত্যা প্রেতগণ নৌকারোহণ করিয়া থাকে। দূরে নৌকাখানি ভাসাইয়া দিয়া মাল্লাগণ কোন প্রকারে ফিরিয়া আইসে। বৎসরে এক একবার নৌকা পূর্ণ করিয়া এইরূপে প্রেত বিদায় করিবার প্রথা নানা অসভ্য দেশে প্রচলিত।

পরাজিত ও বিজেতার আত্মা পরলোকে একত্র সহবাস করা সম্ভব নহে। দুর্ব্বল ও বলবান, রাজা ও প্রজার বাসস্থান পরলোকেও স্বতন্ত্র। এখানে যাহারা রাজত্ব করিয়াছে, পরকালেও তাহারা রাজত্ব করিবে, দাসের গোলামী কার্য্য সর্ব্বত্র সমান। টঙ্গাদ্বীপে সম্ভ্রান্তেরাই স্বর্গের অধিকারী, নীচ জাতির আত্মা দেহের সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পেরুদেশে সর্দ্দার ও সম্ভ্রান্তের আত্মা স্বর্গে যায়; অধম লোকেরা মৃত্যু পরে জীবযোনি প্রাপ্ত হয় বা নরকে যায়। গ্রীনলাণ্ডদেশে কেবল বীরপুরুষদিগের ভাগ্যে স্বর্গবাস ঘটিয়া থাকে। ভার্জিনিয়া দেশে শত্রুর আত্মা মৃত্যুর পরে যন্ত্রনা পায়। স্বপক্ষীয় বা শত্রুঘাতীরাই স্বর্গে যায়। ব্রাজিলের টুপিনাম্ব জাতির মতে যে যত জিঘাংসা চরিতার্থ করিতে

পারিয়াছে বা যত শত্রু উদরসাৎ করিয়াছে, স্বর্গে তাহার ভাগ্যে তত সুখ। কাপুরুষের ভাগ্যে নরকবাস। কারিবেরা বলে, স্বজাতীয় সাহসিগণ মৃত্যু পরে স্বর্গে যায়, অরবাক্‌জাতি তাহাদিগের দাসত্ব করে। কিন্তু কাপুরুষেরা অরবাকদিগের নির্বৃক্ষ পর্ব্বতের মধ্যে মৃত্যু পরে জীবনপাত করিয়া থাকে। সামোয়াদিগের সর্দ্দারেরা স্বর্গের অধিকারী। নবজিলাণ্ডেও এই বিশ্বাস। নিকারাগোয়াবাসিদিগের মধ্যে যাহারা যুদ্ধে হত হয়, তাহারাই স্বর্গে যায়। যুদ্ধে হত আত্মাদিগের সম্বন্ধে বিভিন্ন মত বিভিন্ন দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধে হত দেহ যুদ্ধক্ষেত্রে ধ্বংস হয় বলিয়া তাহাদিগের ভাগ্যে স্বর্গবাস ঘটে না, ইহা মলয় উপদ্বীপবাসী মিন্তির জাতির মত। যুদ্ধে হত বা আত্মদ্রোহীর আত্মা স্বর্গের অধিকারী নহে, উত্তর আমেরিকার হুরণ জাতির এই মত। কালিফর্ণিয়ার ইণ্ডিয়ানেরা বলে স্বর্গবাসী মহাপ্রভু বুদ্ধকে ঘৃণা করেন এবং যোদ্ধাদিগকে স্বর্গে স্থান দেন না। কিন্তু এই উত্তর আমেরিকারই কোন কোন জাতির মতে বীর পুরুষেরাই মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র। নিকারাগোয়াবাসিরা বলে যাহাদিগের গৃহে মৃত্যু হয়, তাহারা পাতালে যায়; কিন্তু যুদ্ধে হত বীরগণ সূর্য্যলোকে গমন করে। আজটেকদিগেরও এই মত। স্বর্গবাসের লোভ দেখাইয়া খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারকেরা যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উৎসাহিত করিয়া থাকেন।

স্বর্গ পৃথিবীর অনুরূপ মাত্র। ইহ জীবনে যাহাদিগের উচ্চ পদ লাভ হয়, তাহারাই স্বর্গের অধিকারী; পৃথিবীতে যাহাতে সুখ, স্বর্গে তাহারই প্রাচুর্য্য। টঙ্গাবাসিদিগের স্বর্গ একটী দ্বীপ মাত্র—সুন্দর ও প্রয়োজনীয় বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ, সেগুলি ফুল ও ফলভরে অবনত। একটী ফুল বা ফল চয়ন কর, তখনই আর একটীর সেখানে উদয় হইবে। চিলিবাসিদিগের স্বর্গ পার্থিব সুখে পরিপূর্ণ। মেক্সিকোর স্বর্গ একটী প্রশস্ত উদ্যান, সেখানে লঙ্কা, তরমুজ, বেগুণ রাশি রাশি জন্মিয়া থাকে। হেটীবাসিদিগের প্রেতগণ স্বর্গে গিয়া দিবসের আলোকে পর্ব্বত-কন্দরে লুকাইয়া থাকে, কিন্তু রজনীযোগে বহির্গত হইয়া রসাল ফলে রসনা পরিতৃপ্ত করে। গ্রীক স্বর্গ আবর্ত্তপূর্ণ সাগর-কাঞ্চি সুখ দ্বীপে, সেখানে ধরণী বৎসরে তিনবার মধুময় ফল শস্য প্রসব করিয়া থাকেন। সামোয়াবাসিদিগের প্রেতগণ স্বর্গেও কৃষিকার্য্য করে ও মৎস্য ধরে এবং রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু রজনীযোগে অগ্নিময় দেহে জন্মান্তরীণ বাসস্থানে পর্য্যটন করিতে আইসে—প্রভাত হইলেই জঙ্গল মধ্যে পুনরায় আশ্রয় লয়। অষ্ট্রেলিয়া-

মেঘ্না মৃত্যু পরে মেঘের উপর প্রস্থান করিয়া থাকে—সেথানে পান ভোজন, মৃগয়া করিয়াও মৎস্য ধরিবার যথেষ্ট সুবিধা ঘটে। গুয়ারাণীজাতি মৃত্যু পরে ঐহিক সকল সম্পত্তি পরলোকে প্রাপ্ত হয়—সেখানে মৃত বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং মৃগয়ার বড় সুবিধা। কিরাতদিগের আত্মা অস্ত্র শস্ত্রাদির আত্মা লইয়া স্বর্গে গৃহ নির্ম্মাণ করে ও শস্য সংগ্রহ করে। জুতার আত্মা পায় পরিয়া বরফের আত্মার উপর চলিয়া আলগনকিন ব্যাধদিগের আত্মা স্বর্গে হরিণ ও বিবরের আত্মা শিকার করে। কামাস্কাট্‌কার লোকেরা স্বর্গেও গাড়ী চড়ে, জুলুরা গোচারণ করে ও গাভী দোহন করে। সুস্থ বা অসুস্থ, ক্ষত বা অক্ষত শরীরে দক্ষিণ আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা পৃথিবীতে যে ভাবে দিনপাত করে, স্বর্গেও সেই ভাবে জীবনপাত হয়। অরকানিয়ানদিগের স্বর্গে অনায়াসে সকল প্রকার সুখ লাভ হয়, কেবল সন্তান লাভ হয় না—কারণ স্বর্গবাসী জীব আত্মা মাত্র। মঙ্গোলিয়ার লোকদের মতে স্বর্গে দাম্পত্য সুখ এত অধিক যে আববাহিত অবস্থায় কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার আত্মীয়েরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করে অবিবাহিত অবস্থায় কোন কন্যার মৃত্যু হইয়াছে এবং ঘোর ঘটা করিয়া পরলোকগত কুমার ও কুমারীর বিবাহ দেয়। চীনবাসীরাও ইহা শিখিয়াছে। আজিবোয়াদিগের প্রাণ পুরুষ অবিরত পশ্চিম মুখে যাইয়া স্রোতস্বতী তরঙ্গিণী উত্তীর্ণ হইয়া দেবপুরীতে উপস্থিত হয়, শিকারের মৃগ, অভিলষিত যাহা কিছু, সেখানে বিনা আয়াসে প্রচুর পরিমাণে লাভ হয়। প্রশস্ত কুটীরবাসী পূর্ব্বগত আত্মীয় স্বজনাদিগের সহিত সেখানে সাক্ষাৎকার লাভ হয়। বলিবিয়া ও ব্রাজিল দেশেও এইরূপ বিশ্বাস। মনুষ্যের অগ্রাহ্য অশরীরী আত্মা পাংশু কৃশ কোমল রামধনুকে আরোহণ করিয়া স্বর্গ ভূমি প্রবেশ করে। স্বর্গবাসসুখ পার্থিব সুখের সহিত তুলনা হয় না। হংস-কারণ্ডব মৎস্যাদি পরিপূর্ণ তড়াগতটে শিবির মধ্যে প্রেতগণ বাস করে। সেই তড়াগ জলের উচ্ছলিত অংশ বৃষ্টিরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হয়। স্বর্গে নিদাঘ চিরবিরাজমান—সূর্য্যের কনক কিরণে সকলই রঞ্জিত, সেখানে রাত্রি নাই, সুপেয়পানীয়, পশুপক্ষীর অভাব নাই, সিল মারিতে বা বল্‌গা হরিণ শিকার করিতে কোন কষ্ট হয় না। গ্রীনলাণ্ডবাসিদিগের স্বর্গে এত সুখ। দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্গত কিম্বুন্দ দেশের লোকেরা বলে সন্ধ্যাকালে সূর্য্য স্বর্গপুরীতে আলোক দিতে যায়। সেখানে ভক্ষ্যভোজ্য প্রচুর, সেবার জন্য রমণী অগণন, শিকার ও নৃত্যে পরম সুখ। পার্থিব সংসারে যে কষ্ট, স্বর্গীয়

সংসারে তাহার কিছুই নাই। মর্ম্মানদিগের স্বর্গ রঙ্গস্থল। দিবানিশি যুদ্ধা-মোদ চলিয়াছে—শত শত আত্মা হত হইতেছে, শত শত আত্মা হত্যা করি-তেছে। আবার আহার সময়ে সকলেই জীবন্ত হইয়া ইন্দ্রের সহিত একত্র পান ভোজন করে। মুসলমানের স্বর্গে বিলাস সুখের পরাকাষ্ঠা। আনন্দ কাননে রত্নখচিত সুবর্ণ পালঙ্কে সুবর্ণ উপাধানে অঙ্গ হেলাইয়া শুইয়া থাক, সুকুমার সুরূপ শিশুগণ তোমার সেবা করিবে—সুরভি মদিরা অবিশ্রাম পান কর, মত্ততা জন্মিবে না। সেখানে পদ্মের মৃণালে কণ্টক নাই, ফলভরে বৃক্ষ লতা ধরণীতলে অবনত, যে ফল ইচ্ছা আহার কর, দুর্ম্মূল্য পক্ষিমাংসে উদর পরিপূর্ণ কর, পীনপয়োধরা শুক্তিগত মুক্তার ন্যায় সুবর্ণা কজ্জলাক্ষি কামিনীগণ তোমার শুশ্রূষা করিবে। সেখানে বিবাদ বিসম্বাদ দুর্বাক্য প্রয়োগ নাই। কেবল শান্তি, শান্তি। য়িহুদাজাতির স্বর্গে বিদ্যালঙ্কার পণ্ডিতেরা শাস্ত্র উপদেশ করে, পণ্ডিত সভায় তুমুল আলোচনা হয়। ন্যায় শাস্ত্রের কূটতর্কে প্রেতগণের বড় আনন্দ। খৃষ্টানদিগেরও স্বর্গে যথেষ্ট পার্থিব সুখ লাভ হয়। স্বর্গে রাত্রি নাই, চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, সর্ব্বদা ঈশ্বরদেহ নিঃসৃত আলোকে স্বর্গভূমি আলোকিত। স্বর্গের ভূমি স্বর্ণময়, উহার এক এক দিকে ১৪৪ হস্ত পরিমিত বহুমূল্য প্রস্তরের প্রাচীর। নগরটী সমচতুরস্র। এক এক প্রাচীরে তিন তিনটী দ্বার। ঋগ্বেদের স্বর্গ জ্যোতির্ম্ময়, সুখ ও আনন্দের আবাস। সেখানে মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, পিতৃগণ দেবগণের সহিত বিরাজ করেন, সেখানে যাইতে হইলে নদী উত্তীর্ণ হইতে হয়। ব্রাহ্মদিগের স্বর্গ এইরূপ। "এই ত স্বর্গের ছবি, দেখিলে জুড়ায় আঁখি, প্রেমানন্দে উথলে হৃদয়। কিবা বাল বৃদ্ধ নর নারী, ব্রহ্ম পাদ-পিঠ ঘেরি, আনন্দেতে ব্রহ্মগুণ গায়।" হিন্দুদিগের স্বর্গে ঈপ্সিতফলবাহী নানা বৃক্ষসমন্বিত নন্দনাদি মনোহর উদ্যান। সেখানে সুন্দরী অপ্সরাগণ দেবতা-দিগের সেবা করে, বিচিত্র বিমানে গতায়াত হয়, শুভ্র চন্দ্রাতপের নিম্নে হেম শয্যায় শয়ন হয়। স্বর্গেও সৎ অসৎ উভয়বিধ কার্য্য হইয়া থাকে; স্বর্গেকৃত দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত গুরুতর। পৃথিবী অপেক্ষা স্বর্গে সুখ এত অধিক যে নানা জাতীয় লোকেরা মৃত্যু হইবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ পিতা মাতাকে কবর দিয়া, ফাঁসি দিয়া বা ভস্মসাৎ করিয়া স্বর্গে পাঠাইয়া থাকে।

অনুন্নত সমাজে পরলোকে পাপীর দণ্ড নাই। পৃথিবীতে যাহাদের ভাগ্যে দুঃখ দুর্দ্দশা, পরকালেও তাহাদের ভাগ্যে দুঃখ দুর্দ্দশা। স্বর্গ যেমন পার্থিব সুখ পরিপূর্ণ, নরক তেমনি পার্থিব যন্ত্রণার আলয়। ক্রমে কার্য্য বিশেষ মনুষ্য

ও দেবতার ঘৃণিত বলিয়া যখন গণ্য হইতে থাকে, তখন একমাত্র পাপীরাই নরকের অধিকার লাভ করে। সভ্য সমাজের বহুমানিত ধর্ম্মমতে পাপীর দণ্ড নরকে হয়। কিন্তু অসভ্যদিগের নরক অপেক্ষা সভ্যদিগের নরক অধিক উৎকৃষ্ট নহে। অসভ্যদিগের ন্যায় সভ্যদিগের স্বর্গ ও নরক পার্থিব সুখ দুঃখে পরিপূর্ণ। সুখ ও দুঃখের নিদান পৃথিবীতে যে পরিমাণে উন্নত হয়, স্বর্গেও সেই পরিমাণ উন্নতি লাভ করে। একথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য অতি অসভ্য আদিম সমাজে স্বর্গ ও নরকে প্রভেদ নাই। প্রাচীন রুসিয়া ও মেক্সিকো দেশে স্বর্গ ও নরক এক ছিল। ঋগ্বেদে নরকের উল্লেখ নাই, অথর্ব্ববেদে কেবল একটু আভাস পাওয়া যায় মাত্র। বাসুট জাতির প্রেতবাস পাতালে; সেখানে শ্যামল তৃণক্ষেত্রে বিচিত্রবর্ণ শৃঙ্গহীন গাভীযূথ বিচরণ করে, উহারা প্রেতগণের সম্পত্তি। সেখানে প্রেতদিগের সুখও নাই দুঃখও নাই—শান্তভাবে তাহারা চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। পাপ বা পুণ্যের পরলোকে শাস্তি বা পুরস্কার ইহারা বুঝে না। পশ্চিম-আফ্রিকার প্রেতবাস এইরূপ। দাহোমিদিগেরও সকল শ্রেণীর লোকের প্রেত একত্র বাস করে—যে এখানে রাজা, সে সেখানেও রাজা, যে এখানে দাস, সে পরলোকেও দাসত্ব করে। পৃথিবীর কর্ম্মফলে পরলোকে ভাগ্য পরিবর্ত্তন ইহারা বিশ্বাস করে না। যরুবাজাতি বলে এ পৃথিবীর কুটীর পরলোকের কুটীর অপেক্ষা ভাল। ফিন জাতির প্রেতবাসে মাটী ও জল, বন ও মাঠের অভাব নাই—কিন্তু ব্যাঘ্র, ভল্লূক ও সর্পে পরিপূর্ণ, সকলই ক্ষতিকর, সকলই ভয়ানক, সূর্য্যাসত্ত্বে ঘোর অন্ধকার, জল কৃষ্ণবর্ণ, মাঠে সাপের দাঁতের বীজ জন্মে—এই ভয়ঙ্কর নরকে নির্ম্মম বৃদ্ধ টুওনি, রাক্ষসী স্ত্রী ও রাক্ষস পুত্র লইয়া প্রহরণ করে। উহাদের অঙ্গুলি বঁড়শীর মত, হস্তে লৌহ-কণ্টক ;—দিবা নিশি জাগিয়া আছে, কেহ না পলাইতে পারে। গ্রীক, রোমান ও য়িহুদা নরক এইরূপ ভয়ঙ্কর। কর্ম্মফলানুসারে হিন্দুদিগের মতে নানা প্রকার নরক ভোগ করিতে হয়। কোথায়ও কৃমি ভক্ষণ, কোথায় কর্দ্দমপূর্ণ রক্তপান ঘটে। মেদ মাংস শোণিতের পূতিগন্ধে জীব নরকবাসে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। মিসরবাসিদিগের আত্মা মৃত্যুপরে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলে, সে জীবদ্দশায় প্রভুর নিকট ভৃত্যের নিন্দা করিয়াছিল কিনা, ভৃত্যকে অন্যায় পরিশ্রম করাইয়াছিল কিনা; মিথ্যা কথা কহিয়াছিল কিনা, প্রতারণা বা নরহত্যা করিয়াছিল কিনা ; দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করা, মৃত ব্যক্তির পরিধেয় হরণ করা, ব্যভিচার করা, গোচারণের মাঠে শিকার করা

বা দেব-পক্ষী বধ করা প্রভৃতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল কিনা—ইহার পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার ফলানুসারে সে সুখময় সূর্য্য-লোকে বা যন্ত্রণাপূর্ণ পাতালে প্রেরিত হয়।

জেনদা আবেস্তা নামক প্রাচীন পারসিদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে স্বর্গ ও নরক এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সাধুগণের মৃত্যু হইলে তাহাদিগের সংকীর্ত্তি পঞ্চদশবর্ষীয়া পরম সুন্দরী যুবতীরূপে তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া সুরভিপূর্ণ স্বর্গে লইয়া যায়। সেখানে অমরগণ সুখদ ভোজ্য পানীয় দিয়া তাহাদিগের অভ্যর্থনা করে। কিন্তু অসাধুদিগের আত্মা কদাকার অসংকীর্ত্তি সমভিব্যাহারে পূতিগন্ধময় নরকে প্রবেশ করে—নরকবাসী জীবগণ তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিতে থাকে। প্রত্যাগত হইবার ইচ্ছা হইলেও অসংকীর্ত্তি বলপূর্ব্বক সে কুণ্ড মধ্যে তাহাদিগকে লইয়া যায়, তখন অনৃমৈন্যো তাহাকে গরল আহার করিতে দেয়। খৃষ্টানদিগের নরকে দিবানিশি গন্ধকের অগ্নি জ্বলিতেছে—পলাইবার উপায় নাই—সে কুণ্ড অতল—যে একবার সেখানে প্রবেশ করে, অনন্তকাল তাহার নিষ্কৃতি নাই।

যাহারা পরলোকে সুনীতি বা দুর্নীতির পুরস্কার বা দণ্ড স্বীকার করে না, দেবপূজা বা পুরোহিত-আদিষ্ট ধর্ম্মাচরণজনিত ফলভোগ পরলোকে ঘটে, এ বিশ্বাস যে অসভ্য সমাজে নাই, একথা বিশেষরূপে উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। কিসে সমাজের শুভ ফল লাভ হয়, স্থির করিতে মানব বুদ্ধির অনেক দিন অতিপাত হইয়াছে। অশুভফলপ্রদ কার্য্য অন্যায় এবং তাহাদিগের আচরণে ইহ জীবনে সুখ লাভ হইলেও পরকালে তজ্জন্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, এতাদৃশ বিচক্ষণ বুদ্ধি কেবল সভ্য সমাজে সম্ভব। কোন কোন অসভ্য সমাজে এরূপ বিশ্বাসের নিদর্শন পাওয়া যাইলেও প্রমাণ হইয়াছে, সে সকল সভ্য সমাজের নিকট শিক্ষিত, অসভ্য প্রকৃতির স্বাভাবিক বিশ্বাস নহে।

---

# চতুর্দ্দশ পল্লব।

মৃত্যুর সহিত আত্মার মৃত্যু হয় না, এ বিশ্বাস সাধারণতঃ অসভ্য সমাজে দৃষ্ট হইলেও অসভ্যেরা আত্মার অমরত্ব স্বীকার করে, ইহা অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। আত্মা অনন্ত কাল জীবিত থাকিবে, অনন্তকাল উন্নতি করিবে; ইহা দার্শনিকের—সুসভ্য সমাজের কথা। অনন্তের ভাব সভ্য সমাজেরও গ্রাহ্য নহে। অস্ফুটপ্রকৃতি অসভ্যের সকলই স্থূল পরিমিত—অসভ্যের মন ইন্দ্রিয়-শক্তি অতিক্রম করিতে পারে না। যাহাদিগের গণনা-শক্তি হস্ত পদের অঙ্গুলি সংখ্যার সহিত শেষ হয়, অনন্ত তাহাদিগের বুদ্ধির অতীত, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। সত্য বটে, মৃত্যু পরে আত্মা বাঁচিয়া থাকে নানা অসভ্য জাতির ইহা বিশ্বাস; তথাপি পরলোকেও আত্মার জীবন ইহকালের ন্যায় অচিরস্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস করিতে অসভ্য সমাজে সাধারণতঃ উপলক্ষিত হয়। যতদিন স্মৃতিপথে মৃতগণের আকৃতি উদিত হইতে থাকে, তত দিন পরলোকে তাহাদের জীবন কল্পনা করা যায়, স্মৃতির অতীত হইলে পরলোকেও প্রাণপুরুষের অবসান ঘটে।

প্রেতাত্মার জীবন সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুইটী বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, আত্মার যোনি ভ্রমণ। দ্বিতীয়, আত্মার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস। আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি মনুষ্যের ন্যায় জীবজন্তু চেতন অচেতন সকল প্রকার পদার্থের আত্মা আছে বলিয়া অসভ্যদিগের বিশ্বাস। আত্মার অমরত্বে যাহাদিগের বিশ্বাস নাই, ইহজীবনের কর্ম্মফলে জীবনান্তরে মনুষ্যের অন্য যোনি ভ্রমণ তাহারাও বিশ্বাস করে। বস্তুতঃ কোন্‌টী পাপ কার্য্য কোন্‌টী পুণ্য কর্ম্ম এতৎসম্বন্ধে অবস্থা বিশেষে বিবেচনা ভিন্ন হইলেও কর্ম্মফল মনুষ্যকে ভোগ করিতে হয়, অসভ্য অবস্থায় যে কোথায় কোথায়ও এ বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা স্বর্গ ও নরকে বাসস্থানের বিভিন্নতা দেখাইবার সময় আমরা প্রকারান্তরে প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি। আবশ্যক কার্য্য সমাধা করিবার জন্য চেতন বা অচেতন পদার্থবিশেষে সময় বিশেষের জন্য প্রাণপুরুষের প্রবেশ করিবার দৃষ্টান্তও আমরা পূর্ব্বে যথেষ্ট দেখাইয়াছি।

বহু কালের জন্য একজনের আত্মা যে অন্য শরীরে বাস করিয়া থাকে, এখন

তাহাই দেখান আবশ্যক হইতেছে। নবজাত শিশু সন্দর্শনে আমাদিগের আত্মীয়গণ যখন গম্ভীরভাবে বিচার করিতে বসেন, মোহপাশ কাটাইতে না পারিয়া কোন্ আত্মীয় আবার অন্ধকার-গৃহ উজ্জ্বল করিতে ফিরিয়া আসিলেন, তাহা দেখিয়া উপহাস করিবার কারণ নাই। জন্মজন্মান্তরে মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষা পূরণ বা কর্ম্মফল, হিন্দু-সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতার বিশ্বাস।

হিন্দুগণ বৌদ্ধদিগের নিকট এই বিশ্বাস শিক্ষা করিয়াছিলেন কি বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগের ইহা নিকট শিক্ষা করিয়াছিল, আমাদের বিচার করিবার আবশ্যক নাই। কর্ম্মফলে যোনি-ভ্রমণ বৌদ্ধধর্ম্মের বিশ্বাস ইহা স্মরণ করাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে। উত্তর আমেরিকার আলগনকিন-জাতি মৃত শিশুকে পথপার্শ্বে কবর দেয়। ইহাদিগের বিশ্বাস সে পথে যে স্ত্রীলোক যাইবে, তাহাদিগের কাহারও গর্ভে শিশু আশ্রয় লাভ করিবে। উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার টাকুনী জাতির কেহ মুমূর্ষু হইলে গুণী তাহার বুকের উপর হাত রাখিয়া নিকটস্থ কোন আত্মীয়ের মস্তকে ফুৎকার দিতে থাকে। সেই আত্মীয়ের কোন সন্তান হইলে নবজাত শিশু মৃত ব্যক্তির নাম, উপাধি ও সম্ভ্রম লাভ করে। গ্রীনলাণ্ডদেশে ও নুট্‌কাদ্বীপে একজনের শিশু মৃত্যুপরে অন্যের ঔরসে জন্মিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে দেখা যায়। আমাদিগের মত উত্তর পশ্চিম আমেরিকার কালোসী জাতি বলিয়া দিতে পারে কোন্ পুরুষের আত্মা শিশুশরীরে প্রবেশ করিয়াছে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বানকুবর দ্বীপে একটা শিশুকে সমাজ মধ্যে বড় সম্মানিত হইতে দেখা গিয়াছিল; শিশুদেহের একটা চিহ্ন দেখিয়া সকলে অনুমান করিয়াছিল, অনেক দিন পূর্ব্বে তাহাদের একটা সর্দ্দার গুলির আঘাতে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিল, সেই আবার শিশুরূপে জন্মিয়াছে। প্রাচীন কালাবারে একটীর মৃত্যুর পর, আর একটী শিশু জন্মিলে জননীরা মনে করে সেই আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। বনিকা জাতি বলে, পূর্ব্বপুরুষের আত্মা শিশু-শরীরে আবির্ভূত হয় বলিয়া শিশুর আকৃতি পিতামাতার মত হয়। গিনিদেশেও এই বিশ্বাস। যরুবা জাতির সন্তান হইলে "আপনি আসিয়াছেন" বলিয়া সকলে অভিবাদন করে এবং লক্ষণ ধরিয়া অনুমাণ করিয়া বলে তিনি কে। উড়িষ্যার খন্দজাতির ওঝাগণ জলে ধান ফেলিয়া এবং লক্ষণ দেখিয়া স্থির করে শিশু-শরীরে কাহার আত্মা আবির্ভূত হইয়াছে এবং তাহারই নামানুসারে শিশুর নামকরণ হয়। দাহোমি নবজিলাণ্ড ও উত্তর আমেরিকার এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। দাসত্বপীড়িত নিগ্রোগণ আত্মহত্যা করিয়া যন্ত্রণা এড়াইত

তাহাদের বিশ্বাস মৃত্যু পরে আবার জন্মভূমিতে পুনর্জন্মলাভ করিবে। কৃষ্ণকায় জাতি মৃত্যুপরে সাহেব হয়, এ বিশ্বাস নানা জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। মেলবোর্ণে একটী অসভ্যকে ফাঁসি দিবার সময় আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখা গিয়াছিল। তাহার বিশ্বাস ছিল ফাঁসিটা হইয়া গেলেই সে সাহেব হইবে এবং অনেক পয়সা উপার্জ্জন করিবে। অস্ট্রেলিয়ানেরা বলে "ধপ্ করে কালা লোক মরে ফস্ করে সাদা হয়।" টরিসষ্ট্রেট দ্বীপপুঞ্জ হইতে নবকালিডোনিয়া পর্য্যন্ত এবং পাশ্চাত্য নিগ্রো ও নীল নদের তটবাসী বারি জাতির মধ্যেও এই বিশ্বাস।

উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা বলে, মৃত্যু পরে প্রাণপুরুষ ভালুকের দেহ ধারণ করে। এস্কিমো জাতীয় একটী বিধবা কেবল পক্ষীমাংসে জীবন রক্ষা করিত; ওয়ালরসের (Walrus) মাংস খাইত না। কারণ তাহার স্বামী ওয়ালরসের দেহে প্রবেশ করিয়াছিল। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে পৌহাতন জাতির সর্দ্দারদিগের আত্মা এক প্রকার পক্ষিদেহে প্রবেশ করিত, এজন্য তাহারা কদাপি সে পক্ষী শিকার করিত না। হুরন জাতির আত্মা ঘুঘু পক্ষী হয়। ইরিকোয়া জাতির দেহ কবরসাৎ করিবার সময় একটী পাখী আকাশে উড়াইয়া দেয়, সে মৃত আত্মা লইয়া পলায়ন করে। মেক্সিকো বাসী লাস্কালানজাতি বলে সম্ভ্রান্তদিগের আত্মা সুন্দর পক্ষীরূপ ধারণ করে, নীচ জাতির আত্মা গুবরে পোকা প্রভৃতি কীটদেহে প্রবেশ করে। ব্রাজিলবাসী টেকুনা জাতি বলে মনুষ্য মৃত্যুপরে আবার মানুষ বা পশুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইকানা জাতি বলে সাহসী লোক মৃত্যু পরে সুন্দর পক্ষীদেহ ধারণ করে, কিন্তু কাপুরুষেরা সর্পযোনি প্রাপ্ত হয়। আবিপোন জাতির মতে বালহংস মনুষ্য-আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত। পাপুয়ান জাতির মতে মৃত্যু পরে মনুষ্য ঘুঘু দেহ প্রাপ্ত হয়। আফ্রিকাবাসী মরোভিদিগের ভাল লোকেরা সর্পযোনি এবং মন্দ লোকেরা শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যের আত্মা সর্পযোনি প্রাপ্ত হয়, ইহা জুলুরাও বিশ্বাস করে। গিনিবাসিদিগের মতে মৃত্যু পরে মনুষ্য, বানর কুম্ভীর বা সর্প জন্মলাভ করে।' বোর্ণিয়োর দায়াক ও ভারতবর্ষের সাঁওতালদিগের মতে মনুষ্য আত্মা জন্মান্তরে বৃক্ষরূপ ধারণ করে। বৌদ্ধদিগের মতে শাক্যসিংহ বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে পাঁচশত পঞ্চাশ বার রাজা, সন্ন্যাসী কুম্ভকার, হস্তী, বৃষ, সর্প, পক্ষী, মৎস্য, ভেক, বৃক্ষ প্রভৃতি নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মিসর, গ্রীস ও রোমবাসীরা এবং য়িহুদা জাতি ভিন্ন

যোনিতে আত্মার পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করিত। বল্‌গেরিয়াবাসী খ্রীষ্টানেরা বলে, তুরস্কবাসী মুসলমানেরা শূকর-মাংস ভক্ষণ করে না, এজন্য উহারা জন্মান্তরে বরাহরূপ ধারণ করিবে।

ভারতবর্ষীয় চালিকটা, ভূঁইহার, ওরাঁও, জুয়াঙ্গ ও সাঁওতাল জাতির ভূতেরা মনুষ্যের ন্যায় মরণশীল। মাইক্রোনেশীয়ানদিগের মতে যাহাদিগের গায় উল্কি থাকে তাহারাই কেবল স্বর্গে যাইতে পায়; অন্য আত্মা সকলকে বেণীনামে রাক্ষসী ভক্ষণ করিয়া ফেলে। গিনিবাসী কোন কোন নিগ্রো-জাতির মতে যাহারা মৃত্যু পরে নরজন্মে সৎকার্য্যের পরিচয় দিতে না পারে, তাহাদিগকে নদীজলে ডুবাইয়া হত্যা করা হয়। হড্‌সন-উপসাগর-তটবাসী ইণ্ডিয়ানদিগের মৃত্যুপরে আত্মার পুনর্জ্জন্ম বা অমরত্বে কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। সুদানবাসী বঙ্গোজাতি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করে না। নিগ্রোদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, পিতা বা ভ্রাতা মৃত্যুপরে প্রেতরূপে বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু পিতামহ প্রভৃতি মরিয়া যায়। স্বপ্নে কেবল পিতা বা ভ্রাতাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, আমাজুপুকাফিরেরা উহাদিগের প্রেত আত্মার সত্বায় বিশ্বাস করিয়া থাকে; কিন্তু প্রপিতামহ প্রভৃতির মৃত্যুর সহিত আত্মার শেষ হয়, ইহা উহাদের বিশ্বাস। টঙ্গাদ্বীপে কেবল সম্ভ্রান্তবংশীয়েরা পরলোক প্রাপ্ত হয়। অপর সকলের দেহের সহিত আত্মারও মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহ জীবনে সৎকার্য্য সাধন না করিলে নিকারাগোয়াবাসিরা বলে দেহের সহিত আত্মারও ধ্বংস হয়। গ্রীনলাণ্ডবাসিদিগের মতে শীত অধিক হইলে পরলোক-বাসী আত্মারও মৃত্যু হয়; ফিজীয়ানেরা বলে, পরলোকে যমের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। যুদ্ধে যাহারা হত হয়, তাহাদের প্রেতাত্মা থাকে না। যাহারা জয়লাভ করে তাহারাই কেবল পরলোকে বাস করিতে পায়। এই যুদ্ধে অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজন হইবে বলিয়া ইহারা মৃতদেহের সহিত অস্ত্রশস্ত্রাদি কবর দিয়া থাকে। ইহারা বলে অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হইলে যমপুরীর পার্শ্ববর্ত্তী নদী পার হইতে পারা যায় না—ডুবিয়া মরিতে হয়; তাহাদের আর যুদ্ধ করিবার আবশ্যক হয় না। গিনিবাসী নিগ্রোরাও ঐ কথা বলিয়া থাকে। পার্থিব জলেও অনেকের প্রেতাত্মা ডুবিয়া মরে। মাতাম্বা জাতির বিধবাগণ পুনর্বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে নদীজলে স্নান করিয়া আইসে। স্বামীর প্রেতাত্মা শরী-রের কোথায়ও লুকাইয়া থাকিলে, নদীজলে তাহার অবসান হয়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি মৃতদেহের সংকার না করিলে দেহের সহিত

আত্মারও মৃত্যু হয়, ইহা নানা জাতির বিশ্বাস; এবং এইজন্যই কবর মধ্যে দেহ গোপন করিবার বা নিরাপদ স্থানে রাখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মৃত্যু পরে প্রেতাত্মা না বাঁচিতে পারে, এই অভিলাষ করিয়া আবিসিনিয়া দেশে অপরাধিদিগের দেহ কবরসাৎ করা হয় না। চিবচা জাতির মধ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত আছে। নবজিলাণ্ডের লোকেরা বলে, যাহার দেহ তাহারা উদরসাৎ করিয়াছে, তাহার আত্মাও ধ্বংস হইয়াছে। দামারা জাতি বলে মৃত দেহ কবরসাৎ করিলে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা মধ্যে মধ্যে গৃহে আসিয়া আত্মীয়-স্বজনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। কিন্তু মৃতদেহ প্রান্তর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আসিলে যদি শৃগাল বা ব্যাঘ্রে উহা উদরসাৎ করে, তবে দেহের সহিত আত্মারও নির্ব্বাণ হয়, বন্ধু বান্ধবগণ প্রেতাত্মার অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। পূর্ব্বোল্লিখিত মাতিয়াম্বা নিগ্রো-রমণীগণ স্বামীর প্রেতপুরুষকে মারিয়া ফেলিয়া পুনরায় সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য নদী-জলে স্বামীর মৃত দেহ ডুবাইয়া দেয়। হয়ত এইরূপ কারণেই কামস্কাট্‌কাবাসিগণ ও তাতারেরা এবং প্রাচীন হিন্দু ও পারসীকেরা কুকুর দ্বারা মৃত দেহ ভক্ষণ করাইত। পণ্ডিত মোক্ষমুলার বেদ সমালোচন করিবার সময় আত্মার অমরত্বে প্রাচীন হিন্দুগণের বিশ্বাস প্রমাণ করিবার জন্য ঋগ্বেদ হইতে যে সকল সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, মৃত্যু পরে আত্মার অনন্ত জীবনে প্রাচীন আর্য্যগণ বিশ্বাস করিত বলিয়া তাহার কোনটিতে দৃষ্ট হয় না। ওল্‌ড টেষ্টামেণ্ট নামক খৃষ্টান ও য়িহুদিদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম-গ্রন্থে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধীয় কোন কথার উল্লেখ নাই, ইহা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মোক্ষমুলার স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন আমরা স্থানান্তরে দেখাইয়া আসিয়াছি। অন্যান্য অসভ্যজাতির ন্যায় সভ্য আর্য্য বা ইহুদাজাতির স্বর্গও পার্থিব সুখের আগার মাত্র। আত্মার অনন্ত কাল নিবাসের কোন আয়োজন সেখানে দৃষ্ট হয় না।

বস্তুতঃ যতদিন প্রেতাত্মা নরজীবনের অনুরূপমাত্র জীবনভাগী বলিয়া বিশ্বাস মানববুদ্ধি অতিক্রম করিতে না পারে, ততদিন আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। আত্মা জড়দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন, জড়গুণের অতীত স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী, এ বিশ্বাস কেবল পরিস্ফুটবুদ্ধির সম্ভব। এবং এই বিশ্বাস জন্মিলেই দেহের ধর্ম্ম মৃত্যু অশরীরী আত্মার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস জন্মিতে পারে। এরূপ দার্শনিক বিশ্বাস অপরিস্ফুটবুদ্ধির নিকট আশা করা যায় না। এবং আশা করিয়া বিফল হইলে দুঃখিত হইবার কারণ নাই।

অন্যান্য গুণের ন্যায় মনুষ্যের ধর্ম্মবিশ্বাস কালক্রমে উন্নততর হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ দেখা যায় না। বিশ্বাস সহজ না হইলেই যে মিথ্যা এবং সাধারণ হইলেই সত্য হইবে, এরূপ অনুমান বিজ্ঞান-সম্মত নহে।

---

# পঞ্চদশ পল্লব।

পদার্থমাত্রেরই আত্মা আছে। মনুষ্যের আত্মা, জীবজন্তুর আত্মা, বৃক্ষ পর্ব্বতের আত্মা, নদীর আত্মা, প্রস্তরের আত্মা, সকলেরই আত্মা আছে বলিয়া অসভ্যেরা বিশ্বাস করে। মনুষ্যের আত্মার অনুমানে এই সকল আত্মা অনুমিত হয়। সুতরাং অন্যান্য পদার্থের আত্মা মানবাত্মার স্বরূপে কল্পিত হইবে, আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মনুষ্যের ন্যায় অন্যান্য পদার্থের আত্মা জঙ্গম, ক্ষুৎপিপসাশালী এবং সংসারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে, সকল আত্মাই মনুষ্যের ন্যায় শরীরবিশিষ্ট। আমরা দেখাইয়াছি আত্মার সত্বা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। মরুভূমে কিছু নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, আরাবেরা পাছে কোন প্রেতপুরুষের দেহে আঘাত লাগে, এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। যে বিশ্বাস হেতু এই প্রথার উদ্ভব হইয়াছে, সে বিশ্বাস বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেখা যায়। আবার যাহা কিছু অসভ্য বুদ্ধির অতীত, অসভ্যেরা তাহাই প্রেতকার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যেও যেটী বুঝা গেল না, সেটীও কোন প্রকারে মনঃপূত করিয়া রাখা অসুলভ নহে। পরন্তু অনুন্নতবুদ্ধি অসাধারণ কার্য্য সকল প্রেত ভিন্ন আর কাহাকে আরোপ করিবে? প্রেত বিশ্বাস অসভ্যের বিজ্ঞান ও দর্শন।

প্রেতগণ সকল প্রকার পীড়ার কারণ, ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে আর কয়েকটী দেওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বোপদ্বীপে যে সকল প্রেতপুরুষ লোকের পীড়া উৎপাদন করে, তাহাদিগের আহারের জন্য কিছু খাদ্য সামগ্রী একখানি নৌকায় রাখা হয়। আহার্য্যের লোভে তাহারা নৌকায় উঠিলে নৌকাখানি ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আর তাহারা

ফিরিয়া আসিতে পারে না। নিকোবর দ্বীপে মারীভয় হইলে একখানি নৌকা লইয়া গ্রামের চারিদিকে ভ্রমণ করা হয়। গ্রামবাসীরা চিৎকার করিয়া ভয় দেখাইয়া ভূতগুলিকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়; তখন অগত্যা তাহারা নৌকা মধ্যে আশ্রয় লয়। তখন নৌকাখানি সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রী নবাব সার সালার জঙ্গ মৃত্যুর ছয় দিন পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাইবার সময় যেন জাহাজে ওলাউঠা হওয়াতে তাঁহাকে সকলে জনশূন্যদ্বীপে ফেলিয়া দিয়াছিল। সেখানে একজন মুসলমান তাঁহাকে অস্ত্র প্রহার করে। স্বপ্নটী বিপদসূচক বলিয়া তাঁহার পরিবারেরা অপদেবতার সন্তুষ্টির জন্য মেষ বলিদান করিয়াছিল। হায়দরাবাদে এ প্রথাকে শুটকা বলে। বলা বাহুল্য সার সালার জঙ্গ মুসলমান ছিলেন। নবজিলাণ্ডে শিশুদিগের আত্মা উদরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পীড়া উৎপাদন করে। ইহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রেত ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রোগ উৎপাদন করে। দেবতার আবির্ভাবে লোকে পাগল হয় বলিয়া বারোলোঙ্গ জাতি পাগলদের পূজা করে। চীনদেশীয়দিগের কাহারও মস্তকের পীড়া হইলে বলে তাহাকে ভূতে পাইয়াছে; ভূত ছাড়ানই সে রোগের ঔষধ। ব্রহ্মবাসী কেহ জঙ্গলে প্রবেশ করিলে জঙ্গলের ভূত তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়া কম্পজ্বর উৎপাদন করে। দেহে প্রবেশ করিয়া ভূতে রোগ উৎপাদন করে, পূর্ব্বে এ বিশ্বাস গ্রীস ও রোমদেশেও দেখা যাইত। এবং অদ্যাপি য়িহুদি ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে এ বিশ্বাস দেখা যায়। রোমান কাথলিক পুরোহিতেরা ভূত ঝাড়াইয়া পাগল আরাম করে। ডাকিনী বা অন্য কোন ভূতে দেহের রক্ত অলক্ষিতভাবে শোষণ করিলে লোক দুর্ব্বল হইয়া মরিয়া যায়, এ বিশ্বাস পলিনেসিয়া, ব্রহ্মদেশ, মলয় উপদ্বীপ স্লাভোনিয়া, হঙ্গারি, পোলাণ্ড, রুসিয়া, ইংলাণ্ড প্রভৃতি নানা দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেখা গিয়াছে।

কেবল পীড়া নহে, স্বাভাবিক নানা ঘটনা প্রেতগণে সাধন করিয়া থাকে। বিক্রমাদিত্য বেতালের সাহায্যে অনেক অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। রোমসম্রাট অগষ্টস সিজরের এইরূপ একটী বেতাল ছিল। শ্যামদেশে মদের ভূতে লোককে মাতাল করে। পাইথাগোরাস বলিতেন, ঘণ্টা বাজিলে যে শব্দ হয়, তাহা ভূতের স্বর। ভূতের সাহায্যে মানুষে দৈববাণী করিতে পারে এবং চোর ধরিয়া দিতে পারে। ইরিকোয়া জাতির মতে মন্দমতি প্রেতগণ চন্দ্রসূর্য্যের জ্যোতি রোধ করিলে গ্রহণ হয়। ভূতের হস্ত হইতে উহাদিগকে রক্ষা করি-

বার জন্য সকলে মিলিয়া চীৎকার করে, বন্দুক ছুঁড়ে, ও অন্যান্য প্রকারে ভয় দেখায়। কারিব, কিয়াটকাবাসী চীন, কাম্বোডিয়াবাসী ষ্টিন, এবং পূর্ব্ব আফ্রিকাবাসি বঙ্গুবানাজাতিরও এই বিশ্বাস। গায়কুরু জাতির মতে ভূতেরা ঝড় উৎপাদন করে। এজন্য ঝড় উঠিলে গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধ গৃহের বাহিরে আসিয়া চীৎকার করিয়া ভূতদিগকে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করে। ডানাকিল জাতি ঘূর্ণ বায়ু দেখিলে দশ বার জনে লাঠী লইয়া বায়ুর উপর আঘাত করিতে করিতে দৌড়িতে থাকে। আঘাত-ভয়ে বায়ু-আরোহী প্রেতগণ বায়ু ছাড়িয়া পলাইলে ঘূর্ণ বায়ু নিরস্ত হয়। বন মধ্যে কোন শব্দ শুনিলে বা :কিছু দেখিতে পাইলে কিরাতজাতি যদি তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারে, তবে সে সকল প্রেতকৃত বলিয়া মনে করে। সমস্ত দিন রৌদ্রে তাপিত হইয়া রাত্রিতে সহসা শীতলতা অনুভব করিলে পদার্থবিশেষ শব্দ করিয়া ফাটিয়া যাইতে পারে, ইহা জানা না থাকাতে উহা প্রেতকার্য্য বলিয়া অসভ্যের মনে স্বতঃই উদয় হয়। কিরাতজাতির এই বিশ্বাস। লিভিঙ্গ্‌ষ্টোন সাহেব ইহা আফ্রিকার অন্তর্ভাগে ও নিগ্রোদের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আরকানিয়ানেরা বলে যখন তাহাদিগের পিতৃগণ শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করে, তাহাদিগের আঘাতে ঝড় উঠে। শিকারে সফলতা ব্যাধদিগের মাতৃপিতৃসাহায্যে এবং যুদ্ধে জয় লাভ গ্রীকদিগের মতে প্রেতসাহায্যে সাধিত হইত। অস্ট্রেলিয়ানেরা বলে, প্রেতগণ গিরি মধ্যে উত্তাপের জন্য অগ্নি জ্বালিলে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়। কামস্কাট্‌কার লোকদিগেরও এই বিশ্বাস। নিকারাগোয়ার অধিবাসীরা ধূমায়মান পর্ব্বতের নিকট নরবলি দিয়া পর্ব্বত-গহ্বরে দেহটী নিক্ষেপ করে। পশ্চিম আফ্রিকার ভিয়াইদেশে মাফা নামে একটী স্রোতস্বতী আছে। এই নদীর মধ্যে একটি পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। সেই স্থান দিয়া যাইবার সময় নৌকারোহীরা একটু মদ, এক মুঠা চাউল ও কয়েকটী তামাকের পাতা পর্ব্বতের দেবতাকে উপহার দেয়। পশ্চিম আমেরিকাতেও এইরূপ একটী পর্ব্বতকে লোকেরা দেবতা বলিয়া পূজা করে। গ্রীকদিগের দৈত্যদ্বয় স্কিলা ও কারিবডিসের কথা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। বস্তুতঃ কি মেঘসঞ্চার, কি শিলাবৃষ্টি, কি দাব-দাহ, কি আগ্নেয় গিরির ভস্মোদ্গার, কি ভূমিকম্প, কি জোয়ার ভাঁটা, অসভ্যদিগের মতে নৈসর্গিক অনৈসর্গিক সকল ঘটনাই প্রেতসাধ্য ও প্রেতসিদ্ধ।

সাধারণতঃ প্রেতগণ আশঙ্কার কারণ। দুর্ব্বল মনুষ্যের উপর প্রভুত্বপ্রিয়

রাজার মত অত্যাচার করিয়াই তাহাদিগের সুখ ও আনন্দ। পিতৃপুরুষগণ হিত-কারী প্রেত, তাঁহারা নানা প্রকারে বংশাবলীর উপকার সাধন করিয়া থাকেন। শত্রুর প্রেত শত্রুতা করে, মিত্রের প্রেত মিত্রতা করে। রাজার প্রেত মৃত্যু পরেও প্রজা রক্ষা করিয়া থাকে। প্রেত-শত্রুর সহিত বিবাদ করিয়া পারা যায় না, তোষামোদ করিয়া সন্তুষ্ট করিতে হয় এবং মিত্র প্রেতগণেরও মনোরঞ্জন না করিলে তাহারাও ক্ষতি করিতে পারে। এজন্য কি শত্রুপ্রেত কি মিত্র-প্রেত, প্রেতপূজাই অসভ্যদিগের বিপদ নিরাকরণের একমাত্র উপায়। জুয়াঙ্গ, আণ্ডামান প্রভৃতি কয়েকটী ঘন ঘন স্থানপরিবর্ত্তনকারী বন্য জাতি ভিন্ন অসভ্য জাতি মাত্রেরই মধ্যে প্রেতপূজা দেখা যায়। যাহারা পূর্ব্বতন পিতৃগণকে স্মরণ রাখিতে পারে নাই, তাহারা পিতৃপিতামহকে পূজা করিয়াই সন্তুষ্ট হয়,—অপেক্ষাকৃত সভ্য সমাজে প্রাচীনতর পুরুষদিগের পূজা করিতে দেখা যায়। বস্তুতঃ প্রেত বা পিতৃপূজা হইতে ক্রমে দেবপূজার আরম্ভ হইয়াছে। পিতৃগণ কালক্রমে দেব পদবীতে উন্নত হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় দেবাসুরে প্রভেদ ছিল না—উভয়েই সমানভাবে পূজিত হইত—ক্রমে শ্রেণী ও মর্য্যাদা বিভিন্ন হই-য়াছে।

অস্ত্রেলিয়ার লোকেরা বলে, মৃতদেহ কবর দেওয়া না হইলে, প্রেতাত্মা মনুষ্যদিগকে হিংসা করিয়া থাকে। নবজিলাণ্ডের লোকেরা বলে, মৃত্যু পরে আত্মীয় স্বজনেরও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়। আগে যাহারা কতই স্নেহ করিত, মৃত্যু পরে তাহারাই আপন কুটুম্বদিগকে উৎপীড়ন করিয়া থাকে। কারিবেরা বলে, কতকগুলি প্রেতাত্মা নদী-তটে বাস করে, ইহারা নৌকা ডুবাইয়া দেয়; অপরেরা বনমধ্যে বাস করিয়া মনুষ্যদিগকে বিপদে ফেলে। মধ্যআফ্রিকার প্রেতগণ মানবের ক্ষতিকারী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। পাটাগোনিয়ানদিগের মতে ওঝা মরিয়া দৈত্য হয়। উত্তর আসিয়ার শ্রমণেরা মৃত্যু পরে অধিক ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। চীনদেশীয়দিগের বিশ্বাস ভিখারী ও ব্যাধিগ্রস্তদিগের আত্মা জীবিতদিগকে বড় কষ্ট দেয়। আমাদের দেশে অবিবাহিত পুরুষ মরিয়া ব্রহ্ম-দৈত্য এবং মুসলমান মরিয়া মাহমুদ হয় এবং স্ত্রীলোকের আত্মা পেতিনী বা সাঁকচূর্ণীরূপ ধারণ করে। ইহাদিগের হাতে পড়িলে সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। তিনবল্লি প্রদেশে একজন সাহেবের প্রেত সন্তুষ্ট করিবার জন্য অদ্যাপি লোকেরা তাঁহার কবর-পার্শ্বে মদ্য ও চুরট রাখিয়া আইসে। হটেণ্টাটেরা শুভ-ঙ্কর দেবতা কি প্রকার বুঝিতে পারে না। বেকুয়ান, মধ্য আফ্রিকার বঙ্গো,

দক্ষিণ আমেরিকার আবিপোন ও ব্রাজিলবাসী কোরোডাজাতির মতে সকল ভূতই মনুষ্যের শত্রু। বার্জীনিয়া ও ফ্লুরিডাদেশে এবং রেডস্কিন ও কোন কোন তাতারজাতির মধ্যে কেবল দুষ্টবুদ্ধি প্রেতের পূজা হয়। ইহারা শুভাকাঙ্ক্ষী প্রেতগণকে পূজা করা আবশ্যক মনে করে না। আফ্রিকার পশ্চিম তটবাসী নিগ্রোরা বলে দেবতাগণ কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্মতি। মানুষকে যাতনা দিতে পারিলেই সুখবোধ করে। পূর্ব্বতটবাসী নিগ্রোদিগের নিকট বর্টন সাহেব ঈশ্বরের কথা উল্লেখ করিলে, তাহারা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় তাহার দেখা পাইব? দেখা পাইলে তাহাকে বধ করিয়া আপদের শান্তি করি। সেই আমাদের সকল অমঙ্গলের কারণ। আরাবজাতীয় একটী স্ত্রীলোক দাঁতের যাতনায় এইরূপে প্রার্থনা করিয়াছিল—"আল্লা আমার মত তোরও যেন দাঁতে যাতনা হয়। আমার মত তোরও দাঁতের মাড়ি যেন ঘায়ে পচিয়া যায়।"

সাধারণতঃ আত্মীয়স্বজনের প্রেত কুটুম্বদিগের হিতৈষী বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে। ব্রাজিলবাসী কামাকানজাতি হইতে উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান জাতি পর্য্যন্ত নূতন মহাদ্বীপের নানা স্থানে শিকারে সফলতা ও সুবৃষ্টির জন্য পিতৃ পিতামহের প্রেতাত্মার নিকট প্রার্থনা করিতে দেখা যায়। লুসিয়ানা দেশে নাচেজ জাতি মৃতদিগের উদ্দেশে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। তাস্মেনিয়ানদিগের কেহ পীড়িত হইলে চিতারূঢ় মৃতদেহের নিকট পীড়িতদিগকে রাখিয়া দেয়। রোগীর দেহাবিভূর্ত প্রেতাত্মা চিতারূঢ় ব্যক্তির প্রেতাত্মা কর্তৃক নিষ্কাশিত হইলে, রোগী রোগ মুক্ত হয়। প্রেত ভিন্ন প্রেতের চিকিৎসা আর কে করিতে পারে? টানাদেশে পিতৃপুরুষ ও মৃত সর্দ্দারদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করা হয়। পলিনেশিয়ানদিগেরও এই রীতি। টঙ্গা ও নবজিলাণ্ড দ্বীপে এবং মেয়োরি জাতির মধ্যে দেব-সংখ্যার মধ্যে সর্দ্দার ও বীরপুরুষের আত্মা ভিন্ন শ্রেণীর দেবতা বলিয়া গণ্য হয়। বিপদে শান্তি ও জীবনে সৌভাগ্যের জন্য মলক্কসবাসীরা পিতৃপুরুষের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে পিতৃগণ, ঋষিগণ ও পূর্ব্বতন রাজন্যগণকে পিণ্ড দিবার প্রথা সকলেই অবগত আছেন।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥

এই পিণ্ড জন্যই সন্তান এত প্রার্থনীয়। পিণ্ড দিবার কেহ না থাকিলে

পিতৃগণের কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না। মাদাগাস্কার দ্বীপে পূর্ব্বতন জাতিদিগের প্রেতাত্মার পূজা করা হয়। জুলুদিগের বিশ্বাস পিতৃপুরুষ অনুগ্রহ করিলে যুদ্ধে জয়লাভ হয়। তাঁহার বিরাগেই পরাজয় ঘটে, তাঁহারই নিগ্রহই পীড়া ও মৃত্যুর কারণ। তাঁহার প্রসাদে স্বাস্থ্য, শস্য, সম্পত্তি, অভীপ্সিত মাত্রই লাভ করা যায়। প্রত্যেক গৃহে স্বতন্ত্র দেবতা, প্রাচীন দেবতা উঙ্কুলুঙ্কুলু বা আদিম মনুষ্যের এবং তাঁহার বংশধরগণের বহুকাল হইল মৃত্যু হইয়াছে। এজন্য সকলে আপনাপন পিতৃপিতামহের পূজা করে। দক্ষিণ গিনির লোকেরা বৃদ্ধদিগকে যেমন ভক্তি করে, বৃদ্ধ মরিয়া উচ্চতর পদ প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে খাদ্য পানীয় এবং ব্যবসায়ে লাভের অংশ দিয়া তেমনি পূজা করিয়া থাকে। পিতৃপুরুষের আরাধনা পর্ব্বতপৃষ্ঠে বা জঙ্গল প্রান্তরে সমাপিত হয়। দুঃখে বিপদে সিংহলের ব্যাধগণ প্রেতদিগের আশ্রয় লয়; তাহারাই স্বপ্ন ও পীড়িতাবস্থায় দেখা দেয়, তাহারাই শিকারে পশু আনিয়া দেয়। মোগলেরা জঙ্গিস খাঁ ও তাঁহার বংশধরদিগের পূজা করে। জাপানদেশীয় কামিপন্থী বা শিণ্টু ধর্ম্মাবলম্বীরা পিতৃগণকে মুখ্যদেবতা বলিয়া বিবেচনা করে। শ্যামদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা জাতীয় প্রধানদিগের প্রেতাত্মার পূজা করে, ইহারা উচ্চশ্রেণীর দেবতাদিগকে পূজা করিতে কুণ্ঠিত হয়, পাছে কোন ভুল করিয়া ফেলে। জীবনে মরণে পিতৃপূজাই চীনবাসিদিগের প্রধান ধর্ম্ম। যাহাকে ইহারা কার্ত্তিকেয়, বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতি নামে পূজা করে, ইহারা বলে পূর্ব্বে তাহারা পৃথিবীতে যুদ্ধ, শিল্প, প্রভৃতি কার্য্যে নিপুণতা দেখাইয়াছিল। সেই জন্য তাহাদিগের সাহায্য পাইলে লোকে অভিপ্রেত কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করে। চীন সম্রাট বৎসরে দুইবার কঙফুছের মন্দিরে যাইয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহার নিকট বলি প্রদান করেন। য়ুরোপেও পূর্ব্বতন পিতৃপূজার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। রোমানেরা পিতৃপূজা করিত। ইহারা পিতৃগণের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া গৃহমধ্যে রাখিত, তাহাকে ভোগ ও নৈবেদ্য দিয়া পূজা করিত—এবং তাহারই নিকট "আয়ুর্দেহি যশোদেহি" বলিয়া ভিক্ষা করিত। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রোট সাহেব বলেন, গ্রীক দেবতাগণের অনেকগুলি পূর্ব্বে মনুষ্যরূপে গ্রীসদেশে বাস করিত। পিতৃপূজা গ্রীসদেশেরও প্রাচীন ধর্ম্ম। বস্তুতঃ মোক্ষমূলর পিতৃপূজা কেবল অনার্য্যদিগের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ভাল করেন নাই। আর্য্য-অনার্য্য-নির্ব্বিশেষে সভ্যতার সোপান বিশেষে সকল জাতিই আপন আপন পিতৃপুরুষের পূজা করিয়া আসিয়াছে। রোমান কাথলিক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা সেণ্ট নাম দিয়া

অদ্যাপি পিতৃগণের পূজা করিতেছে—আমাদিগের গৌতম বুদ্ধ সেণ্টযুসেফৎ নামে ইহাদিগের উপাস্য দেবতা। হিন্দু ও মুসলমান রমণীগণ সা ফরিদ বা সত্যপীরের নিকট সন্তানগণের মঙ্গল কামনায় যেমন প্রার্থনা করে, রোমান রমণীগণ রমুলসের মন্দিরে সন্তানক্রোড়ে সেইরূপ প্রার্থনা করিত। মিসর-দেশেও পিতৃপূজা প্রচলিত ছিল। নবকালিডোনিয়া, ফিজি, টানা, টাহিটী, সামোয়া, মাদাগাস্কার ও সাণ্ডুইচদ্বীপে এবং আঙ্গোলা, কঙ্গো, নিকারাগোয়া, পেরু ও মেক্সিকো দেশে, বণিকা, বালোণ্ডা, ভীল, খন্দ সাঁওতাল, কিরাত, কারগিজ, অষ্টিয়াক, তুর্কমান, এস্কিমো, আমাজুলু, পাটাগোনিয়ান প্রভৃতি নানা জাতির মধ্যে পিতৃপূজা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা জীবিতাবস্থায় মনুষ্য ছিল—মৃত্যু হইলেই তাহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। যতদিন মনুষ্য বলিয়া বংশ-ধরেরা স্মরণ রাখিতে পারে, ততদিন তাহাদিগকে পিতৃপুরুষ নামে অভিহিত করা হয়—যখন স্মৃতি বিকৃত হইয়া পড়ে, এক জাতির পরিবর্ত্তে অন্য জাতি দেশ অধিকার করে, বিভিন্ন জাতির সহযোগে সঙ্কর বর্ণের উদয় হয়—তখন গ্রাম্য বা পারিবারিক দেবতা—দেশীয় বা জাতীয় দেবতা নামে দেবত্ব অধিকার করে। পিতৃপুরুষ বা মাননীয় প্রেতাত্মা ভিন্ন যে অন্য কোনরূপ দেবজাতির উদ্ভব হয় নাই, আমরা এ কথা বলিতেছি না। পল্লবান্তরে অন্যপ্রকার দেব কল্পনার আকর নির্ণয় করা যাইবে। এক্ষণে ইহাই নিশ্চয় করা গেল যে, প্রেতপূজা মানবজাতির সাধারণ এবং প্রথম ধর্ম্ম। প্রেত-পূজা হইতে দেব-পূজার উদ্ভব এবং দেবজাতির মধ্যে মনুষ্য আত্মার সংখ্যা অনেক।

মনুষ্য পৃথিবীর প্রধান জীব এবং মনুষ্যই মনুষ্যের আদর্শ। সুতরাং মনুষ্যের দেবতা মানবীয় প্রকৃতি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। দেবতাও সেইজন্য মনুষ্যের ন্যায় পান ভোজন শয়ন ও উপবেশন করে—মনুষ্যের মত লোভ-ক্রোধ-হিংসা-দয়া-পরিপূর্ণ; মনুষ্যের ন্যায় ক্ষত, পীড়া ও মৃত্যুর অধীন। আমরা এতৎসম্বন্ধে নানা উদাহরণ নানা প্রকারে দেখাইয়াছি। অধুনা আর কয়েকটী উদাহরণ দেখাইয়া এই পল্লবের শেষ করা যাইবে।

টাহিটী দ্বীপে সর্দ্দারকে যেমন সম্মান দেখাইতে হয়, দেবতাকে তেমনি সম্মান দেখাইতে হয়। টঙ্গাদ্বীপে সর্দ্দারকে সম্মান না করিলে দেবতারা অভি-সম্পাৎ করেন। পেরুদেশে সামান্য অপরাধে ফাঁশী হইত, কারণ ফাঁশী অপ-রাধের দণ্ড নয়, কিন্তু দেবতার আজ্ঞালঙ্ঘনের দণ্ড বলিয়া গণ্য হইত। মলয়-পলিনেশিয়ান জাতির মধ্যে গাছের প্রথম ফল ও পুষ্করিণীর প্রথম মৎস্য যেমন

সর্দ্দারকে তেমনি দেবতাকে দিতে হইত। ফিজিবাসীরা সর্দ্দারকে আহার্য্য ও তিমি মৎস্যের দন্ত উপহার দেয়, দেবতাকেও তাহাই দিয়া থাকে। টঙ্গাদ্বীপে সর্দ্দারেরা দেবতার নাম লইয়া শপথ করে, সাধারণ লোকে শপথ করিবার সময় সর্দ্দারের নাম গ্রহণ করে। ফিজিদ্বীপে দেবমন্দিরের দ্বার লম্ফ দিয়া উলঙ্ঘন করিতে হয়, সর্দ্দারের দ্বারও সেইরূপে পার হইতে হয়। শ্যামদেশে পঞ্চম মাসের পূর্ণিমায় পুরোহিতেরা দেবতার অভিষেক করে, সেইদিন অন্য লোকে পুরোহিত ও সর্দ্দারদিগকে অভিষেক করাইয়া থাকে, এবং সন্তানেরা আপনাপন পিতা মাতার স্নান করাইয়া দেয়। চীনদেশে সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় সম্রাটেরা আপনাপন পিতা মাতার কবর পার্শ্বে তিনবার জানু পাতিয়া নয়বার প্রণাম করেন। পূর্ব্বতন সম্রাটের বৃদ্ধ মহিষীর নিকটেও এইরূপ করিতে হয়। তখন দেশীয় অন্যান্য সম্ভ্রান্তেরা সম্রাটের নিকট সেইরূপ করিয়া নয়বার করিয়া নমস্কার করিয়া থাকে। জাপান দেশেও এইরূপ। রাজা দেবতাকে নমস্কার করেন, সম্ভ্রান্তেরা রাজাকে নমস্কার করেন, সাধারণ লোকে সম্ভ্রান্তদিগকে নমস্কার করিয়া থাকে।

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শত্রুর দেহাবশিষ্ট সর্দ্দারকে উপহার দিবার কথা স্থানান্তরে উল্লেখ করা গিয়াছে। খন্দজাতি যুদ্ধে শত্রুর হস্তচ্ছেদ করিয়া উহার রক্তে পশ্চাৎবর্ত্তী পুরোহিতকে অভিষিক্ত করে। পুরোহিত সেই হস্ত লইয়া কবরগত লাহাপেন্ন্ দেবতাকে উপহার দেয়। টাহিটী দ্বীপে শত্রুর মস্তক লইয়া ওরোদেবতার মন্দির নির্ম্মাণ হয়। য়িহুদাজাতির মধ্যে এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল। গ্রীকেরা যুদ্ধলব্ধ অস্ত্র শস্ত্র দেবতাকে উৎসর্গ করিত এবং রোমানেরা নগরপতি জুপিটর দেবের মন্দিরে সেই সকল রাখিয়া দিত। ফিজিয়ানেরা শত্রুর পতাকা কাড়িয়া লইয়া দেব মন্দিরের চূড়ায় উড়াইত। ওলোন্দাজেরা ফরাসীদিগকে কোর্টরয় নগরে পরাস্ত করিয়া ফরাসী পতাকা সকল আপনাদিগের উপাসনা মন্দিরে রাখিয়া দিয়াছিল। ইংরাজ ও ফরাসীরাও এইরূপ করিয়া থাকে। আসান্টি দেশে ও দক্ষিণ আমেরিকায় শত্রুকে হত করিয়া বিজয়চিহ্ন স্বরূপ তাহার দাঁতের মালা পরিবার প্রথা আছে। কোন কোন দেশে গোলামদিগের দুই তিনটী দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং দাঁত ভাঙ্গিয়া সর্দ্দারকে উপহার দেওয়া কালক্রমে অধীনতা শিকারের চিহ্নস্বরূপ পরিগণিত হইয়া পড়ে। সাণ্ডুইচ দ্বীপে সর্দ্দার মরিলে কাণ কাটিয়া বা দাঁত ভাঙ্গিয়া উপহার দিতে হয়। ইহারা দেবতার নিকটেও ঐরূপ উপহার দিয়া

থাকে। নবদক্ষিণ ওয়েল্‌স দেশেও এই রীতি প্রচলিত আছে। আমাদিগের কর্ণবেধের ন্যায় অষ্ট্রেলিয়া দেশে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সকলকেই কয়েকটী দাঁত উঠাইয়া ফেলিতে হয়। ফিজিদ্বীপে ও পূর্ব্বকালে ইংলণ্ডে আমাদের দেশের মত মস্তকমুণ্ডনের প্রথা ছিল। রাজদরবারেও মস্তক মুণ্ডিত করিয়া দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়, দেবদরবারেও সেইরূপ। আমাদের দেশে বিধবার মস্তক-মুণ্ডন ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবস্থা। গ্রীস, রোম, আরব ও পেরুদেশে এবং য়িহুদা জাতির মধ্যে মস্তক মুড়াইবার প্রথা ধর্ম্মানুমোদিত ছিল। দেহের রক্ত দিয়া রাজা ও দেবতার মনস্তুষ্টি করা য়িহুদি, গ্রীক, হুন, তুর্কি ও হিন্দুজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। মনোমত দ্রব্য উপহার দিয়া রাজাকে যেমন সন্তুষ্ট করিতে হয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র দেবতাদিগকেও সেইরূপ সন্তুষ্ট করিবার রীতি। মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করিয়া প্রবল প্রতিবেশীকে যেমন সন্তুষ্ট করিতে হয়, সকল দেশে দেব-দর্শন করিয়া দেবতার প্রীতিভাজন হইতে হয়। যে দেশে যেরূপ অঙ্গসঞ্চালন করিয়া গুরুজনের মর্য্যাদা করা হয়, সে দেশে সেইরূপে দেবতাকে মর্য্যাদা করিবার রীতি। সম্ভ্রান্তের নিকট যে বেশে যাইতে হয়, গুরুজনকে যে বাক্যে সম্বোধন করিতে হয়, দেবতাদিগের সহিতও সেইরূপ বেশে সাক্ষাৎ করিতে হয়, এবং সেইরূপ ভাষায় সম্বোধন করিতে হয়। রাজাদিগের যেমন ছত্রচামর বেশ-ভূষা, দেবতাদিগেরও সেইরূপ। রাজাদিগের যেমন বন্দী, প্রহরী, পারিষদ, নর্ত্তকী ও চাটুকারের প্রয়োজন, দেবতাদিগেরও সেইরূপ। রাজাদিগের ন্যায় দেবতাদিগকে তোষামোদ করিয়া দীনবাক্যে সন্তুষ্ট করিতে হয়। বস্তুতঃ দেবতা ও মনুষ্যে এত অল্প প্রভেদ যে, নানা দেশে কেবল বর্ণের বিভিন্নতা বা বল ও কৌশলের বিভিন্নতা দেখিয়া বিদেশীয় পরিব্রাজকদিগকে অসভ্যেরা দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়াছে।

মনুষ্যের ন্যায় অন্যান্য পদার্থেরও আত্মা আছে। তাহারাও মনুষ্যের ন্যায় মৃত্যুপরে বাঁচিয়া থাকে। মনুষ্যের প্রেতাত্মার ন্যায় অন্যান্য জীব জন্তু বা অচেতন পদার্থের প্রেতাত্মার অনুগ্রহে মনুষ্যের মঙ্গল এবং নিগ্রহে অমঙ্গল ঘটিতে পারে। সুতরাং মনুষ্যের প্রেতাত্মার ন্যায় জীবজন্তু চেতন অচেতন সকল পদার্থেরই আত্মা মনুষ্যের উপাসনীয়। আবার যে সকল পদার্থের আপন আত্মা না থাকিতে পারে, তাহারাও অন্য প্রকার প্রেতাত্মার অধিবসিত বা আশ্রিত হইতে পারে। অসভ্যেরা বৃক্ষবাসী আত্মা এবং বৃক্ষ আত্মার স্বতন্ত্রতা নিরাকরণ করিতে পারে না—পারিলেও আত্মামাত্রই তাহাদিগের উপাসনীয়

হওয়াতে বা আত্মার আশ্রিত পদার্থের অমর্য্যাদায় আশ্রয়কারীর বিরক্তি জন্মিবার ভয় থাকাতে পৃথিবীর নানা প্রকার চেতন অচেতন পদার্থ মনুষ্যপূজিত দেবতার শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে। অধিকন্তু ভয়কে তোষামোদের একটী প্রধান কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে, দেবাধিষ্ঠিত বা দেবাশ্রিত হউক বা না হউক সর্প বা ব্যাঘ্রকে প্রভু বা দেবতা বলিয়া নিরাশ্রয় অসভ্যেরা যে পূজা করিবে, কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে কারণ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকুক, অসভ্যাবস্থায় মনুষ্যসমাজে জীবপূজা, বৃক্ষপূজা, নদীপর্ব্বতপ্রস্তর পূজার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত প্রবল; সুসভ্য সমাজেও সে প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত প্রবল; সুসভ্য সমাজেও সে প্রাদুর্ভাব একেবারে লোপ হয় নাই। এবং জীব ও পদার্থ পূজাও যে প্রেতপূজার অন্য রূপ মাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্পেন্‌সর অনুমান করেন, কবরপার্শ্বে কতকগুলি জীবের বাসস্থান বলিয়া তাহারা মৃতব্যক্তির আত্মাস্বরূপে পূজিত হয়; এবং স্পেন্‌সর ও লবকের মতে বৃক্ষের ও জীবের নাম হইতে পূর্ব্বপুরুষগণের নামকরণ হইত বলিয়া তত্তৎনামধারী জীবগণ এখন পূর্ব্বপুরুষ, পূর্ব্বপুরুষের আত্মা বা দেবতা নামে পূজিত হয়।

অন্যান্য জীবপূজা অপেক্ষা নাগপূজার প্রাদুর্ভাব অধিক। গিনি, আবিসিনিয়া, দক্ষিণমিসর, পারস্য, কাশ্মীর, ভারতবর্ষ, তিব্বত, তাতার, চীন কাম্বোডিয়া ও সিংহলদেশে, সাইবিরিয়া হইতে বেনিজুয়েলা পর্য্যন্ত, মাদাগাস্কার, ফিজি ও মিত্রদ্বীপপুঞ্জে; দক্ষিণ আফ্রিকার কাফির জাতি, দক্ষিণ-মিসরের সিলুক জাতি, আমেরিকার আজটেক, পেরুভিয়ান, নাচেজ, কারিব, মনিটারি, মাণ্ডান, পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি নানাজাতি সর্পের পূজা করে। পেরু হইতে পারাগোয়ে যাইবার পথে আলভারেজ সাহেব একটী প্রকাণ্ড সর্পের মন্দির দেখিয়াছিলেন। লোকেরা নরমাংস খাওয়াইয়া সেই রাক্ষসের মনস্তুষ্টি সাধন করিত। উহা দৈর্ঘ্যে আঠার হস্ত, ব্যাসে একটী বৃষের মত। সাহেবের অনুচরগণ উহাকে গুলি করাতে সে লাঙ্গুল আঘাতে সমুদয় মন্দির কাঁপাইয়া দিয়াছিল। পূর্ব্বকালে মিসর, পারস্য, ভারতবর্ষ, ফিনিসিয়া, বাবিলন, গ্রীস, ইতালী, প্রসিয়া ও লিথুনিয়া দেশে সর্পপূজা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধগণ যে সর্পপূজা করিত, সাঞ্চি ভগ্নাবশেষে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমেরিকার রেডস্কিন্ জাতি ভল্লুক, শশক ব্যাঘ্র, কয়েক জাতীয় পক্ষী ও মহিষের পূজা করে। লাপলাটা দেশে ও ব্রাজিলের কোন কোন অংশে জাগুয়ারের পূজা হয়। দক্ষিণ-আমেরিকার সর্ব্বত্র পক্ষী ও জাগুয়ারের পূজা

বিশেষ প্রচলিত। এখানে ভেক, ঈগল ও ছাগচুসের পূজা হইয়া থাকে। মেক্সিকোদেশে পেচককে এবং আবিপোন জাতি হংসকে পূজা করে। পেরু-দেশে শৃগাল, কুকুর, ঈগল, কণ্ডর, লেমা, পিউমা, সর্প ও নানাজাতীয় মৎস্যকে দেবরূপে পূজা করা হয়। টাহিটী দ্বীপে শামুক খোল প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষী ও মৎস্যের পূজা হয়। সাণ্ডুইচ দ্বীপে বায়স ও নবজিলাণ্ডে এক প্রকার পক্ষী, টঙ্গাদ্বীপে গিরগিটী, শজারু ও এক প্রকার জলবাসী সর্প, কিংস্মিল দ্বীপে কয়েক প্রকার মৎস্য দেবতা বলিয়া অনুমিত হয়। মেওরিজাতি ঊর্ণনাভ ও গিরগিটীকে এবং ফিজি দ্বীপে সর্প, পক্ষী, মৎস্য, বৃক্ষ ও কোন কোন মনুষ্যকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। লাকেম্বা দ্বীপে বাজপক্ষী, হাঙ্গর, বাণমৎস্য ও কুক্কুটের পূজা হয়। সাইবিরিয়াবাসী সামোয়িদ জাতি ও অষ্টিয়াকেরা ভল্লুকের পূজা করে।

যাকুটু জাতি হংস বায়স প্রভৃতি নানা প্রকার পক্ষী ও কয়েক প্রকার বৃক্ষের পূজা করে। আমাদের দেশে বৃষ, গাভী, মহিষ, বানর, ব্যাঘ্র, হস্তী, অশ্ব, হরিণ, মেষ, শূকর, কুকুর, বিড়াল, ইন্দুর, গরুড়, ময়ুর, হংস, কুক্কুট, বহুরূপী, গিরগিটী, কচ্ছপ, কুম্ভীর, হাঙ্গর, কয়েক প্রকার মৎস্য এবং কীট পতঙ্গাদিরও পূজা হইয়া থাকে। সিংহলে বৃষ ও নীলগিরিবাসী টোডাজাতির মধ্যে মহিষের পূজা হয়। ব্রুনানবাসী শানজাতি সর্প ও অশ্বের পূজা করে। সিংহলে হংস ও ফিলিপাইন দ্বীপে কুম্ভীরের পূজা হয়। প্রাচীনকালে মিসর দেশে বৃষ, গাভী, হরিণ, বিড়াল, বাজ ও নানাজাতীয় পশু পক্ষীর পূজা হইত। এখনও মিসরবাসী কোন কোন জাতি বৃষ ও কুক্কুটের পূজা করে। গিনি উপকূলে কয়েক জাতীয় পক্ষী ও মৎস্য, এবং কুম্ভীর ও ঊর্ণনাভের পূজা হয়। বেনিন্‌-নিগ্রোজাতি কয়েক প্রকার পক্ষীর পূজা করে। দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী মালে-কুটু ও বাপারি জাতির মধ্যে শজারু ও বানর এবং মাদাগাস্কার দ্বীপে কুম্ভীর দেবতা মধ্যে গণ্য হয়। প্রাচীন ফিনিসীয় জাতি বৃষের পূজা করিত। প্রাচীন গ্রীক জাতির দেবগণ কখন কখন অশ্ব ও নানা প্রকার পক্ষীরূপ ধারণ করিত। আমরা স্থানান্তরে দেখাইয়াছি উদরজ্বালা নিবারণ জন্য পশু পক্ষী বধ করিবার সময় নানা জাতীয় লোকে তত্তৎজীবের আত্মার আরাধনা করিয়া ক্রোধের শান্তি করে। এখানে সে সকলের পুনরুক্তি করিবার আবশ্যক নাই।

বিভিন্ন জাতীয় লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন জন্তুকে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বরূপে গণ্য করে। যে জীব যাহার দেবতা সে জীবের নাম তাহার সন্তক হয়। উহারই

নামানুসারে তাহাদের সন্তানগণের নামকরণ হইয়া থাকে। এবং উহারা সেই জাতির পক্ষে অবধ্য ও উহার মাংস অস্পৃশ্য। গিনিবাসী ইসিনী জাতি কোন জন্তু, বৃক্ষ বা ফলের নামানুসারে সন্তানের নামকরণ করে। যে পদার্থ হইতে যাহার নামকরণ হয়, সে পদার্থ তাহার দেবতা। হটেন্‌টাট জাতি কোন শ্বাপদের নাম হইতে এবং কঙ্গোবাসিগণ মৎস্য ও পক্ষীর নামানুসারে নামকরণ করিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বেকুয়ানাজাতির মধ্যে নানা শ্রেণী আছে। কোন শ্রেণীর নাম কুম্ভীর, কোন শ্রেণীর নাম মৎস্য, কাহার বানর, মহিষ, হস্তী, সিংহ, শজারু বা দ্রাক্ষা উপাধি। অস্ট্রেলিয়া দেশেও এইরূপ। চীন দেশে ফুল জন্তু ইত্যাদির নামানুসারে প্রায়ই নামকরণ করিয়া থাকে। রেডস্কিন্ জাতি পশু, পক্ষী, কচ্ছপ প্রভৃতির নাম গ্রহণ করে। ইরিকোয়া, লেনাপী এবং দেলাবারবাসিদিগের মধ্যেও এই প্রথা। ওসাগিস জাতি বীবরকে এবং পেরুবাসী ইণ্ডিয়ানেরা নানাপ্রকার জন্তুকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ মনে করে। ভারতবর্ষীয় খন্দ জাতি ভল্লুক পেচক হরিণ প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। চুটিয়া নাগপুরের মুণ্ডা ও ওরাঁও জাতি জীবজন্তু উপাধিবিশিষ্ট নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। সামোয়ান ও য়াকুত জাতির মধ্যেও এই রীতি দেখা যায়। য়ুকেতন উপদ্বীপে শিশুসন্তানদিগকে নির্জ্জনে রাখিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে ভস্ম ছড়াইয়া দেয়—ভস্মোপরি যে জন্তুর পদচিহ্ন দেখা যায়, শিশুর পক্ষে সেই উপাস্য দেবতা বলিয়া স্থির করে। আলগণকিন ইণ্ডিয়ানদিগের কাহারও নাম ভল্লুক, কাহারও নাম হরিণ, ব্যাঘ্র, কচ্ছপ ইত্যাদি। রেড ইণ্ডিয়ানেরা রেটল সর্পকে পিতামহ বলে। মধ্য আসিয়ার লোকেরা নানা জাতীয় জীব জন্তুকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া স্বীকার করে। কোন কোন দায়াক জাতির মধ্যেও এই বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। পাটাগোনিয়ানদিগের বিভিন্ন বংশ ব্যাঘ্র, সিংহ, অষ্ট্রীচ প্রভৃতি বিভিন্ন জন্তু হইতে উৎপন্ন। কলম্বিয়ার লোকেরা আপনাদিগকে গন্ধমূষিকের বংশোদ্ভব বলে। কালিফর্ণিয়ার লোকদিগের পূর্ব্বপুরুষ নেকড়ে বাঘ। ইহারা বলে যে বসিয়া থাকাতে ঘর্ষণে তাহাদের লাঙ্গুল খসিয়া গিয়াছে। জাপোটেক জাতি সিংহের, হেডা জাতি বায়সের এবং বাঙ্কুবর দ্বীপবাসী আহট জাতি নানাবিধ পশুপক্ষী ও মৎস্যের সন্তান। চিপেবা জাতি কুকুরের সন্তান বলিয়া এক সময় কুকুর দ্বারা কোন কষ্টকর কার্য্য করাইত না। কোনিয়াগা জাতি কুকুর ও পাখীর সন্তান। আলুট জাতি বলে সকল মনুষ্য ...র,

হইতে উৎপন্ন। সাঁওতালদের পূর্ব্ব পুরুষ পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ী হংসডিম্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

কোণার্কের মন্দিরে আমরা মৎস্যনারী বা সর্পনারীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছি। উপরার্দ্ধ মনুষ্যের মত, নিম্নাংশ সর্প বা মৎস্যের মত। আমাদিগের নৃসিংহ অবতার মনুষ্য ও সিংহ মিলাইয়া গঠিত। গণেশের মুখ হস্তীর মত। পেরুদেশে প্রাচীন কালে গজানন পূজা প্রচলিত ছিল। নৃসিংহ ও মৎস্যনরমূর্ত্তি প্রাচীনকালে কাল্‌ডিয়া ও বাবিলনে পূজা হইত। ফিলিষ্টাইনদিগের ডাগন দেবতার মুখ ও হস্ত মনুষ্যের মত, নিম্নার্দ্ধ মৎস্যের মত ছিল। আসিরিয়াদেশীয় নিনদেবের মূর্ত্তি পক্ষসমাবিষ্ট বৃষের আকার। ফিনিসিয়া দেশীয় আষ্টারটী দেবী কিয়দংশ নারী ও কিয়দংশ গাভীর মত। মনুষ্য দেহে মেষের মস্তক যোগ করিয়া প্রাচীন মিসরবাসীগণ আমনদেবের, বাজপক্ষীর মস্তক বসাইয়া হোরস দেবের, সিংহমস্তক বসাইয়া মুথ এবং গাভীর মস্তক দিয়া হাথোর দেবীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত। স্ফিংস, টাইফন, থথ প্রভৃতি কত দেবদেবী যে এইরূপ অর্দ্ধজন্তু অর্দ্ধ মনুষ্যরূপে উহারা কল্পনা করিয়াছিল, সংখ্যা করা যায় না।

ফার্গুসন্ সাহেব অনুমান করেন, সর্প ও বৃক্ষপূজা মানবজাতির আদিম ধর্ম্ম। বস্তুতঃ সর্পপূজার ন্যায় বৃক্ষপূজাও পৃথিবীর নানাদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। পলিনেসিয়ার ও অষ্ট্রেলিয়ার লোকদিগের মত জাম্বেসি ও সায়ার নদীতটবাসীদিগের মধ্যে এবং পশ্চিম আফ্রিকার নিরক্ষবৃত্তপার্শ্ববর্ত্তী নিগ্রোগণও বৃক্ষপূজা করিয়া থাকে। আমেরিকা মহাদেশেও ইহার বহুল প্রচার। প্রাচীন কালে ফ্রান্স, রোম, ক্যানান, কার্থেজ,নুমিদিয়া, জার্ম্মাণি, ব্রিটন, লাপ্‌লাণ্ড, পোলাণ্ড, গ্রীস, আসিরিয়া, পারস্য, ইমান ও ভারতবর্ষে বৃক্ষপূজা প্রচলিত ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্কাই দ্বীপে সাধারণ লোকে একটী ওক বৃক্ষকে এমনি ভক্তি করিত যে, কেহ তাহার একটী পল্লব ভাঙ্গিতে সাহস পাইত না। অদ্যাপি লিবোনিয়া প্রদেশে ওক বৃক্ষের পূজা হইয়া থাকে। আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যভাগে, আবিসিনিয়া দেশে, মিসর দেশের দক্ষিণাংশে এবং সাহারা প্রদেশে এখনও বৃক্ষের পূজা হয়। আরবদেশীয় থোজা জাতি থর্জ্জুর বৃক্ষের এবং কোরেশ জাতি "জাত আরোয়াত" নামে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের পূজা করে। কঙ্গো ও গিনি নিগ্রোদের মধ্যেও এই প্রথা। কঙ্গোবাসী নিগ্রোগণ তৃষ্ণা পাইলে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারিবে, এই উদ্দেশে বৃক্ষতলে

এক্ক এক কলসী খেজুর রস রাখিয়া দেয়। বোর্ণিয়োর দায়াকেরা বৃক্ষের নিকটে একটী বাঁশের মাচা বাঁধিয়া তাহার উপর আহার ও পানীয় রাখিয়া আসে, এবং বৃক্ষদেবতার মাচার উপর উঠিবার জন্য একটী মৈ লাগাইয়া দেয়। গিনি দ্বীপে এবং আড্ডাকুডা নগরে এবং কাফ্রির জাতির মধ্যে বৃক্ষপূজা দেখা গিয়াছে। নানাদেশীয় বৌদ্ধগণ বটবৃক্ষের পূজা করে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রচলিত বৃক্ষপূজা বোধ হয় বৌদ্ধগণ আপনাদের মধ্যে প্রচলন করিয়াছিল। অনেক কার্য্যে বৌদ্ধদিগকে দেশীয় প্রাচীন রীতি অনুসরণ করিতে দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষে বট, বেল, তুলসি, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষগণ দেবতার মধ্যে গণ্য হয়। চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয়গণ বাঁশের পূজা করে। বীরভূম অঞ্চলে বৃক্ষপূজার বড় প্রাদুর্ভাব। খায়েন জাতি সুব্রি নামে এক প্রকার বৃক্ষের পূজা করে। সাইবিরিয়া দেশীয় য়াকুত ও অষ্টিয়াক জাতি বৃক্ষ-উপাসক। ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, টঙ্গা, সুমাত্রা ও ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জে বৃক্ষপূজা প্রচলিত আছে। আমাজুলু ও বাসুটদিগের মত ফিলিপাইনবাসিরা বলে মানবজাতির আদি পুরুষ শর বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। সুপিরিয়র হ্রদতটবাসী ইণ্ডিয়ান, মাণ্ডান, মণিটারি ও ক্রি জাতি এবং মেক্‌সিকো, নিকারাগোয়া, পেরু ও পাটাগোনিয়াবাসিগণ এবং আবেনাকি জাতি ও ফিজিবাসিরা বৃক্ষের পূজা করিয়া থাকে। উপাস্য বৃক্ষের শাখায় বস্ত্রখণ্ড, লৌহ প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য, ইত্যাদি কত কি ঝুলাইয়া দিয়া লোকেরা নানা দেশে মনোগত পূর্ণ করিয়া লয়! ঋগ্বেদ ও জেন্দা-আবেস্তা গ্রন্থে অন্যান্য দেবতার ন্যায় সোমলতার উপাসনা দৃষ্ট হয়—গ্রীক-নাটককার ইউরিপিডিসের গ্রন্থেও এইরূপ ভাব উল্লিখিত আছে। সোমরস মাদকবিশেষ। পেরুবাসীরা তামাক ও কোকো বৃক্ষের পূজা করে—চিবচা জাতির মধ্যেও কোকো পূজা লক্ষিত হয়। ফিলিপাইন ও উত্তর-মেক্‌সিকো দেশে বিষবৃক্ষের পূজা হয়। আসিরিয়গণ তাল বৃক্ষের পূজা করিত। বাসুট ও আমাজুলু জাতি এবং ফিলিপাইনবাসিদিগের মত দামারা জাতি ও কঙ্গোবাসিগণ বলে বৃক্ষ হইতে তাহাদিগের আদি পুরুষের জন্ম হইয়াছিল।,

বনে ভূতের বড় দৌরাত্ম্য। যাহারা সভ্য জাতির সমক্ষে বনদেবীরূপে প্রণয়ীগণের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে, তাহারাই অসভ্যদিগকে নানা প্রকার বিভীষিকা দেখায়। বৃক্ষবাসী প্রেতগণ বৃক্ষের আত্মা, বা মনুষ্যের প্রেতাত্মা বৃক্ষদেহ আশ্রয় করিয়া মনুষ্যের আরাধনা গ্রহণ করেন, কখন বা অভাগাদিগকে বিড়ম্বনা করিয়া সুখলাভ করেন নির্ণয় করিবার উপায় নাই। আমরা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি, অন্য জীব বা পদার্থের প্রাণপুরুষ মনুষ্য আপন দেহ-কল্পনায় কল্পিত করে। আর্য্যজাতীয় বনদেবীগণ সর্ব্বত্র মনুষ্য আকারসংযুক্ত। অসভ্যদিগের মধ্যেও এইরূপ। ইরোকোয়া জাতির শস্যাদিনিহিত দেবতাগণ সুন্দরী রমণীর মত। অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলী ভূতেরা গাছের ডালে বসিয়া শিশ দেয় কখন বা বনচারিদিগকে ধরিবার জন্য দুই হস্ত বিস্তার করিয়া ভ্রমণ করে। ব্রাজিল দেশের অটবী মধ্যে পঙ্গু প্রেতগণ দিবানিশি বিচরণ করে তাহারাই ব্যাধদিগকে বিপথগামী করিয়া দেয়। জঙ্গল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জ্বর হইলে, ব্রহ্মবাসী কিরাতগণ ফিরিয়া আসিবার সময় যে বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়াছিল তাহার মনস্তুষ্টি করিবার চেষ্টা করে। সেনিগাম্বিয়ার দীর্ঘকেশ বৃক্ষপ্রেতগণ সকল প্রকার পীড়ার কারণ। ফিনলাণ্ডের কান্তারে বনপ্রেতগণের ভীষণ-গর্জ্জনের প্রতিরব নিনাদিত হয়। অদ্যাপি ব্রিটনবাসী কৃষাণগণ বনভূমে বনপ্রেতের ভীষণমূর্ত্তিতে আতঙ্কিত হয়। কৃষ্ণপর্ব্বতের গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা বনদেবতার পূজা করে। মাকাসারবাসী ব্যাধগণ বনে কিছু খাইতে হইলে অগ্রে বনদেবতার অর্ঘ্য দেয়। খন্দ ও মুণ্ডাজাতি কোথায়ও উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে হইলে অগ্রে উপাস্য বৃক্ষের প্রতিষ্ঠা করে।

নির্ঝর, নদী, হ্রদ, কূপ, সমুদ্র, পুষ্করিণী প্রভৃতির পূজা নানাদেশে প্রচলিত। পূর্ব্বে এইরূপ পূজার য়ুরোপের পশ্চিমাংশে বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। হেরডোটস বলেন লিবিয়ানেরা অনেকগুলি হ্রদের পূজা করিত। ফ্রান্সদেশে টাউলাউন নগরের নিকটবর্ত্তী একটী হ্রদকে পার্শ্ববর্ত্তী নানাজাতি স্বর্ণ রৌপ্য উপহার দিয়া পূজা করিত, এ কথা সিসিরো, জষ্টিন, ষ্ট্রাবো প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারেরা উল্লেখ করিয়াছেন। টাসিটস, প্লিনি, বার্জ্জিল প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থেও অনেকগুলি উপাস্য হ্রদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে হেলেনস পর্ব্বতোপরি একটি পবিত্র হ্রদের কথা শুনা যায়। লানমিউর নগরের নির্ঝর তটে এবং ব্রিটানি দেশীয় সেণ্ট আনি কূপের পার্শ্বে অদ্যাপি পূজার জন্য অনেক খ্রীষ্টানের সমাবেশ হয়। ব্রিটনদেশেও তড়াগ ও কূপ পূজার সামান্য প্রাদুর্ভাব ছিল না। পার্থসিয়ারে সেণ্ট ফিলান কূপের পবিত্র বারি সেবন করিয়া রোগোপশম করিতে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দেও বিস্তর লোকের জনতা হইয়াছিল। স্কটলাণ্ডে বিস্তর পবিত্র কূপ ছিল। অদ্যাপি লকমারি দ্বীপের একটী কূপপার্শ্বে কৃষাণদিগের প্রদত্ত নৈবেদ্য দৃষ্ট হয়। স্কটলাণ্ডে এমন পল্লিই নাই যাহাতে এক একটী

পবিত্র কূপ ছিল না। আয়র্লণ্ডের অবস্থাও এইরূপ। গ্রীস দেশে নদী পূজার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইহারা সমুদ্র ও অনেকগুলি নির্ঝরকে দেবতারূপে গণ্য করিত। উত্তর আসিয়ার তুঙ্গুসি ও বোটিয়াক জাতি নির্ঝর পূজা করে। সমরকন্দে নদী পূজা প্রচলিত ছিল। কূপ পূজা লইয়া খ্রীষ্টের দশম শতাব্দীতে পারস্যবাসী আর্ম্মিনিয়ানদিগের দলভঙ্গ হইয়াছিল। বুরিয়াট ও বাস্কির জাতি হ্রদ পূজা করে। ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী প্রভৃতি অনেকগুলি নদনদীর উপাসনা করিয়া থাকে। মানস-সরোবর অতি প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যগণের বন্দনীয়। তড়াগ কূপ ও পুষ্করিণী মাত্রই প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলে দেবত্ব লাভ করে। যে দেশে পুণ্যসলিলা নদী নাই সে দেশেও নদীবিশেষ দেবনদী বিশেষের নামে উপাসিত হয়। নীলগিরি-বাসী অসভ্যগণ এবং কড়েয়া, সাঁওতাল খন্দ প্রভৃতি জাতি পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সকলকে “গঙ্গা মা” বলিয়া পূজা করে। গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী প্রভৃতি প্রস্রবণ সকলেরও হিন্দুরা পূজা করে। তাহারা সমুদ্রেরও পূজা করে। সুমাত্রাবাসীরাও সমুদ্র পূজা করিয়া থাকে। আশান্টি দেশে সান জুয়ান ও য়ুফ্রেটিস নদী এবং কাবুশির জাতির মধ্যে সমুদ্রের পূজা হয়। এ দেশে হ্রদ ও পুষ্করিণী পূজাও প্রচলিত আছে। গিনি উপকূলে নিগ্রোরা সমুদ্রের, ভে জাতি নদীর এবং জাম্বেসিতটে জলদেবতার; আমেরিকায় দাকোটা জাতি উংদাহি নামে জলদেবের, রেড ইণ্ডিয়ান জাতি নানা নদনদীর ও মান্দানেরা জলদেবতার পূজা করে। মেক্সিকো দেশে প্রস্রবণের পূজা হয়। এ দেশে লালক নামে জলদেবতাকে টোলটেক, চিচিমেক ও আজ-টেক জাতি পূজা করে। পেরুবাসী চিঞ্চা জাতি এবং টুকসিলো হইতে তারাপাকা পর্য্যন্ত সমুদ্রতটবাসীগণ সমুদ্রের পূজা করে; অপর অধিবাসীদিগের মধ্যে নদী ও প্রস্রবণ পূজা দৃষ্ট হয়। পারাগোয়ের লোকেরাও নদী পূজা করিয়া থাকে। অস্ট্রেলিয়ার জলমধ্যে ভয়ঙ্কর প্রেতপুরুষ বাস করে—কেহ অসময়ে স্নান করিতে যাইলে তাহাকে আক্রমণ করে, কখন কখন বা স্ত্রীলোক-দিগকে গ্রাস করিয়া পাতালপুরে লইয়া যায়। ভানডিমান দ্বীপেও এইরূপ বিশ্বাস। গ্রীণলাণ্ডদেশেও প্রত্যেক জলাশয়ের নিম্নে প্রেতাত্মার বাস। বনচারণক্রমে নূতন জলাশয় পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া জলপান করি-বার সময় জলদেবতা শরীর মধ্যে প্রবেশ না করে, এজন্য বৃদ্ধ লোকেরা প্রথমে আচমন করে। নিকাব, আক্রা ও কাফির জাতি নদী, তড়াগ ও সরোবরের

পূজা করে। তাতারদিগের মধ্যে অষ্টিয়াক ও বুরিয়াক জাতি নদী ও হ্রদের পূজা করে। ইয়ুরোপের উত্তরাংশে এবং জার্ম্মানদিগের মধ্যে উৎসভক্তি অদ্যাপি লক্ষিত হয়। বোহিমিয়ার লোকেরা অদ্যাপি নদী পূজা করে। ওয়েলস্ ও ইংলাণ্ডের কোন কোন অংশে কূপ পূজা অদ্যাপি নিবারিত হয় নাই।

অষ্টিয়াক ও তুঙ্গুসি জাতি পর্ব্বত পূজা করে, তাতারেরা প্রস্তর পূজা করে। পূর্ব্বে গ্রীশ দেশেও প্রস্তর পূজা হইত। বৈকাল হ্রদ সমীপস্থ পর্ব্বতবিশেষ পার্শ্ববর্ত্তী জাতিরা দেবতারূপে গণ্য করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে সপ্ত কুলপর্ব্বত দেবশ্রেণীতে গণ্য হয় এবং শোণনদগর্ত্তপ্রাপ্ত শিলা বিশেষ শালগ্রামরূপে হিন্দুগণ পূজা করিয়া থাকে। কি আর্য্য, কি অনার্য্য সুন্দর বা অসুন্দর শিলাখণ্ড দেবতারূপে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পূজিত হয়। সিন্দুর দিয়া এই শিলা সকল রঞ্জিত করিতে প্রায়ই দেখা যায়। ভারতবর্ষের ন্যায় কঙ্গোদেশেও রক্তবর্ণ পবিত্র রাগ। নবজিলাণ্ডেও এই বিশ্বাস। যাহা কিছু পবিত্র বলিয়া এদেশে গণ্য হয় তাহাই রক্তবর্ণে রঞ্জিত করা হয়। কেহ মরিলে তাহার আবাস গৃহে ও কবরের উপরে প্রোথিত সমাধি প্রস্তরে রক্তবর্ণ চিত্রিত করা হয়। নৌকা করিয়া জলপথে মৃতদেহ লইয়া যাইতে হইলে নৌকা খানিতে লাল রঙ্গ মাখান হয় এবং যেখানে নৌকা হইতে উঠা হয় সেখানেও কোন পদার্থে রক্তবর্ণ মাখাইয়া রাখিয়া যাইতে হয়। সর্দ্দারদিগের মৃতদেহ রক্তবর্ণের মাদুরে জড়াইয়া কবরসাৎ করিতে হয়।

সাঁওতালেরা মারাঙ্গবুড়ু নামে একটী পর্ব্বতের পূজা করে। মহম্মদের ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে আরাবেরা প্রস্তর পূজা করিত এবং বেনিটেকিপ নামে এক জাতি এললাট নামে এক পর্ব্বত পূজা করিত। প্রাচীন ফিনিসিয় জাতি ও রোমকেরা গ্রীকদিগের মত শিলা পূজা করিত। লাপলাণ্ড দেশেও পর্ব্বত পূজা প্রচলিত ছিল। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের সহস্র বৎসর পরেও য়ুরোপের পশ্চিমাংশে প্রস্তর পূজা দৃষ্ট হইত। খৃষ্টের পঞ্চম শতাব্দীতেও আয়র্লাণ্ডে প্রস্তর পূজা প্রচলিত ছিল। হেব্রিডিস ও স্কাইদ্বীপে সূর্য্যের উদ্দেশে শিলা পূজা হইত এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও নরওয়ের কৃষাণেরা শিলাপূজা করিত। আফ্রিকা মহাদেশে নিগ্রো ও আবিসিনিয়দিগের মধ্যে এইরূপ পূজা দেখা যায়। টাহিটীদ্বীপের লোকেরা পর্ব্বতের পূজা করে এবং নবজিলাণ্ডের লোকেরা টঙ্গাবিরো নামে একটী আগ্নেয়গিরির আরাধনা করিত। ফিজিদ্বীপে শিলা পূজার বড় প্রাদুর্ভাব।

সুমাত্রা, টানা, এবং মাইক্রোনেসিয়ার অন্তর্গত আপামামা ও তারাবাদ্বীপে এবং দাকোটা ইণ্ডিয়ান, নাচেজ ও মনিটারিজাতী এবং পেরুবাসীদিগের মধ্যে শিলা পূজা লক্ষিত হয়। ফ্লরিডার অধিবাসীরা ওলেমিনামে একটী পর্ব্বতের উপাসনা করিত। নিকারাগোয়ার অধিবাসীরা আগ্নেয়গিরির পূজা করিত। পশ্চিম আফ্রিকার ভিয়াই দেশে একটী নদীমধ্যস্থ মৈনাকের পূজা হয়। আমেরিকা-বাসী হুরণ ইণ্ডিয়ানেরাও পর্ব্বত পূজা করিয়া থাকে। পশ্চিম আমেরিকাতেও এইরূপ রীতি দেখা যায়।

এখন আসিয়ার কোন কোন অংশে লিঙ্গ পূজা লক্ষিত হয়। কিন্তু এক সময় য়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর সকল অংশেই যে লিঙ্গ ও যোনী পূজা প্রচলিত ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন সমাজতত্ত্ববিৎ অনুমান করেন খ্রীষ্টানদিগের ক্রস, মুসলমানের ক্রেসেণ্ট ও হিন্দুর ত্রিশূল লিঙ্গ-দেবতার আকৃতিতে গঠিত হইয়াছে এবং কোন কোন সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান পুরো-হিতগণ যে দেবমন্দির প্রবেশসময়ে তর্জনি দেখাইয়া যুক্তাঙ্গুলি ঊর্দ্ধ হস্তে প্রবেশ করেন, তাহাও প্রাচীন লিঙ্গপূজা সংজ্ঞাপক। যাহা হউক নানা কারণে আমরা লিঙ্গ ও যোনী পূজার সবিস্তর বিবরণ এথানে বর্ণনা করিতে পারিলাম না।

বর্টন সাহেব বলেন "আফ্রিকার লোকেরা ঈশ্বরকে পূজা করে না, কিন্তু পৃথিবীর সকল পদার্থই পূজা করিয়া থাকে"। ভারতবর্ষে যে চাঙ্গারীতে বোঝা বহিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে সে চাঙ্গারী পূজা করে, যে জাঁতায় ডাল ভাঙ্গে সে জাঁতা পূজা করে, সূত্রধর কর্ম্মকার তন্তুবায় প্রভৃতি সকল প্রকার ব্যবসায়ীরা আপন আপন ব্যবসায় ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ও অস্ত্র সকলের পূজা করে। ব্রাহ্ম-ণেরা দোয়াত কলম পুঁথি, ক্ষত্রিয়েরা অস্ত্র, কৃষকেরা লাঙ্গল ও মিস্ত্রীরা আপন আপন কর্ণিক পূজা করে। কুসা কাফিরদিগের রাজার নৌকার সহিত একটা পরিত্যক্ত নঙ্গরের দৈবাৎ প্রতিঘাত হয়। আবার তাহারই অব্যবহিত পরে রাজার মৃত্যু হয়। সেই অবধি কাফিরেরা নঙ্গরটী জীবিত বলিয়া মনে করিত এবং দেবতা বলিয়া পূজা করিত। সিম্রিয়ানেরা তরবারি পূজা করিত, ফিজি-য়ানেরা লাঠি পূজা করে; যরুবাদেশীয় নিগ্রোরা লোহার একটী অর্গল পূজা করিত। নবজিলাণ্ড ও মিলানেসিয়ার অধিবাসীরা এবং দাহোমানেরা রামধনুর পূজা করে। ডিলন উপসাগরের নিকট উইলিয়ম সাহেব হত হইবার সময় তাঁহার পকেট হইতে নাম খোদাই করা একটি লালবর্ণ মোহর পড়িয়া যায়, তত্রত্য অসভ্যেরা সেই মোহরটিকে দেবতা বলিয়া অনুমান করিয়া তাহাকে

কবর দিয়াছিল। নীলগিরিবাসী টোডা জাতি ঘণ্টা পূজা করে এবং কোটা-জাতি দুইখানি ধাতুনির্ম্মিত দর্পণ দেবদেবীরূপে আরাধনা করে; কুড়ুম্বজাতি বল্মীকের মন্দির পূজা করে, নীলগিরিবাসী তোড়িয়াজাতি একটি সোণার নথ পূজা করে, ডি ব্রোসস নামক একজন সাহেব কোন অসভ্য জাতির মধ্যে রুহি-তনের সাহেব খণ্ড দেবতার মত পূজিত হইতে দেখিয়াছিলেন। নাইজর নদী-তটবাসী নিগ্রোজাতি সাহেবদের জাহাজ পূজা করিত। কুকসাহেবের পলি-নেসিয়া দ্বীপে একখানি গাড়ি ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন, তদ্দেশবাসীরা তাহাকেই দেবতা বলিয়া পূজা করিত।

অতি প্রাচীনকালে আর্য্যঋষিগণ দ্যুঃ নামে আকাশের উপাসনা করিতেন। ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবী দ্যুঃপিতার গৃহমেধিনী। দ্যুঃ পিতা ও পৃথিবী মাতার আসন ঋগ্বেদোক্ত সর্ব্বদেবদেবীগণের উর্দ্ধে। ইনি জুপিতর বা জোব নামে গ্রীক ও রোমানদিগের মধ্যে সময়ান্তরে দেবরাজের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাঁহারই আদেশে বৃষ্টি ও করকাপাত হইত। নীহার পড়িত, মেঘ উঠিত, বজ্র গর্জ্জিত, সৌদামিনী চকিত, বায়ু বহিত এবং বিমান পথে ইন্দ্রধনু উদিত হইয়া ভয় তাড়িত মানব সন্তানকে ভরসা দিত। তাঁহারই আদেশে দিন, রাত্রি, মাস, ঋতু ও বর্ষ পরি-বর্ত্তন ঘটিত। তিনি কৃষাণের পশুবল পালন করিতেন, মাঠ ধন ধান্যে পূর্ণ করিতেন। উচ্চ পর্ব্বতের উচ্চতম শিখরদেশে তাঁহার আবাসস্থান। দিবা নিশি তিনি ধরণীকে আলিঙ্গন করিতেন। ব্যোমদেব অনন্ত অপরিবর্ত্তনীয়, দেবগণের দেবতা। আশ্চর্য্যের বিষয় অন্যান্য অসভ্যজাতিদিগের মত তাৎ-কালিক সভ্যতর আর্য্যসন্তানেরা ব্যোমদেবতা ও ব্যোমবাসী দেবতার মধ্যে প্রভেদ করিতে সক্ষম হন নাই। উত্তর আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ান, বিশেষতঃ হুরণ জাতির মধ্যে পৃথিবী নদনদী হ্রদ ও পর্ব্বতের অপেক্ষা ব্যোমদেব শ্রেষ্ঠতর বলিয়া গণ্য হয়। ইহারা বিপদে আপদে সর্ব্বাগ্রে ব্যোম দেবের পূজা করিয়া থাকে। ইরোকোয়াজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা আকাশ। উত্তর আমেরিকার নানা জাতির মধ্যে এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার জুলুরা আকাশের পূজা করে; এবং মেঘ গর্জ্জনের সময় ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ইহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করে। পশ্চিম আফ্রিকায়ও আকাশের পূজা হয়। বনি ও আঁকোয়াপীন দেশে আকাশ ও দেবতার মধ্যে প্রভেদসূচক কোন শব্দ নাই। অজিজাতির মধ্যেও এইরূপ। উত্তর আসিয়ার তাতার জাতিরা

আকাশ ও দেবতা ভিন্ন বলিয়া মনে করে না। ফিনজাতি তাহাদিগের দেবতাকে আকাশ, আকাশপিতা, আকাশধারী, বায়ুদেব, মেঘবাসী, মেঘচালক ও মেঘ মেষের রাখাল বলিয়া সম্বোধন করে। পূর্ব্বে চীনবাসিগণ আকাশকে দেবপতি বলিয়া আরাধনা করিত।

পর্জ্জন্য দেবতা মানব সমাজে কখন আকাশদেবতা কখন বা জলদেবতার ভিন্ন মূর্ত্তি বলিয়া পূজিত হইয়াছে, কখন বা স্বতন্ত্র দেবপদবী লাভ করিয়াছে। শ্বেতনীলনদ তটবাসী দীনকাজাতি দ্বেনদীদ্ নামে পর্জ্জন্য দেবতাকে স্রষ্টা বলিয়া পূজা করে। ওমকুরু নামে পর্জ্জন্য দেব দামারা জাতির প্রধান দেবতা। পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রোদিগের মতে পর্জ্জন্য ব্যোমদেবতার নামান্তর। পেরুভিয়দিগের সৃষ্টিপতি ধরাতলে বারিসিঞ্চনের জন্য পর্জ্জন্য দেবীকে নিয়োজিত করিয়াছেন। আজটেক্ জাতির লালক দেবতা পূর্ব্বে ব্যোমপতি নামে তড়িত ও বজ্রশাসন করিতেন; এখন জলদেবতা ও পর্জ্জন্য দেবতা নামে অধিক আনন্দ অনুভব করেন। নিকারাগোয়ার অধিবাসিগণ বৃষ্টিবর্ষণের জন্য পর্জ্জন্য দেবতার নিকট আপনাপন সন্তান বলিদান করিতে ক্ষুণ্ণ হয় না। বিদ্যুৎ ও বজ্র ইহারও অনুচর। এদেশীয় খন্দ জাতি পিথুপেন্নু দেবতার নিকট মদ ডিম্ব চাউল প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া অতি কাতরভাবে বৃষ্টির জন্য ভিক্ষা করে। কোল জাতি মারংবুড়ো নামে পর্ব্বতবিশেষকে পর্জ্জন্য দেবনামে উপাসনা করে। বৃষ্টি না হইলে ইহাদিগের রমণীগণ পাহান নামে পুরোহিত-পত্নীদিগকে অগ্রসর করিয়া পর্ব্বতপৃষ্ঠে উপস্থিত হয়। দুগ্ধ ও বিল্বপত্রে পূজা সমাপ্ত করিয়া পাহান বনিতাগণ আলুলায়িত কেশে ও জানু পাতিয়া অতি কাতর স্বরে প্রার্থনা করিতে থাকে ও মস্তক সঞ্চালন করিতে থাকে। মাথা নাড়িতে নাড়িতে তাহারা ক্রমে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠে। যতক্ষণ আকাশে মেঘ সঞ্চার না হয় ততক্ষণ প্রার্থনা করিতে নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু মেঘসঞ্চার দেখিবা মাত্রই ডঙ্কা বাজাইয়া নৃত্য করিতে থাকে। শেষে দূরাকাশে মেঘ গর্জ্জন শ্রুত হইলে মারংবুড়ো প্রসন্ন হইয়াছেন ভাবিয়া আনন্দ মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। পূর্ব্বে ফিন জাতি ব্যোমদেবতাকেই পর্জ্জন্য দেবতা বলিয়া অনুমান করিত। গ্রীকদিগের মধ্যে পর্জ্জন্য দেবতা জ্যুপিতর প্লুভিয়স্ দেবপতি জুপিটরের নামান্তর মাত্র। কোল রমণীদিগের মত গ্রীক সুন্দরীগণও বৃষ্টির অভাব হইলে রিক্তপদে পর্ব্বতপৃষ্ঠে গিয়া প্লুভিয়সের নিকট প্রার্থনা করিত। গ্রীক্ খ্রীষ্টানেরা কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে প্লুভিয়সের পরিবর্ত্তে পীর পিটর বা পীর জেমসের নিকট আপনাদিগের অভাব আবেদন করিত।

ঊনবিংশতি শতাব্দির মধ্যে সভ্য খৃষ্টান ইংরাজদিগকে বৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে দেখা গিয়াছে।

ভয় হেতু যে সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে বজ্র তাহাদিগের অন্যতম। কোন কোন জাতির মধ্যে বজ্র পর্জ্জন্য দেবতার অনুচর মধ্যে পরিগণিত হইলেও স্থানান্তরে ইহার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। বনবাসী অসভ্যদিগের নিকট বজ্রের মত ভয়ঙ্কর দেবতা আর কল্পনা হয় না। সভ্য হইয়া আমরা সে ভয়ের গাঢ়ত্ব ও তীব্রত্ব অনুমান করিতে অসমর্থ। উত্তর আমেরিকার অধিবাসীরা তাহাদের প্রধান দেবতাকে পক্ষীরূপে কল্পনা করে। বজ্র তাহার পতত্র আঘাত শব্দ, বিদ্যুৎ তাহার চক্ষুর তীব্রজ্যোতি। দাকোটাজাতি বলে এই ভীষণ পক্ষীর চরণচিহ্ন বার ক্রোশ ব্যবধানে মাঠমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কারিয়দিগের মতেও বজ্র পক্ষীর আকার, তিনি ঝড়ের অধিনায়ক এবং বৃষ্টির কর্ত্তা, নলের মধ্য দিয়া তিনি অগ্নি ফুৎকার করিলে তাহাই বিদ্যুৎরূপে প্রতিভাত হয়। বজ্রের ঝন্ঝনা শুনিবামাত্র কারিবেরা ছুটিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করে এবং হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে থাকে—"মাবোয়া কারিবের কপালে কুপিত হইয়াছে।" ব্রাজিলবাসী টুপী জাতির মধ্যে বজ্র সর্ব্বপ্রধান দেবতা। কুমানাদেশে বজ্র কুপিত সূর্য্যের অস্ত্র। দাবেবা দেশে দেবতা বজ্র দ্বারা অভক্ত সন্তানকে শাসন করিয়া থাকেন। পেরুভিয়দিগের মতে বজ্র ব্যোম পিতার পুত্র। আফ্রিকাবাসী জুলুগণ বজ্রকে ব্যোমদেবতার অনুচর মনে করে। যরুবা জাতি সাঙ্গ নামে স্বতন্ত্র বজ্র দেবতার পূজা করিয়া থাকে। কামস্কাটকা দেশে বিলুকৈ নামে পর্জ্জন্য দেবতা মেঘের উপর অন্য দেবগণের সহিত বাস করিয়া থাকেন এবং তিনি বৃষ্টি বিদ্যুৎ ও বজ্র প্রেরণ করেন। ককেসসবাসী অসিটী জাতি ইলিয়া নামে বজ্র দেবতার আরাধনা করে। বোধ হয় উহারই নামানুসারে খ্রীষ্টানদিগের ইলাইজার নামকরণ হইয়াছে এবং ইহা হইতেই জাইনাতটের পর্ব্বত বিশেষের নাম সেণ্ট ইলিয়াস। কোন মুসলমান সম্প্রদায়ের মতে আলি বজ্রভাষায় কথা কয়, এবং বিদ্যুৎ প্রহারে বিধর্ম্মিদিগকে তাড়না করিয়া থাকে। ল্যাপদিগের মতে ঐজ নামে বজ্রদেব ব্যোমদেবের মূর্ত্তি বিশেষ; ফিন ও রুণী জাতিও বজ্রের পূজা করে। আর্য্য জাতির ইন্দ্রদেব বজ্রপাণী। ঋগ্বেদে ইন্দ্র বজ্রহস্তে নানাবিধ অসুরের প্রাণ বধ করিয়া আর্য্যবর্ণ রক্ষা করিবার উল্লেখ আছে। হিন্দুদিগের ইন্দ্র দ্যুঃপিতার পুত্র। কিন্তু গ্রীকদিগের জুপিটর স্বয়ং বজ্রপতি। তিনি অভ্রভেদী অলিম্পস পর্ব্বতে বসিয়া বজ্র তাড়ন

করিতেন। রোমকদিগেরও এইরূপ বিশ্বাস ছিল। প্রচীন স্লাব জাতি ব্যোমকে দেবপতি বলিয়া পূজা করিত বজ্র, তাঁহারই তাড়ন যন্ত্র। পূর্ব্বে নিথুনিয়া দেশে মেঘনির্ঘোষ শ্রুত হইলে কৃষাণেরা "বজ্রদেব রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিত। প্রাচীন জার্ম্মান ও স্কাণ্ডিনেভিয় ধর্ম্মমতে বজ্র স্বতন্ত্র দেবতা। সাক্সন স্বর্গের তিনি প্রধান দেবতা, তাঁহারই নামানুসারে বৃহস্পতিবারের "থরস্‌ডে" নামকরণ হইয়াছে।

অস্ফুটবুদ্ধি অসভ্যের নিকট প্রত্যেক পদার্থের স্বতন্ত্র প্রাণপুরুষ; ক্রমে যত বুদ্ধি পরিস্ফুট হইতে থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ তুলনা করিয়া তাহাদের সাধারণ গুণ লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা জন্মে, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে এক জাতীয় বলিয়া নির্ণয় করা হয়, ততই পদার্থবিশেষের ভিন্ন দেবত্ব ঘুচিয়া জাতিবিশেষের এক একটী দেবতা গণ্য হয়। অসভ্য ও সভ্যতর জাতির ধর্ম্মমতে এইখানে প্রভেদ। অসভ্যদিগের নিকট প্রত্যেক পদার্থের স্বতন্ত্র দেবতা আছে, সভ্যতর লোকদিগের নিকট প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র দেবতা আছে। নিম্নতর শ্রেণীতে প্রত্যেক নদীর স্বতন্ত্র দেবতা, প্রত্যেক দিগ্‌বাহী বায়ুর স্বতন্ত্র দেবতা, প্রত্যেক বৃক্ষের স্বতন্ত্র দেবতা। সভ্যতর জাতির নিকট বায়ুমাত্রেরই এক দেবতা, জলমাত্রেরই এক দেবতা, বৃক্ষ মাত্রেরই এক দেবতা। আবার সভ্যতার যত বৃদ্ধি হয়, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের সাধারণ গুণ আরো যত প্রকাশিত হইয়া পড়ে, ততই ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি মিলাইয়া সমুদয় সৃষ্ট পদার্থের এক দেবতা প্রতিপন্ন হয়। কি নরপূজা, কি জীবপূজা, কি অচেতন প্রকৃতিপূজা, সকল দেশেই ক্রমে বহুত্ব ঘুচিয়া একত্ব হয়। আবার সভ্যতম মানব এই বিভিন্ন কয়েকটী মিলাইয়া একটী করিয়া লন। বহুপ্রকৃতি পূজা অপেক্ষা এই জন্য বহুদেব পূজা উন্নততর বুদ্ধির পরিচায়ক। বহুদেব পূজা অপেক্ষা একদেব পূজা অধিকতর পরিস্ফুটতার পরিচয় দেয়। মূলে প্রেত পূজা, প্রকৃতিপূজা প্রেতপূজার অব্যবহিত পরে, প্রকৃতিপূজার অনুসরণ ক্রমে মনুষ্য একেশ্বর পূজায় পৌঁছিয়াছে।

আল্‌গণকিন্ জাতির মতে পশ্চিমবায়ুর সন্তান পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর বায়ু। ইহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র দেবতা। দেলবার দেশে চারিটী স্বতন্ত্র বায়ুর পূজা হয়। ইরোকোয়া জাতির মতে বায়ু নামে একটী দেবতা। পলিনেসীয়া দ্বীপেও বায়ুর পূজা হয়। ঝড় উঠিলেই লোকেরা পূজা করিয়া বায়ু দেবতার প্রকোপ শান্তি করিবার চেষ্টা করে। টাহিটি দ্বীপে পূর্ব্ববায়ু বায়ুর রাজা। তিনি অন্যান্য বায়ুদিগকে কারাবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু পশ্চিম বায়ুকে ধরিতে পারেন নাই, সেই

জন্য সেই দেশে পশ্চিম বায়ুর এত প্রভাব। নবজিলাণ্ডেও ঠিক এইরূপ বিশ্বাস। কামাস্কাট্‌কা দেশে বায়ু ব্যোমদেবতার অনুচর মাত্র। ইহাদিগের মত ফিন্ জাতির মতেও বায়ু নিম্নশ্রেণীর একটী দেবতা, ব্যোমদেবের শাসনে শাসিত। এস্থ জাতি বায়ু মাতার পূজা করে হুহু শব্দে বায়ু বহিলেই ইহারা বলে "বায়ুর মা কাঁদিতেছে, কে জানে কাহার মা কাল কাঁদিতে পারে।" ঋগ্বেদে মরুৎ নামে স্বতন্ত্র দেবগণের উল্লেখ আছে। মরুৎগণ চোর মেঘগণের অনুধাবন করে। ইন্দ্র মরুৎগণের সাহায্যে মেঘদিগের দুর্গ ছারখার করিয়া শ্বেতগাভী-স্বরূপ দিবা সকলকে পুনরুদ্ধার করেন। গ্রীকেরাও পূর্ব্বকালে বায়ুর পূজা করিত। জার্ম্মান দেশে ওডিন নামে বায়ুর পূজা এক সময়ে প্রচলিত ছিল। অদ্যাপি সোয়েবিয়া, টাইরোল, আনষ্ট এবং পালাটিনেট প্রভৃতি জার্ম্মানির বিবিধ প্রদেশে লোকেরা বায়ুমুখে কিছু খাদ্যদ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

আলগণকিনজাতি ও পেরুভিয়গণ পৃথিবী দেবীর পূজা করিত। পশ্চিম আফ্রিকায় পৃথিবী সর্ব্বজননীরূপে পূজা গ্রহণ করেন। নিগ্রো জাতি কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীদেবীর উদ্দেশে অর্ঘ্য দিয়া থাকে। ভারত-বর্ষে বাদাগা ও খন্দজাতি"ধর্ত্তি মা"(ধরিত্রী মাতা) নামে পৃথিবীর পূজা করে এবং কিছু আহার করিবার পূর্ব্বে ধরিত্রীদেবীকে প্রথমে কিঞ্চিৎ উপহার দেয়। উড়িষ্যাবাসী খন্দ জাতি প্রধানতঃ পৃথিবীর উপাসক। ইহারা বলে "বুড়া-পেন্নো" বা সূর্য্যদেব বিবাহ করিবার জন্য "তারিপেন্নু" নামে পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই দম্পতি হইতে সকল দেবতার উদ্ভব। কালক্রমে স্ত্রী পুরুষে বিবাদ ঘটে; তদবধি পত্নী স্বামিসৃষ্ট জীবনিচয়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত হই-য়াছেন। এই জন্য খন্দদিগের মধ্যে সূর্য্য উপাসকেরা পৃথিবীদেবীকে অসুরের মত ঘৃণা করে। কিন্তু সকলেই নরবলি দিয়া দেবীর সন্তোষসাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। "তারিপেন্নু" সন্তুষ্ট থাকিলে সন্তানসন্ততি গাভীবৎস সকলেই সুস্থ থাকে, মাঠে যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন হয়। উত্তর আসিয়াবাসী তাতারদিগের মধ্যে পৃথিবীদেবীর পূজা হয়। তুঙ্গুসিও গুরায়াৎ জাতির মধ্যে ধরিত্রী উচ্চ শ্রেণীর দেবতা। ফিন্ জাতি "মায়েমা" নামে ধরিত্রী দেবীর উপাসনা করিত। পূর্ব্বে চীনদেশে ব্যোমদেবের নিম্নেই ধরিত্রীর আসন ছিল। বেদে পৃথিবী-দেবীর উপাসনার মন্ত্র পাওয়া যায়। অদ্যাপি ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীর নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। গ্রীসদেশে এবং রোমান ও জার্ম্মণদিগের মধ্যে পৃথিবীপূজা প্রচলিত ছিল। এখনও জার্ম্মাণিতে জিপ্সিগণ পবিত্রা পৃথিবীতে মদস্পর্শ করিতে দেয় না।

আমরা পূর্ব্বে নদী, হ্রদ, তড়াগ, কূপ, ও বৃষ্টি পূজার উল্লেখ করিয়াছি। দাকোটা জাতি উত্তাতাহে নামে স্বতন্ত্র জল দেবতার পূজা করে। সমুদ্রতলে ইহাঁর নিবাস। মেক্সিকোদেশেও স্বতন্ত্র জলদেবতার পূজা হইত। গ্রীকগণ নিরিয়স্ নামে এবং ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ বরুণ নামে জল-দেবতাব পূজা করিত। পলিনেসিয়া দ্বীপেও স্বতন্ত্র জল-দেবতার পূজা হয়। গিনিকোষ্ট, সাউথসি দ্বীপ, দাহোমি, স্লেবকোষ্ট, পেরু, কামাস্কাটকা, :জাপান, রোম প্রভৃতি নানাদেশে স্বতন্ত্র জল-দেবতার পূজার উল্লেখ আছে।

গত শতাব্দীতে উত্তর আমেরিকায় ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে অগ্নিপূজা প্রচলিত ছিল। দেলবারদেশে অগ্নিকে সকল দেবতার আদিপুরুষ বলিয়া পূজা করা হইত। চিনুক জাতি ও কলম্বিয়া নদীতটবাসিদিগের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। মেক্সিকো দেশে অগ্নি পূজার বড় সমারোহ হইত। প্রতি বৎসর তাঁহার মন্দির সমক্ষে দুইবার মেলা বসিত। উপাসকেরা অগ্নিতে জীবন্ত মনুষ্য দগ্ধ করিয়া এবং সকলে নৃত্য করিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিত। পলিনেসিয়া দ্বীপপুঞ্জে এবং পশ্চিম আফ্রিকার দাহোমিদিগের মধ্যে অগ্নিপূজা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকল স্থানাপেক্ষা আসিয়া মহাদেশে অগ্নি-পূজার অধিক প্রাদুর্ভাব। কামাস্কাট্‌কা ও জেসো দেশে এবং তুঙ্গুসি, মোগল ও তুর্কী জাতির মধ্যে অগ্নি-পূজা অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বকালে আসিরিয়া, চালডিয়া, ফিনিসিয়া ও পারস্য দেশে :অগ্নি-পূজা প্রচলিত ছিল। অদ্যাপি হিন্দুদিগের মধ্যে সর্ব্বধর্ম্মকর্ম্মে অগ্নি পূজার আবশ্যক হয়। কাস্পিয়ান সাগরের তটবর্ত্তী বাকুদেশে, জ্বালামুখী কূলপার্শ্বে এবং চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ সমীপস্থ সীতাকুণ্ডে নানাদিগ্‌দেশীয় যাত্রীগণ পূজা করিবার জন্য সমবেত হয়। পারস্য হইতে তাড়িত হইয়াও পার্শীগণ তাহাদের প্রাচীন অগ্নিপূজা পরিত্যাগ করে নাই। জরাথুস্ত্রের অগ্নিপূজা অদ্যাপি বোম্বাই ও গুজরাটের পার্শীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে লিথুনিয়া, প্রুসিয়া, রুসিয়া, রোম ও গ্রীস দেশে অগ্নিপূজা প্রচলিত ছিল। বোহিমিয়া, এস্থোনিয়া ও কোরিন্থের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অদ্যাপি অগ্নিপূজা করিয়া থাকে। নাচেজ, চিরোকি ও অজিবা জাতির মধ্যে পার্শীদিগের মত চিরাগ্নি রক্ষা করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে পেরু দেশেও চিরাগ্নি রক্ষা করিবার প্রথা ছিল। মেক্‌সিকো দেশে অদ্যাপি এই প্রথা লক্ষিত হয়। কঙ্গোবাসীগণ অদ্যাপি অগ্নিপূজা করিয়া থাকে।

শীতপ্রধান দেশে ও কৃষিজীবী জাতির মধ্যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সূর্য্য-

পূজার প্রাধান্য অধিক। দক্ষিণ আমেরিকার নিম্নতর দেশে সূর্য্যপূজা অধিক নাই, কিন্তু পেরু, কুণ্ডিনামার্কা প্রভৃতি উচ্চতর স্থানে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাতারবাসী প্রাচীন মাসাগেট জাতি সূর্য্যের উপাসনা করিত। হেরো-দোতস্ বলেন, উষ্ণপ্রধান আফ্রিকা দেশে সূর্য্য উঠিলেই লোকেরা গালাগালি করিত। হডসন উপসাগরের তটবাসী ইণ্ডিয়ান সর্দ্দারেরা প্রাতঃসূর্য্যের সম্মা-নার্থ তিনবার তামাকু সেবন করে। বহ্বুবর দ্বীপে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় সূর্য্য-পূজার বিধি। দেলবার প্রদেশে দেবমণ্ডলীতে সূর্য্যের দ্বিতীয় স্থান। বার্জ্জিনিয়া প্রদেশে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সূর্য্যপূজা হইত। পটবাটোমী জাতি প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঘরের চালের উপর উঠিয়া জানু পাতিয়া সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিত। আলগণকিন, সিউকস্, ক্রিক, ব্রাজিলবাসী বাটুকুদো, অরকা-নিয়ান প্রভৃতি নানা জাতি সূর্য্যকে সর্ব্বপ্রধান দেবতা বলিয়া অনুমান করিত। কোরোডো ও আবিপোন জাতি সূর্য্যপূজা করিত। পুয়েল্‌চি জাতি সূর্য্যের নিকট সকল অভাব জ্ঞাপন করিত। টুকুমানবাসী দায়াগিটা জাতির মধ্যে সূর্য্যের মন্দির ছিল—উহারা পাখীর পালক সূর্য্যের নিকট উৎসর্গ করিয়া গৃহে আনিয়া সযত্নে রক্ষা করিত। মাঝে মাঝে পশু পক্ষী বলিদান করিয়া ঐ পাল-কের উপর রক্ত ছিটাইত। লুসিয়ানাবাসী নাচেজ জাতির মধ্যে সূর্য্যপূজার বড় প্রাচুর্ভাব ছিল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে সর্দ্দার গৃহদ্বারে পূর্ব্বমুখে দণ্ডায়-মান হইয়া সূর্য্যের আরাধনা করিত, তিনবার নমস্কার করিত, সূর্য্যের উদ্দেশে একবার তামাক সেবন করিয়া আর তিনবার তিন দিকে মুখ ফিরাইয়া সেবন করিত। একটী বৃত্তাকার মন্দির সূর্য্যের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মন্দিরে চিরাগ্নি রক্ষিত হইত এবং এই মন্দিরে সর্দ্দারদিগের অস্থি, প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি রাখা যাইত। মন্দির মধ্যে প্রতিদিন তিনবার পূজা হইত। সর্দ্দারকে সকলে সূর্য্য বা সূর্য্যের ভ্রাতা বলিয়া অভিহিত করিত—তিনিই যাজক, তিনিই রাজা, তাঁহার ভগিনী নাচেজ রমণীগণের পুরোহিত হইতেন। মন্দির মধ্যে সর্দ্দার-ভগিনী ভিন্ন আর কোন রমণীর প্রবেশাধিকার ছিল না। সর্দ্দারের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভগিনীপুত্র সর্দ্দার ও পুরোহিত হইত। সর্দ্দারের ভগিনীগণের অকু-লীনে বিবাহ করিবার অধিকার ছিল এবং তাঁহাদের মৃত্যু হইলে পরলোকে আনুচর্য্য করিবার জন্য তাঁহাদের স্বামীগণকেও হত্যা করা হইত। ফ্লরিডাবাসী আপলাচি জাতির মধ্যে, মেক্‌সিকো দেশে এবং বগোটাবাসী চিব্‌চা জাতির মধ্যে সূর্য্যপূজা হইত। পেরুদেশের সর্দ্দারেরা আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া

পরিচয় দিত এবং সূর্য্যের পূজা করিত। পেরুদেশে সূর্য্যপূজার যে সমারোহ হইত, প্রাচীন পৃথিবীর কুত্রাপি সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। অষ্ট্রেলিয়া ও পলিনেসিয়া দেশীয় দেবাখ্যায়িকা মধ্যে সূর্য্যসম্বন্ধে বিস্তর আখ্যায়িকা পাওয়া যায়—কিন্তু এখানে যে সূর্য্যের পূজা হইত, তাহার কোন চিহ্ন এখন পাওয়া যায় না। মিসর ভিন্ন আফ্রিকা মহাদেশের আর কুত্রাপি সূর্য্যপূজার বড় প্রাদুর্ভাব ছিল না। ভারতবর্ষে বোদো ও ধীমলেরা সূর্য্যপূজা করে। মুণ্ডা, ওরাঁও, সাঁওতাল প্রভৃতি কোল জাতীয়দিগের মতে সূর্য্য সর্ব্বপ্রধান দেবতা। খন্দ ও কর্কশ জাতির মতে সূর্য্যই সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সকল সম্পদের কারণ। চিচিমেক, আলকোন, সালিব, নাবাজা, কোমাঞ্চি, রেডস্কিন, আট, কানিয়গ, মুটি এবং কাহার কাহারও মতে এস্কিমোদিগের মধ্যেও সূর্য্যপূজা প্রচলিত আছে। সাই-বেরিয়া হইতে ল্যাপ্‌লাণ্ড পর্য্যন্ত তাতারজাতীয়দিগের মধ্যে সূর্য্য উচ্চশ্রেণীর দেবতা। সাময়িদ, মোগল, কারগিজ, তুঙ্গুসি, অষ্টিয়াক, বোগল ও ল্যাপ-জাতি সূর্য্যপূজা করে। বোধ হয় এই সকল জাতির সহবাসে উত্তরকুরুপ্রদেশে প্রাচীন আর্য্যজাতির মধ্যে সূর্য্যপূজার অভ্যুদয় হয়। সবিতা নামে বেদমধ্যে সূর্য্যপূজার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। অনেকে মনে করেন ব্রাহ্মণের বন্দনীয় গায়ত্রী সূর্য্যপূজার মহামন্ত্র। অদ্যাপি প্রত্যেক ভক্ত হিন্দুসন্তান "জবাকুসুম সঙ্কাশং" বলিয়া সূর্য্যের প্রতিদিন আরাধনা করিয়া থাকেন। বৈদিক দেবতা মিত্র মিথ্‌রূপে সূর্য্যের আখ্যান হইয়া পারশিদিগের বন্দনীয়। "Deo Soli Mithrae" বা দেবসূর্য্য মিত্র নামে রোমানেরা সূর্য্যের পূজা করিত। গ্রীকেরা হিলিয়াস নামে সূর্য্যের পূজা করিত। স্লাব ও জার্ম্মাণদিগের মধ্যেও সূর্য্যপূজা প্রচলিত ছিল। মিসর, সিরিয়া, আসিরিয়া ও ফিনিসিয়া দেশে এবং ইহুদা জাতির মধ্যে এক সময় সূর্য্যের পূজা হইত। যখন সূর্য্যোপাসকগণ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তখন তাহারা সকলে সূর্য্যপূজা পরিত্যাগ করে নাই। আর্ম্মি-নিয়ার খৃষ্টানেরা অদ্যাপি সূর্য্যের পূজা করে। এইরূপ বেদুইন আরাবেরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও প্রাচীন সূর্য্যপূজা ছাড়ে নাই। গ্রীনবাসীগণ খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পরেও সূর্য্যের পূজা করিত। রোম দেশেও এইরূপ হইয়া-ছিল। অদ্যাপি উত্তর পালাটিনেটের খৃষ্টানেরা প্রাতঃসূর্য্যকে দেখিয়া মাথার টুপি খুলিয়া থাকে। এবং পোমারেনিয়ার খৃষ্টানেরা জ্বরপীড়িত হইলে প্রতি-দিন তিনবার সূর্য্যের নিকট পীড়াশান্তির জন্য প্রার্থনা করে। প্রাচীন সূর্য্য-পূজার অনেকগুলি উৎসব নামান্তরে অদ্যাপি খৃষ্টানদিগের মধ্যে প্রচলিত রহি

য়াছে। "ইষ্টার" দিবস প্রাতঃকালে এখনও সাক্‌সনি ও ব্রাণ্ডেনবর্গ প্রদেশে কৃষকগণ পাহাড়ের উপর উঠিয়া সূর্য্যোদয় প্রতীক্ষা করে এবং সূর্য্যকে দেখিতে পাইলে তিনবার লম্ফ দেয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে এ প্রথা প্রচলিত ছিল। "খৃষ্টমাস" প্রাচীন সূর্য্যোৎসব মাত্র। ২৫শে ডিসেম্বর খৃষ্টের জন্মদিন নহে। পাস্কাল উৎসব প্রভৃতি অনেকগুলি সূর্য্যোৎসব রোমান কাথলিক ও গ্রীক চর্চ্চ খৃষ্টানদিগের মধ্যে দেখা যায়।

টিনে জাতির একটী শাখা বলে চন্দ্র ইহলোকে দরিদ্র বালকের বেশে তাহাদের মধ্যে বাস করিত। এস্কিমো জাতি বলে চন্দ্র মনুষ্যের প্রেতাত্মা—দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসিদিগের মধ্যেও এইরূপ বিশ্বাস। চিবচাজাতি বলে নরজন্মে চন্দ্র প্রতিবাসিদিগকে অনেক অসৎকার্য্য শিখাইয়াছিল। এই অপরাধে বোচিকা নামে মানবজাতির গুরুদেব সূর্য্যের সহিত বিবাহ হইবার জন্য ও রাত্রিতে অন্ধকার আলোকিত করিবার জন্য চন্দ্রকে আকাশে পাঠাইয়া দেন। অসৎ কার্য্য শিখাইয়াছিল বলিয়া চন্দ্রকে দিনের বেলা প্রকাশিত হইবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। মেক্সিকোবাসিগণ বলে একটী মানুষ আগুনে ঝাঁপ দিয়া সূর্য্যরূপে বাহির হইয়াছিল—আর একটী গহ্বরে প্রবেশ করিয়া চন্দ্ররূপে বাহির হইয়াছিল। সুতরাং অন্যান্য পূজার ন্যায় চন্দ্রপূজাও যে প্রেতবিশ্বাস হইতে প্রচলিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। ব্রাজিলবাসিগণ সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্রের অধিক গৌরব করে। চন্দ্র নানা প্রকার পীড়ার কারণ বলিয়া এদেশীয়েরা মনে করে। বাটুকুদো জাতির মতে চন্দ্রই দেবরাজা। তিনিই বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাতের কারণ এবং শস্য ও জীবনাশের হেতু। কারিবরা চন্দ্রকে সূর্য্য অপেক্ষা অধিক সম্মান করে। বঙ্কুবর দ্বীপবাসী আটজাতি চন্দ্রকে স্বামী ও সূর্য্যকে তাহার স্ত্রী বলিয়া পূজা করে। হুরন জাতী চন্দ্রকে সূর্য্যের পিতামহী বলে এবং তাঁহাকেই জগৎ সৃষ্টির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি যে সকল দেশে সূর্য্যপূজা দৃষ্ট হয় না সেখানে চন্দ্রপূজার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব আছে। নিগ্রো ও হটেণ্টাট জাতি ও আসাঙ্গো, কঙ্গো ও গিনিদেশের অধিবাসিরা চন্দ্রের পূজা করে। সাইবেরিয়া দেশীয় তুঙ্গুসিজাতি, ভারতবর্ষীয় বোদোজাতি, যেসোবাসী আইনোজাতি; এবং দেলাবার, মেক্সিকো, পেরু ও জাপানদেশের অধিবাসিগণ চন্দ্রের পূজা করিত। ইহুদাজাতি, গ্রীক ও কার্থেজিনিয়গণের মধ্যে এবং মিসর ও সিরিয়াদেশে প্রাচীনকালে চন্দ্রপূজা প্রচলিত ছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত ইউরোপীয়গণ খৃষ্টধর্ম্ম

গ্রহণ করিয়াও চন্দ্রপূজা পরিত্যাগ করে নাই। একেশ্বরবাদী মুসলমানেরা অদ্যাপি দ্বিতীয়ার চন্দ্র দেখিলে করযোড়ে বন্দনা করিয়া থাকে।

ইহুদাজাতি নক্ষত্রদিগকে জীবন্ত মনে করিত এবং বলিত দোষ করিলে তাহাদিগেরও দণ্ড হইয়া থাকে। গ্রীকেরাও নক্ষত্রদিগকে মনুষ্যের প্রেতাত্মা বলিয়া মনে করিত। ফিজিদ্বীপে বড় উল্কাপিণ্ডদিগকে দেবতা এবং ক্ষুদ্রদিগকে মনুষ্যের প্রেতাত্মা বলে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা নক্ষত্রদিগকে বালক বলিয়া বিশ্বাস করে। ইহারা বলে তিনটী নক্ষত্র এক সময়ে পৃথিবীতে বাস করিত—দুইটী স্ত্রীপুরুষ, একটী উহাদিগের কুকুর। ইহারা এখন আকাশে শিকার করিয়া বেড়ায়। ট্যাসমেনিয়ানেরা বলে, দুইজন কৃষ্ণকায় মনুষ্য তাহাদিগের মধ্যে অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া আকাশে যাইয়া নক্ষত্র হইয়াছে। উত্তর আমেরিকার অধিবাসীরা বলে, প্রেতাত্মার স্বর্গে যাইবার পথই ছায়াপথ। পথে উহারা যে আগুন জ্বালে, তাহাই নক্ষত্ররূপে প্রতীয়মান হয়। কালিফর্ণিয়াবাসী চারকজাতি বলে তাহাদের দেশে একজন একটী নক্ষত্রের রূপে মোহিত হইয়া পাহাড় হইতে লাফাইয়া উহার সঙ্গ ধরে। তাহার পরে দুইজনে নাচিতে নাচিতে আকাশে চলিয়া যায়। শেষে শীতে তাহার হস্তপদ অবশ হইলে সে আকাশ হইতে পড়িয়া যায়। তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে। অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা বলে, মানুষ জন্মিবার পূর্ব্বে নক্ষত্রেরা পৃথিবীতে বাস করিত—মানুষ হওয়া অবধি উহারা আকাশে গিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। এস্কিমো জাতি বলে কতকগুলি লোক বিলে মৎস্য শিকারে গিয়া পথ হারাইয়া আকাশে উঠিয়া গিয়াছিল, তাহারাই নক্ষত্ররূপে দৃষ্ট হয়। আমাদের দেশীয় খসিয়াজাতি বলে কতকগুলি লোক একটী বড় গাছে উঠিয়াছিল—অন্যেরা গাছটী কাটিয়া ফেলে, সেই অবধি তাহারা নক্ষত্ররূপে আকাশে বাস করিতেছে। হিন্দুরা কয়েকটি নক্ষত্রকে ঋষি ও ঋষিপত্নী বলিয়া উল্লেখ করে।

---

# ষোড়শ পল্লব।

এখন দেখা গেল, কি চেতন কি অচেতন সকল পদার্থই আপন আত্মা বা অন্য আত্মার সমাবেশ হেতু সর্ব্বত্র দেবভাবে পূজিত হইয়াছে। প্রকৃতি-পূজার একটী অবস্থা প্রতিমা-পূজা। মানব-বুদ্ধির স্ফুটতার একটী নির্দ্দিষ্ট অবস্থা হইতে সকল দেশে প্রতিমা-পূজা প্রচলিত হয় নাই। কোন কোন জাতির মধ্যে নরপূজা বা অন্য জীব-পূজার সহিত প্রতিমা-পূজা দৃষ্ট হয়। কোন কোন জাতি বা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া প্রতিমা-পূজা আরম্ভ করিয়াছে। ঋগ্বেদে ইন্দ্র মরুৎ সূর্য্য, সোম বা পিতৃগণের পূজা দেখা যায়; কিন্তু প্রতিমা-পূজার উল্লেখ কোথায়ও পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বৃক্ষবাসী অন্য আত্মার পূজা ও বৃক্ষ আত্মার পূজা প্রভেদ করিতে না পারাতে কাহারা প্রকৃতি পূজা, কাহারা বা প্রতিমা পূজা করে, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। পদার্থ-বিশেষে অন্যদীয় আত্মার সঞ্চার হইয়াছে অনুমান করিয়া সেই পদার্থকে পূজা করার নাম প্রতিমা-পূজা বলি। প্রকৃতপক্ষে এরূপ প্রতিমা-পূজা ধর্ম্মভাবের উচ্চতর অবস্থা বলা যায় না। অতি অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও এইরূপ প্রতিমা-পূজা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার প্রতিমার জন্য কেবল সুগঠিত সুন্দর মূর্ত্তির আবশ্যক নাই। কাষ্ঠ-খণ্ড, প্রস্তর-খণ্ড, অস্থি-খণ্ড, মৃত্তিকা-স্তূপ, এক টুকরা লৌহ, একটী পাত্র, যাহা কিছু একটা হইলেই হইল। প্রথমাবস্থায় মনুষ্য কারুকার্য্যে যেমন অপটু থাকে, প্রতিমা মূর্ত্তিও তেমনি কদাকার হয়। সূক্ষ্মশিল্পের যত উন্নতি হয়, দেব-মূর্ত্তিও তত সুন্দর। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় ভারতবর্ষীয় প্রতিমা-পূজকদিগকে বিলাতী বিখ্যাত শিল্পকরদিগের নিকট হইতে দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া আনিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন।

পীড়া প্রেতাত্মার আবির্ভাবের ফল—এই বিশ্বাসের ভূরি ভূরি উদাহরণ আমরা স্থানান্তরে দেখাইয়াছি। প্রেতসঞ্চার ভিন্ন, পদার্থবিশেষের দেহমধ্যে প্রবেশ পীড়ার কারণ বলিয়া নানাজাতি বিশ্বাস করে। সে পদার্থগুলি কিরূপে দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়? প্রেতাত্মা সেই সকল পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেহীর রোগ উৎপাদন করে। সে পদার্থগুলি প্রেতযোনির আধার মাত্র। বা সশরীরে, কখন বা পদার্থবিশেষ অবলম্বন করিয়া প্রেতাত্মাগণ লোক-

দিগের পীড়ার কারণ হয়। সুতরাং ভূত ঝাড়াইতে পারিলে যেমন পীড়ার শান্তি হয়, ভূতাবিষ্ট এই সকল পদার্থও সেইরূপ শরীর হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিলেও রোগ সারে। এই সকল পদার্থের সহিত তন্মধ্যগত প্রেত-বিশেষ দূরীভূত হইয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়া দেশের ওঝাগণ প্রেতবিশেষকে প্রস্তর খণ্ড মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া কাহারও দেহ মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া রোগ উৎপাদন করিতে পারে; আবার কিছু পাইলে সেটি বাহির করিয়া লয়, তখন রোগীর রোগ সারে। একটি লোক স্নান করিবার সময় পীড়িত হইয়াছিল—সুতরাং জল দেবতা শরীর মধ্যে প্রবেশ হওয়াতে যে তাহার পীড়া হইয়াছিল, সে বিষয় কি সন্দেহ হইতে পারে? ওঝা আসিয়া তাহার শরীর হইতে এক টুকরা পাথর বাহির করিয়া দেখাইল। তখন তাহার রোগও সারিল। সকলে বুঝিল, সেই প্রস্তরখণ্ড অবলম্বন করিয়া জল-দেবতার আবির্ভাব হইয়াছিল। যদি কেহ সেই প্রস্তর খণ্ড যত্নে পোষণ করিয়া জল-দেবতা বলিয়া পূজা করে, কিছুই বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। সেই প্রস্তর খণ্ড একটী প্রতিমা হইয়া দাঁড়াইবে। আন্‌টিলিস দ্বীপে এইরূপে প্রাপ্ত প্রস্তর বা অস্থিখণ্ড স্ত্রীলোকেরা তুলার মধ্যে রাখিয়া দেবতা বলিয়া পূজা করে। কারিব, মালাগাজি, ও দায়াকদের মধ্যেও তৃণ, প্রস্তর, অস্থি, বা বস্ত্রখণ্ড শরীর মধ্য হইতে বাহির করিয়া রোগ সারান হয়। আবার পদার্থের সংখ্যা অনুসারে পুরস্কার প্রদত্ত হওয়াতে, ওঝারা রাশি রাশি পদার্থ রোগীর দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। জুলু-রমণীগণ স্বপ্নে স্বামীকে দেখিলে, মনে করে স্বামীর প্রেতাত্মা তাহাদের পীড়া বা অন্য প্রকার অশান্তি উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে। তখন ওঝাগণ ঔষধস্বরূপ একটী বৃক্ষের মূল দিয়া থাকে। স্বপ্নের অবস্থায় মুখে যে থুথু আসে, স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া তাহা পরিত্যাগ না করিয়া, তাহারই সহিত সেই মূল চিবাইতে হয়। অনন্তর একটী বৃক্ষ-গাত্রে ছিদ্র করিয়া তাহারই মধ্যে থুথু ও ঔষধ রাখিয়া দিয়া ছিদ্র-দ্বার ছিপি দিয়া ভালরূপে বন্ধ করিতে হয়। তদবধি স্বামীর প্রেতাত্মা সেই ছিদ্র মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে। পূর্ব্বপুরুষের প্রেতাত্মার আক্রমণে কাহারও পীড়া হইলে, তাহার শরীরের কিছু রক্ত লইয়া বল্মীক-স্তূপের ছিদ্র মধ্যে রাখিয়া প্রস্তরদ্বারা ছিদ্রমুখ বন্ধ করিয়া দিলে বা ভেকমুখে প্রবেশ করাইয়া ভেকটী দূরে নিক্ষেপ করিলে রক্তের সহিত প্রেতাত্মা বিদায় হইয়া যায়। পশ্চিম আফ্রিকায় মুরগীর শরীরে, ইহুদাজাতির মধ্যে ছাগলের দেহে, রোগের কারণ প্রেতাত্মা সকল এইরূপ করিয়া প্রবেশ করাইয়া ঐ সকল জন্তুর সহিত

প্রেতাত্মাদিগকে বিদায় করিয়া দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। মধ্য আফ্রিকায় একটী প্রেক, এক টুকরা নেকড়া বা এইরূপ অন্য কোন অচেতন পদার্থ মধ্যে প্রেতাত্মা প্রবেশ করাইয়া দূরে ফেলিয়া দিবার বিধি আছে। শ্যামদেশে মাংস-খণ্ড মধ্যে প্রেতাত্মা স্থাপিত করিয়া যাদুকরেরা কাহারও দেহ মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিলে তাহার মৃত্যু হয়। প্রাচীন গ্রন্থকার প্লীনি হংসদেহে প্রেতাত্মা সঞ্চালিত করিয়া রোগের চিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চীনদেশে কাহারও সন্তান হইলে পিতার গায়ের একটী জামা বিপরীত দিকে ঝুলাইয়া রাখা হয়। তাহা হইলে দুর্দ্দৈবগণ শিশুদেহে প্রবেশ না করিয়া বস্ত্রখণ্ডে আশ্রয় লয়। অদ্যাপি য়ুরোপীয় কৃষাণেরা মৎস্য, পক্ষী বা বৃক্ষদেহে রোগের আত্মা সঞ্চালিত করিয়া শিরঃপীড়া জ্বর বা ব্রণ রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকে।* বৃক্ষদেহে প্রেক মারিয়া, নখ বা চুলমধ্যে প্রেতাত্মা সঞ্চালনপূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়াও, রোগ সারাইবার বিধি আছে। ইংলণ্ডে কাহারও ব্রণ হইলে, ব্রণ-দেহে পাথর ছোঁয়াইয়া সেই পাথরগুলি পথপার্শ্বে রাখিয়া দিলে যে সেই পাথরগুলি স্পর্শ করে, রোগ তাহারই দেহে সঞ্চালিত হয়। ভারতবর্ষে পাত্র, থলি বা পুটলী মধ্যে রোগ সঞ্চালিত করিয়া পথপার্শ্বে রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। জার্ম্মাণদেশে ক্ষতের উপর পটী বাঁধিয়া ত্রিমাত্রা পথে পটী প্রক্ষেপ করিলে পথিকের দেহে ক্ষত প্রবেশ করে। দক্ষিণ য়ুরোপে পুষ্পগুচ্ছে রোগ চালিত করিয়া অনভিজ্ঞ বিদেশীয়দিগকে ঐ গুচ্ছ উপহার দেওয়া হয়। থুরিঞ্জিয়া দেশে বস্ত্রখণ্ড বা অন্য কোন পদার্থে রোগ চালিত করিয়া পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষশাখায় ঐ পদার্থগুলি রাখা হয়। পথে যাইতে যাইতে কেহ উহাদিগকে স্পর্শ করিলে রোগ রোগীর দেহ ছাড়িয়া তাহারই দেহে প্রবেশ করে। মেক্সিকো হইতে ভারতবর্ষ ও ইথিওপিয়া হইতে আয়র্লণ্ড পর্য্যন্ত এইরূপ কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্যান্য আত্মার ন্যায় মনুষ্যের প্রেতাত্মা দ্রব্যবিশেষে আশ্রয় লইতে পারে। কাহারও নখ চুল বা বস্ত্রখণ্ড পাইলে যাদুকরদিগের যাদু করিবার সুবিধা হয়, এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। জামার মধ্যে পলায়িত আত্মা পুনর্ব্বার বদ্ধ করিয়া চীনবাসীরা কিরূপে লোকের পীড়া শান্তি করে, পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে। বস্তুতঃ প্রাণ পুরুষ পূর্ব্বদেহ বা পূর্ব্বব্যবহৃত দ্রব্যাদির মোহ কাটাইতে পারে না, এই বিশ্বাস হেতু অসভ্য-সমাজে নানা আশ্চর্য্য ব্যবহারের উদয়

* "Ash tree, Ashen tree, Pray buy this wart of me."

হইয়াছে। মাণ্ডান-রমণীরা স্বামী বা সন্তানের অস্থির নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তা কয়। গিনিবাসী নিগ্রোজাতি একটী সিন্দুক মধ্যে পিতামাতার অস্থি সংরক্ষিত করিয়া মাঝে মাঝে তাহার সহিত গল্প করে। ব্রহ্মদেশীয় কিরাত জাতি সময়ান্তরে প্রাণপুরুষ ফিরিয়া আসিবার প্রত্যাশায় অতি যত্নে মৃতদেহ রক্ষা করিয়া থাকে। মেরিয়ান দ্বীপবাসীগণ পিতামাতার মৃতদেহ গৃহমধ্যে রক্ষা করিয়া গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপে তাহাদিগকে পূজা করে। মৃতদেহের অস্থিখণ্ড তুলার মধ্যে রাখিয়া কারিবজাতীয়েরা তাহার নিকট শত্রুদমন ও দৈববাণী প্রার্থনা করে। অস্থিখণ্ড মধ্যে বা পদার্থবিশেষে প্রাণপুরুষের প্রতিষ্ঠা হয় বলিয়া পূর্ব্বপুরুষের স্বর্গপ্রাপ্তি আশায় দূরে তীর্থক্ষেত্রে বা পুণ্যনদী-সৈকতে সেই সকল দ্রব্য বিসর্জ্জন করিবার ব্যবস্থা নানা জাতির মধ্যে দেখা যায়। যে সকল দ্রব্যের সহিত জীবিতাবস্থায় কোন প্রকার সংস্রব ছিল না, তাহার মধ্যেও প্রাণপুরুষের আবির্ভাব হইতে পারে। মলক্কসদ্বীপে কবরপার্শ্বে পূর্ণিমা রাত্রিতে কাষ্ঠের চামচ স্থাপন করিলে সেই চামচে প্রাণপুরুষের অধিষ্ঠান হয়। অরিগণদেশীয় এক জাতীয় ইণ্ডিয়ান যাদুকরেরা অস্থি বা প্রস্তরখণ্ডে এইরূপে প্রেতাত্মার সমাবেশ করিয়া থাকে। ভেরাপাজ দেশে সর্দ্দারের মৃত্যু সময় তাহার মুখে এক খণ্ড পাথর ধরিত; তাহা হইলে প্রাণপুরুষ অন্যত্র না গিয়া সেই পাথরে আশ্রয় লইত। মেক্সিকো দেশে ও নবজিলান্দে এই প্রথা দেখা যাইত। ভারতবর্ষীয় কোলজাতীয়েরা মৃতদেহ সৎকার করিয়া এইরূপে তাহাদের প্রাণপুরুষ গৃহে ফিরাইয়া আনে। রায়পুরের বিঞ্জবারজাতি জলস্থালীতে এবং বুঞ্জিয়া জাতি একটী পাত্রে ময়দা রাখিয়া তাহার মধ্যে প্রাণপুরুষ ফিরাইয়া আনে। তাতারদেশীয় একটি রাক্ষস সর্পদেহে আপন প্রাণপুরুষ স্থাপিত করিয়াছিল বলিয়া কেহ তাহাকে মারিতে পারিত না। অবশেষে সর্প হত হইলে তাহারও মৃত্যু হয়। স্কাণ্ডিনেবিয়া উপদ্বীপে অপর একটি রাক্ষস হংসডিম্ব মধ্যে আপন আত্মা লুকাইয়াছিল। য়ুরোপেও এই বিশ্বাসের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। টাইরলের লোকেরা ঘাস দিয়া দাঁত খুঁটে না, কি জানি যদি ঘাসের মধ্যে প্রেতাত্মা আশ্রয় লইয়া থাকে এবং সুবিধা পাইয়া দেহ মধ্যে প্রবেশ করে। বলগেরিয়ার লোকেরা কল হইতে ময়দা আনিলে তাহার মধ্যে না ভূত থাকিতে পারে, এজন্য রৌদ্রে একবার তাহা উত্তপ্ত করিয়া লয়। য়ুরোপের সভ্যজাতিদিগের মধ্যেও কবচ ধাঁরণের প্রথা আছে।

পদার্থবিশেষে প্রেতাত্মা সমাবেশ হইয়াছে মনে করিয়া তাহার সাহায্যে,

সম্পদ্‌লাভ বা শত্রুনিগ্রহ করিবার আশায় অসভ্যগণ সেই সকল পদার্থ দেবভাবে পূজা করে। উহাদিগকে চাটুবাক্যে স্তব করিতে হয়, প্রাণরক্ষার্থ ভোজন ও পানীয় দিতে হয়, তবে উহারা সাধকের মনোমত ফল প্রদান করে। তাতারদেশীয় শ্রমণদিগের গলদেশে মালাস্বরূপে যে সকল পদার্থ রক্ষিত হয়, উহার প্রত্যেকে এক একটি প্রেতাত্মার আধার। শ্রমণেরা অতি যত্নে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। তাহাদিগেরই সাহায্যে তাহারা অসাধ্যসাধনে সমর্থ হয়। তাতার দেশে একটি রুসীয় বণিকের কতকগুলি দ্রব্য অপহৃত হয়। একজন লামা একখণ্ড কাষ্ঠ লইয়া বলিতে পারিয়াছিল, কোথায় অপহৃত দ্রব্য লুক্কায়িত আছে। অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য যেমন দেবগত পদার্থ সকল অতি যত্নে প্রতিপালিত হয়, অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে না পারিলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবগত পদার্থ গ্রহণ করিবারও ব্যবস্থা দেখা যায়। আফ্রিকা দেশে দেবগত পদার্থ-পূজার বড় প্রাচুর্ভাব। এমন কি সাহেবেরা পর্য্যন্ত সে দেশে কিছুদিন বাস করিলে তাহাদিগকেও এইরূপ এক একটী প্রতিমা পোষণ করিতে দেখা যায়। নিগ্রোরা বিপদকালে প্রতিমাকে সাহায্য জন্য অতি কাতরভাবে মিনতি করে, তোষামোদ করে, লোভ দেখায়; কিন্তু তাহাতেও অভিপ্রায় সিদ্ধ না হইলে ভয় দেখায়, তাড়না করে, কোথায় কোথায় প্রহার করিতেও দেখা যায়। তাহাতেও যখন দেবতা তাহাদের বিপদ মোচন না করে, তখন দেবতার দেবত্ব লোপ হইয়াছে ভাবিয়া অন্য প্রতিমার আশ্রয় গ্রহণ করে। উড়িষ্যা দেশে জগন্নাথকে গালাগালি দিবার কথা অনেকেই অবগত আছেন। বস্তুতঃ "পৌগুি" হইবার সময় যে কটূবাক্য এই ভক্তগণ আপন দেবতার প্রতি প্রয়োগ করে, ভদ্রলোকের উহা অশ্রাব্য। অন্য পক্ষে দেবতা সন্তুষ্ট থাকিলে রোগ নিবারণ করে, বৃষ্টিবর্ষণ করে ক্ষেত্রে শস্য জন্মায়, জালে মাছ পুরিয়া দেয়, চোর ধরিয়া দেয়, চোরকে দণ্ড দেয়, ভক্তকে সাহস দেয়, শত্রুকে বিপদে ফেলে।

পদার্থবিশেষকে দেবাশ্রিত বলিয়া পূজা করার রীতি পৃথিবীর সকল অংশে দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকাবাসী দাঁকোটাজাতি পথপার্শ্ব হইতে প্রস্তরখণ্ড কুড়াইয়া নানাবর্ণে চিত্রিত করিয়া পিতামহ বলিয়া সম্বোধন করে, পূজা করে এবং বিপদমোচন করিবার জন্য প্রার্থনা করে। কারিবসাগরীয় দ্বীপে তিনখণ্ড প্রস্তরকে লোকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। উহাদিগের একটি স্ত্রীলোকদিগকে প্রসব-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দেয়, একটি আবশ্যকমত সূর্য্যের

আলোক ও বৃষ্টি যোগায়; তৃতীয়টি প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে। ব্রাজিলবাসীরা মাটিতে কাঠী পুতিয়া তাহাকেই দেবতা বলিয়া পূজা করে। পেরুদেশে প্রস্তরখণ্ড গ্রাম্য ও গৃহদেবতারূপে পূজিত হইত। আফ্রিকা দেশে দামারাজাতি মাটিতে কাঠী পুতিয়া তাহাকেই পিতৃপুরুষরূপে পিণ্ড দেয়। শ্বেতনীলনদপার্শ্ববর্ত্তী দীন্‌কাজাতি একটা খোঁটাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। আবিসিনিয়াবাসী পল্লাজাতি প্রস্তর ও কাষ্ঠ খণ্ডকে এবং সামোয়াদ্বীপবাসী ওরাঙ্গডোঙ্গ জাতি প্রস্তরখণ্ডকে দেবতা বলে। মিত্রদ্বীপ, নবহেব্রিডেজ, ফিজী প্রভৃতি প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রতিমাপূজা প্রচলিত আছে। উত্তর আসিয়ার তুরাণীয় জাতিদিগের মধ্যেও এইরূপ। সামোয়িদ জাতি পথে চলিবার সময় দুই তিনটি ঠাকুর সঙ্গে লইয়া চলে। অষ্টিয়াকজাতি কাষ্ঠখণ্ডে বস্ত্র জড়াইয়া দেবতা বলিয়া পূজা করে। ভারতবর্ষে অনার্য্যজাতি সকলের মধ্যে ঠাকুর পূজার বড় প্রাদুর্ভাব। হয় ত ইহাদিগের নিকটে ভারতবর্ষীয় আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথম প্রতিমাপূজা শিক্ষা করিয়া থাকিবে। বোদোজাতি এক টুকরা বাঁশকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। খন্দ, বগদার, বেতদার, শানার প্রভৃতি নানা অসভ্য জাতির মধ্যে প্রস্তরময় দেবদেবী দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ শিব, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবতা সকলকে প্রস্তরমূর্ত্তিরূপেই পূজা করিয়া থাকে। হিন্দুগণের প্রতিমা পূজার কথা বিশেষরূপে বলিবার আবশ্যক নাই। পূর্ব্বে গ্রীকেরা একখণ্ড প্রস্তর, এক টুকরা কাঠ বা একটা স্তূপ বা একটা স্তম্ভকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত। ক্রমে গ্রীক ভাস্করগণের প্রতিভা যত বিকসিত হইয়াছিল, অপূর্ব্ব সুন্দরমূর্ত্তি দেবদেবীগণ পারথিনন সুশোভিত করিয়া প্রতিমাবিদ্বেষীদিগেরও বিস্ময় উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছিল। খ্রীষ্টের চতুর্থ শতাব্দীতেও গ্রীকযুবক পথে চলিতে প্রস্তর খণ্ড দেখিলে পকেট হইতে শিশি বাহির করিয়া ঐ প্রস্তরের উপর তৈল ঢালিয়া জানু পাতিয়া পূজা করিত। মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে আরাবেরা প্রতিমা পূজা করিত। উহারই এক খণ্ড প্রস্তর কাবা মন্দিরে মহম্মদ স্বয়ং স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ভূতদ্বেষী মুসলমানেরা অদ্যাপি ভক্তির সহিত উহা পূজা করে। প্রাচীন ফিনিসিয় ও য়িহুদাজাতির মধ্যেও প্রতিমা পূজা প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার হইবার অনেক পরেও ফ্রান্স ও ব্রিটন দেশে প্রতিমা পূজা দেখা যাইত। গত শতাব্দী পর্য্যন্ত নরওয়েবাসী খ্রীষ্টান কৃষকেরা গৃহ মধ্যে বৃত্তাকার প্রস্তরখণ্ড দেবভাবে রক্ষা করিত। উহারা প্রতি বৃহস্পতিবার স্নান করাইয়া ঘৃত [illegible]াইয়া অগ্নি-

পার্শ্বে নূতন তৃণের উপর ঐ দেবতাকে রাখিয়া দিত এবং গৃহস্থের সৌভাগ্যবৃদ্ধি করিবার জন্য মাঝে মাঝে মদেও ডুবাইত। আয়র্লণ্ডের নিকটবর্ত্তী ইনিস্কিদ্বীপের লোকদিগকে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দেও প্রতিমা পূজা করিতে দেখা গিয়াছিল। রোমান কাথলিক, গ্রীকচার্চ্চ প্রভৃতি খ্রীষ্ট সম্প্রদায়কে প্রতিমা-উপাসক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রথমতঃ বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের সত্তা অস্বীকার করিত। এখন সকল দেশীয় বৌদ্ধেরাই প্রতিমা-উপাসক। আফ্রিকাবাসী নিগ্রোদিগের মত কিয়ুরাইল দ্বীপের অধিবাসীগণ সমুদ্রে তুফান হইলে তুফান নিবারণের জন্য দেবতাকে সমুদ্র-জলে ফেলিয়া দেয়। চীনদেশেও দেবতা প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে তাহাকে কটু ভাষায় গালাগালি দেওয়া ও প্রহার করা হয়। কখন কখন কাদায় ফেলিয়া লোকেরা তাহার দুর্দ্দশার একশেষ করে। কিন্তু তাহার পর যদি মনোগত সিদ্ধ হয় আবার তাহাকে ধোয়াইয়া দেবতার ন্যায় ভক্তি করে। পূর্ব্বে গ্রীসদেশেও রাখালেরা মাঠে কোন বিপদে পড়িলে পেনদেবীর প্রতিমূর্ত্তিকে প্রহার করিত। টায়রিয়েরা বিপদ কালে দেবতা পরিত্যাগ করিতে না পারে, এই ভয়ে দেবতাকে বাঁধিয়া আপনাদের সঙ্গে লইয়া যাইত। জল-দেবতা বিড়ম্বনা করিয়াছিল বলিয়া রোমের সম্রাট আগষ্টস তাহার প্রতিমূর্ত্তি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিল। রুসদেশীয় কৃষকেরা কোন অসৎ কর্ম্ম করিবার সময় প্রতিমার মুখ বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, যেন দেবতা দেখিতে না পায়। মিংগ্রেলীয়া দেশীয়েরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার সময় কোন কোমলপ্রকৃতি দেবতার নামে শপথ করে। য়ুরোপের দক্ষিণাংশে ভক্তেরা কখন চাটু বাক্যে দেবমূর্ত্তির তোষামোদ করে, কখন পদতলে দলন করিয়া থাকে। অনাবৃষ্টি হইলে ইহারা ভার্জ্জিনের মূর্ত্তি জলমধ্যে ডুবাইয়া রাখে। আমাদিগের দেশেও এরূপ কারণে বাণলিঙ্গের মূর্ত্তি জলে ডুবান হয়।

আর্য্য জাতির ন্যায় আমেরিকা দেশেও সভ্যতর জাতির মধ্যে প্রতিমাপূজা দেখা যায়। নিতান্ত বর্ব্বরদিগের মধ্যে ইহা তাদৃশ লক্ষিত হয় না। ব্রাজিলবাসীরা মোম বা কাষ্ঠ দিয়া এবং মাণ্ডান জাতি তৃণ বা চর্ম্ম দিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ করে। বার্জ্জিনিয়া, হেটি, পেরু, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে প্রতিমা-পূজা প্রচলিত ছিল। আণ্ডামান, অষ্ট্রেলিয়া, পাপুয়া ও পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে বর্ব্বরদিগের মধ্যে প্রতিমা-পূজা কচিৎ দেখা যায়। কিন্তু সর্ব্বত্র এইরূপ নহে। নবজিলাণ্ডে মৃত কুটুম্বের স্মরণস্তম্ভ ও কাষ্ঠমূর্ত্তি দেবতারূপে পূজিত হয়। মিত্রদ্বীপপুঞ্জেও এইরূপ। বোর্ণীয়ো ও [illegible]বেক্ দ্বীপের অধিবাসীরা মুসলমান ধর্ম্ম

গ্রহণ করিয়াও পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে নাই। বোর্ণীওর দায়াক জাতি প্রতিমা-উপাসক। মিসরদেশে কুটুম্বের মৃতদেহ রক্ষা করিয়া লোকেরা তাহার পূজা করিত। পেরুদেশেও এই রীতি প্রচলিত ছিল। সাণ্ডুইচ দ্বীপে রাজকুমারের অভিভাবকতা করিবার জন্য পিতৃপিতামহের দেহাবশেষ সঙ্গে লইয়া রাজারা ভ্রমণ করে। ক্রি ও কারিব জাতি এবং গায়েনা ও তাসমেনিয়ার অধিবাসিদিগের মধ্যে দেহাবশেষ পোষণ করিবার প্রথা আছে। আণ্ডামান দ্বীপের বিধবাগণ স্বামীর মস্তক গলায় ঝুলাইয়া রাখে। লয়াণ্টি দ্বীপপুঞ্জের অন্যতর লিফুদ্বীপবাসীগণ মৃত আত্মীয় স্বজনের নখ, দন্ত বা কেশগুচ্ছ রক্ষা করিয়া দেবতার ন্যায় পূজা করে। নবকালিডোনিয়া দ্বীপে কাহারও পীড়া হইলে মৃত আত্মীয়ের মস্তকপার্শ্বে নৈবেদ্য উপহার দেয়। ইয়ুকেতনের অধিবাসিরা আত্মীয়ের মৃতদেহের অংশবিশেষ লইয়া তাহাতে অন্য পদার্থ মিশাইয়া একটি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সেই প্রতিমাকে পূজা করে। মেক্সিকো দেশে মৃতদেহের সৎকার করিয়া তাহার ভস্ম লইয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা হইত। কিন্তু যুদ্ধহত, জলমগ্ন বা বিদেশগত আত্মীয়ের মৃতদেহ না মিলিলে কাষ্ঠখণ্ডে তাহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিত। কঙ্গো দেশে রাজার শব-শরীর যতদিন সাধারণ্যে প্রকাশিত করিবার উপযুক্ত না হয়, ততদিন চিত্রপটে তাহার প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া তাহারই পূজা করিবার ও তাহাকেই ভোজ্য ও পানীয় দিবার প্রথা দেখা যায়। শ্রীক্ষেত্রে স্নানযাত্রার পর জগন্নাথকে নূতন চিত্রিত করিবার অবসরে চিত্রপটে জগন্নাথের পূজা হয়। জাবা ও পাপুয়ান দ্বীপে এবং আবিসিনিয়া দেশে মৃতদেহ কবরসাৎ হইলে তাহার প্রতিমূর্ত্তি দেহের কার্য্য করে। পূর্ব্বে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সদেশে রাজার মৃতদেহ মঞ্জূষা মধ্যে বদ্ধ হইলে তাহাদিগের চিত্রপট দেহস্বরূপে গির্জাঘরে লইয়া যাইত। তটবাসী নিগ্রো ও আরকানীয় জাতির মধ্যে এবং নবজিলাণ্ড দ্বীপে কবরের উপর প্রতিমূর্ত্তি বা মূর্ত্তিশূন্য কেবল কাষ্ঠখণ্ড রাখিয়া উহাকেই দেবরূপে গণ্য করা হয়। পেরুদেশে রাজার জীবিতাবস্থায় তাহার একটী স্বতন্ত্র প্রতিমূর্ত্তি রক্ষা করা হইত এবং রাজার জীবনকালে ও মৃত্যুপরে উহাই দেবতা বলিয়া পূজা করা হইত। চিনুক জাতি কাহারও চিত্রপট দেখিলেই উহাকে দেবতার মত সম্মান করে। এইরূপ বিশ্বাস হেতু কেহ অসভ্যদিগের চিত্র অঙ্কিত করিলে তাহারা কত ভীত হয়, তাহা স্থানান্তরে উল্লেখ করা গিয়াছে। মাদাগাস্কারের অধিবাসিরা একটী রাজার ছবি দেখিয়া তাহাকে রাজসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। ভারতবর্ষীয়